আমার ভ্রমণ।

"জীবন-সংগ্রাম" "সংসার-চিত্র" "মানব-চিত্র"
"ভবঘুরের উইল" প্রভৃতি
গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীরামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক
প্রকাশিত।

৪০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Printed by H P Banerjee at the
RAMMOY PRINTING WORKS
100, Upper Chitpur Road, Calcutta
1915

মূল্য ১৷০ পাঁচ সিকা

গ্রন্থকারের প্রণীত যাবতীয় পুস্তক ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মেডিকেল লাইব্রেরীতে, ৭ নং ষষ্ঠীতলা রোড, নারিকেলডাঙ্গা মডেল লাই-ব্রেরীতে পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

উৎসর্গপত্র।

——:।:——

ও ভগবান।

যাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত মানবের কোন ইচ্ছাই
পূর্ণ হয় না, যাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার মহিমা
আমি আজ প্রাণে প্রাণে অনুভব করি-
তেছি, যাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে
মৃত্যুভয় দূরীভূত হয়—আমি
আজ রুগ্নশয্যায়, মৃত্যুর দ্বারে
দাঁড়াইয়া সেই মঙ্গলময়
ভগবানের নামে আমার
অতি আদরের এই
অসম্পূর্ণ "আমার
ভ্রমণ" উৎসর্গ
করিলাম।

তাঁহাব কৃপাভিকাবী
গ্রন্থকার।

ভূমিকা।

—:*:—

আজ পাঠকগণের নিকট ব্যথিত হৃদয়ের কয়েকটি কথা বলিয়া বোধ হয় বা চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হয়। আর যে নূতন পুস্তক লইয়া পাঠকগণের সন্মুখে উপস্থিত হইতে পারিব, সে ভরসা বা আশা আমার আর নাই। হৃদয়ে লিখিবার বলবতী ইচ্ছা থাকিলেও ভগবান আমাকে দিন দিন সে শক্তি হইতে বঞ্চিত করিতেছেন। মানুষের যাহা প্রধান শক্তি, যে শক্তি আছে বলিয়া মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব, মানুষের যে শক্তি ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান—সেই মস্তিষ্কই আমার ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া আসিতেছে! আজ দুই বৎসর যাবৎ আমি মাথার পীড়ায় মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। কিছুদিন পূর্ব্বে আমি "জীবন-

সংগ্রাম" নামক পুস্তকখানি রচনা করি। "জীবন সংগ্রাম" বঙ্গীয় সমাজে বিশেষ আদর যত্ন পাইয়াছে। ছয় মাসের মধ্যেই উহার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যায়। বর্ত্তমানে তৃতীয় সংস্করণ শেষ হওয়ায় চতুর্থ সংস্করণ ছাপা হইতেছে। "জীবন সংগ্রাম" প্রকাশিত হইবার পর কিঞ্চিতাধিক দুই বৎসরের মধ্যে আমার "মানব চিত্র" "সংসার চিত্র" ও "ভবরামের উইল" নামক তিনখানি পুস্তক বাহির হয়! এই পুস্তকগুলিও বঙ্গীয় পাঠকগণের নিকট যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে এবং এগুলিরও একাধিক সংস্করণ ছাপা হইয়াছে।

এক্ষণে জানি না আমার এই "আমার ভ্রমণ" পুস্তক খানিকে বঙ্গীয় পাঠকগণ কোন্ চক্ষে দেখিবেন।

মস্তিষ্কের পীড়ায় প্রপীড়িত হইয়া স্বাস্থ্য

লাভের আশায় আমি দেশ ভ্রমণে বহির্গত হই। ইচ্ছা ছিল ভ্রমণের সকল কথা ও নূতন নূতন স্থানের বর্ণনা এবং পথের ঘটনাগুলি "আমার ভ্রমণে" গুছাইয়া লিখিব। যে যে স্থানে গিয়াছি সকল স্থানের ভ্রমণ কথা ইহাতে থাকিবে। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা না হইলে মানুষের ইচ্ছা কখন পূর্ণ হইতে পারে না। আমারও পূর্ণ হইল না! পুস্তকের অর্দ্ধেক অংশ লিখিবার পর আমার মাথার পীড়া এতই বৃদ্ধি হইল যে, চিকিৎসকগণ আমাকে লেখা পড়ার কার্য্য একবারে ত্যাগ করিয়া সুদীর্ঘ কালের জন্য বিশ্রাম লইতে বাধ্য করিলেন। আমার মনের আশা মনেই বিলীন হইয়া গেল! দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া হৃদয়ের অসহনীয় যন্ত্রণায় আকাশের পানে হতাশ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলাম "ভগবান এ কি করিলেন? আমার রোগযন্ত্রণাপেক্ষা

এ কষ্ট অধিক হইল। ভুক্তভোগী ব্যতীত অপরে আমার এই হৃদয়ের অব্যক্ত যাতনা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না।

চিকিৎসকগণের কথা উপেক্ষা করিয়া, বন্ধুবান্ধবের ও আত্মীয়াদের অনুরোধ তাচ্ছিল্যের হাসিতে উড়াইয়া দিয়া গোপনে গভীর রজনীতে "আমার ভ্রমণ" শেষ করিবার জন্য প্রাণপণ করিলাম। ফল বিপরীত হইল। দুর্ব্বল মস্তিষ্কের উপর জোর করিয়া গুরুভার অর্পণ করায় আমার কথা কহিবার শক্তি পর্য্যন্ত লোপ পাইল। দুই দিন অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিলাম,জীবন বহির্গত হইল না বটে কিন্তু আমাকে শয্যাগ্রহণ করিতে হইল। চিকিৎসকগণ বলিলেন—"এবার আপনি.দীর্ঘকাল অবকাশ-গ্রহণ না করিলে মৃত্যু আসিয়া আপনাকে কার্য্য হইতে বিরত করিবে।" আমিও সেটা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম সুতরাং

'আমার ভ্রমণ" আমার মনের মত করিয়া বাহির করিতে পারিলাম না। "নোটবুকের" কতক অংশ আমার ভ্রাতৃপ্রতিম জনৈক বন্ধু সাহায্য না করিলে হয়ত লেখাই হইত না। অধিকন্তু ডেরাডুনের বিজন অরণ্যে প্রবেশ করিয়া যে দিন মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম সে কথাগুলি কেবল হৃদয়েই লেখা ছিল, নোটবুকে লিখিতে পারি নাই। যদি ভীষণ মস্তিষ্ক পীড়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই এবং 'আমার ভ্রমণের" দ্বিতীয় সংস্করণ হয়, তবে সেই লোমহর্ষণ কাহিনীটি পাঠকগণকে উপহার দিব।

এখন আমি বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য প্রবাসে কাল যাপন করিতেছি। মস্তিষ্ক ক্ষীণ ও দুর্ব্বল এবং লিখিবার শক্তি হইতে ভগবান আমাকে বঞ্চিত করিয়াছেন।

"আমার ভ্রমণে"ভুলপ্রমাদ আশ্চর্য্য নহে।

ভুমিকায় আরও দুই এক কথা আমার বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দুর্ব্বল মস্তিষ্ক ও ক্ষীণ লেখনী কম্পিত হইতেছে।

মা বীণাপানীর সেবা করা আর বুঝি আমার অদৃষ্টে নাই। তাই মনে হইতেছে বুঝি "আমার ভ্রমণই" আমার শেষ পুস্তক এবং বঙ্গীয় পাঠকগণের নিকটও আমার এই শেষ বিদায় গ্রহণ।

"আমার ভ্রমণ" পাঠ করিয়া যদি পাঠক-পাঠিকাগণ কিঞ্চিৎমাত্রও আনন্দ উপভোগ করেন—তবে আমার আনন্দ রাখিবার স্থান থাকিবে না।

দেওঘর
২০শে ফাল্গুন
১৩২১ সাল।

গ্রন্থকার।

আমার ভ্রমণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

(মুঙ্গেরে দুই দিন)

গত ৬ই জানুয়ারী ২২শে পৌষ মঙ্গলবার দিবা দ্বিপ্রহরে বাসার বাঙ্গালায় বসিয়া উদাসনয়নে নগ্ন প্রকৃতির পানে চাহিয়া বসিয়া আছি। অদূরে মাঠের মধ্যে ছোট বড় শালগাছের পাতাগুলি বায়ুহিল্লোলে কেহ উঠিতেছে, কেহ পড়িতেছে, কেহ বা কাঁপিয়া কাঁপিয়া আবার স্থির হইতেছে। অপর ছোটবড় পাহাড়গুলি হইতে এক একবার প্রবল বাতাস শালগাছের মধ্য দিয়া ছুটিয়া আসিয়া, সেই দ্বিপ্রহরেও এই রুগ্ন দুর্ব্বল দেহখানিকে কম্পিত করিয়া তুলিলেও সে দিনের পাহাড়ে বাতাসটা বড়ই মিষ্ট লাগিতেছিল।

বায়ুর শন্ শন সে। সে শব্দ ব্যতীত আর কাহারও সাড়া-শব্দ নাই। চতুর্দ্দিকে বিরাট প্রকৃতি যেন জাগ্রত অবস্থায় ঘুমাইতেছে। লোক কোলাহল নাই, পক্ষীকূজন নাই, সারমেয় দলের চীৎকার নাই, সব যেন নিদ্রিত বলিয়া বোধ হইতে

ছিল। বাস্তবিক এরূপ নির্জ্জনতা জীবনে আর কখনও উপভোগ করি নাই। দূরে,—বহুদূরে প্রান্তরের দিকে চাহিলে ছোটবড় শাল ও মৌয়া গাছের ফাঁকের মধ্য দিয়া কেবল দুই চারিটি গরু বা মহিষ ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। পাহাড়ের কোলে মহিষ ও গরুগুলির ছোট ছোট ছাগশিশু ব্যতীত আর কিছুই মনে করিবার উপায় নাই। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলে ঝাঝার এই বাঙ্গালাখানিকে যেন পাহাড়ে ঘেরা নির্জ্জন কুটীর বলিয়া মনে হয়। প্রকৃতির এই শান্তিপূর্ণ নির্জ্জনতা দেখিয়া স্বভাবতঃ মনে হয় ছুটিয়া গিয়া পাহাড়ে উঠি, আবার পাহাড় হইতে অবতরণ করিয়া, প্রান্তরের শাল গাছের মধ্যে দিয়া লাফাইয়া লাফাইতে সেই চঞ্চল মধুময় বাল্যজীবনে ফিরিয়া যাই। কিন্তু হায়! যাহা চলিয়া যায় তাহা আর ফিরিয়া আইসে না; যাহা গিয়াছে, সর্ব্বস্ব বিনিময়ে তাহা আর ফিরিয়া পাইব না।

চল্লিশের পরপারে আসিয়া যখন সেই সুস্থ সবল বাল্যকালের কথা মনে পড়ে, তখন এই রোগকাতর ও জীর্ণ দেহখানা যে তাহারই রূপান্তর একথা বিশ্বাস হয় কৈ? বিশ্বাস হইলে জগতে যে সকলই নশ্বর তাহা ত বিস্মৃত হইতাম না। চক্ষের উপর এতটা সত্যকে যখন চিনিতে

পারিলাম না, তখন এ চক্ষু "সত্য বস্তুকে" আর কি করিয়া চিনিবে ?

সমাজের বন্ধন নাই, সহরের কোলাহল নাই, বন্ধু বান্ধবের মুখ দর্শনরূপ সুখ হইতে বঞ্চিত। ঝাঝার নদীতীরে অরণ্যবেষ্টিত বাঙ্গালাখানিতে কেবল আমরাই মাত্র বাঙ্গালী অধিবাসী। মাঝে মাঝে সাওতাল রমণীরা সুদূর পার্ব্বত্যপল্লী হইতে শুষ্ক কাষ্ঠ ও শাকশব্জী বিক্রয় করিতে আইসে, তাহাদের মুখে তাহাদের ক্ষুদ্র সংসারের তাহাদের সুখ ও দুঃখের কথা শুনিয়া সময় কাটাইয়া দিই। অদৃষ্টগুণে সব দিন তাহা দের দেখা পাই না। সময়ে সময়ে অধিক লাভের আশায় দল বাঁধিয়া তাহারা অন্য দিকে চলিয়া যায়। নিস্তব্ধ নির্জ্জনতাতে ডুবিয়া এতদিন বেশ প্রফুল্লমনে কাটাইতেছিলাম, কিন্তু আজ প্রাণ যেন কোথায় ছুটিয়া চলিল। বহু চেষ্টাতেও তাহাকে শান্ত করিতে পারিলাম না। যে নির্জ্জনতাকে এতদিন প্রাণের সঙ্গী করিয়াছিলাম, সে যেন আজ হঠাৎ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

আজ শীতের দ্বিপ্রহর রৌদ্রে সকলই যেন "একঘেয়ে" বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সেই গরু, বাছুর, মহিষ, সেই শাল গাছের নিবিড় বন, মাঝে মাঝে মৌয়া গাছের ঝোপ হইতে পাখীর সুমিষ্ট কলরব, পাহাড়ের কনকনে বাতাস, আর

"এবেলা কি খাবে গো', বলিয়া গৃহিণীর সেই মধুর সম্ভাষণ, এ সবই "থোড়, বড়ি, খাড়া' ও "খাড়া, বড়ি, থোড়ের" মত "একঘেয়ে" মনে হইতে লাগিল। কয়দিন বন্ধু শ্রীযুক্ত আসিয় আমার এখানে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া ছিলেন, তিনি চলিয়া যাইতেই সব যেন ফাঁকা বোধ হইতে লাগিল। কি যে অভাব হইয়াছে বুঝিতে পারিলাম না।

কে একজন মহাপুরুষ বলিয়াছেন "একঘেয়ে প্রেম বা সোহাগ ভাল লাগে না, ঝগড়া করিয়া মাঝে মাঝে তাহাকে নূতন করিয়া ঝালাইয়া লইতে হয়।" সেই মহাপুরুষের বাক্যকেই শিরোধার্য্য করিব নাকি? তাহাতেও অনেক অসুবিধা। সঙ্গে সঙ্গেই যে নূতন হইয়া উঠিবে, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? এই পাহাড়ে দেশে নির্জ্জন শালবনের মধ্যে একটা কথা বলিবারও যে লোক নাই। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আজই মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ড দেখিতে যাইব স্থির করিলাম। গৃহিণী আমার সংকল্প শ্রবণ করিয়া তীব্রস্বরে বলিলেন "আমি কি সীতার মত এই বনবাসে একাকী থাকিব নাকি?' বুঝিলাম, প্রতিবাদে ও যুক্তিতর্কে কোনই ফল হইবে না। ভৃত্যকে বাঙ্গালার চাবি দিয়া তখনই বাহির হইয়া পড়িলাম। ট্রেনের আর সময় নাই। পশ্চাতে চাহিয়া দেখি—তিনটী স্ত্রীলোক, দুইটী শিশু, চারিটী পুরুষ, একটী

ভৃত্য, দলে আমরা দশজন, এবং শয্যা ও বস্ত্রের দুইটি বৃহৎ মোট, ইহা ব্যতীত তৈজসপত্র ও গৃহিণী অনেক সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন। বলা বাহুল্য অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের যাত্রার আয়োজন শেষ হইয়াছিল, কারণ পাঁচটার ট্রেণে না গেলে আজ আর যাওয়া হইবে না।

বাঙ্গালা ত্যাগ করিয়া ষ্টেসনে যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলাম, রজনী দ্বাদশ ঘটিকার সময় মুঙ্গের ষ্টেসনে পৌঁছিব। তথায় কোন পরিচিত বন্ধু বান্ধব নাই, স্ত্রীলোক ও শিশুদুটীকে লইয়া দারুণ শীতে কোথায় রজনী অতি-বাহিত করিব তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। কোথায় কখন গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হইবে তাহাও জানা নাই। শেষ স্থির করিলাম যে, ভাবিয়া আর কোন ফল নাই। যিনি কর্ম্মের নিয়ামক তিনিই যথাবিহিত করিবেন—ইহা চিন্তা করিয়া মনঃস্থির করিলাম।

এই দুশ্চিন্তার সহিত মনোমধ্যে কেমন একটা আনন্দ বোধ হইতে লাগিল। এ আনন্দটা কোন জাতীয় যাহারা এইরূপ অবস্থায় পড়িয়াছেন, তাহারা ব্যতীত অন্যে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না।

অপরিচিত স্থানে শীতের দ্বিপ্রহর রজনীতে কোথায় থাকিব স্থিরতা নাই, কোথায় কখন গাড়ি বদল করিতে হইবে

জানা নাই, না জানি কতই অসুবিধা ও বিপদে পড়িতে হইবে। চাণক্য পণ্ডিতের "পথে নারী বিবর্জ্জিতা" শ্লোকটাও মনে উদয় হইল। এই সব দুশ্চিন্তায় আনন্দ আসিতে পারে না, কিন্তু সত্য সত্যই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া আমি গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। গার্ড সাহেব সবুজ নিশানটা, চুরুট টানিতে টানিতে একবার নাড়িয়া দিল, ভীমকায় বাষ্পীয়যান বংশীধ্বনি করিয়া ছুটিতে লাগিল। আমার আর আনন্দের সীমা রহিল না।

গাড়িতে বসিয়া দুশ্চিন্তা যত বাড়িতে লাগিল, আনন্দে তত বুকটা ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। আজ জীবনে "নূতন একটা কিছু" হইবে। হয়ত নিজেদের অদৃষ্টে আহার জুটিবে না, শিশুদ্বয় দুগ্ধাভাবে ক্ষুধাপীড়িত কাতরকণ্ঠে চীৎকার করিবে, এই চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে গৃহিণীর ভৎসনা মিলিত হইয়া একটা বীভৎস ব্যাপারের সৃষ্টি করিবে। ইহার উপর দ্বিপ্রহর রজনীর দারুণ শীতে বাসা খুঁজিবার জন্য আরও কত কি অদৃষ্টে ঘটিবে। মোটের উপর দৈনিক "একঘেয়ে" ব্যাপারটা আজ আর ঘটিতে পাইবে না।

রজনী নয় ঘটিকার সময় আমাদের গাড়ী কিউল জংসনে আসিয়া উপস্থিত হইল। গাড়ী পরিবর্ত্তনের জন্য এই স্থানে আমরা অবতরণ করিলাম। এখান হইতে মেলে উঠিয়া

আমরা জামালপুরে আসিলাম। জামালপুর খুব বড় ষ্টেশন। বহু ইংরাজ ও বাঙ্গালী রেলকর্ম্মচারী এখানে আছেন। জামালপুরটি ভাল করিয়া দেখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সময়াভাবে তাহা ঘটিল না। এখান হইতে আমাদিগকে মুঙ্গের ব্রাঞ্চ লাইনে উঠিতে হইল। প্রায় একঘণ্টা পরে বংশীধ্বনি করিয়া বাষ্পীয়যান ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। এই গাড়ীতে একটিও বাঙ্গালী দেখিতে পাইলাম না। হিন্দুস্থানী ও বেহারী যাত্রীতেই গাড়ীখানি পরিপূর্ণ।

রজনী দ্বাদশ ঘটিকার সময় লৌহরথ আমাদিগকে মুঙ্গের ষ্টেসনে পৌছাইয়া দিল। উঠা নামার হাত হইতে আমরাও যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। মুঙ্গের ষ্টেসনে অবতরণ করিয়া এত রাত্রে স্ত্রীলোক ও শিশু দুইটাকে লইয়া কোথায় যাইব, তখন এই দুশ্চিন্তা ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিল। এতক্ষণ সেটাকে কৌতুকের বিষয় বলিয়া ভাবিতেছিলাম, এক্ষণে বিপদের সম্মুখীন হইয়া সেটা যে উপহাসের বিষয় নহে, তাহা স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হইল।

যথাসাধ্য চেষ্টা ও অনুসন্ধানে বুঝিলাম এত রাত্রে এই অজানা দেশে অন্যত্র স্থান পাইবার উপায় নাই। বুঝিলাম বিপদ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে।

ষ্টেশনের পার্শ্বে একখানি এক্কা দাঁড়াইয়াছিল। এখান-

কার একাগুলি টমটম নামে অভিহিত। ভীষণ শীতে অস্থিচৰ্ম্মসার অশ্বিনীকুমার ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছেন। সারথীর কিঞ্চিৎমাত্রও এই জীবটীর প্রতি সহানুভূতির লক্ষণ দেখিলাম না। তাহার দৃষ্টি কেবল শীকার লক্ষ্য করিয়া বেড়াইতেছিল। সে শীকারের আশায় অনেকক্ষণ আমাদের দিকে চাহিয়া থাকিয়া যখন বুঝিল যে, কিছুমাত্র আশা নাই, তখন ক্রোধব্যঞ্জক দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাহিয়া সজোরে অশ্বপৃষ্ঠে কষাঘাত করিতে লাগিল। অশ্ব-বেচারি শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে টম্‌টমখানি টানিয়া প্রভুর গৃহাভিমুখে ছুটিল। অস্থিচৰ্ম্মসার শীতকাতর বৃদ্ধ অশ্বটীকে যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে দেখিয়া একটা ভারি বোঝা যেন আমার বুক হইতে নামিয়া গেল।

এতক্ষণ আমি অনিমেষ নয়নে অশ্বিনীকুমারের দুর্গতি লক্ষ্য করিতেছিলাম। তাহাকে নিষ্কৃতি পাইতে দেখিয়া নিজেদের দুর্গতির কথা মনে পড়িল। বহু অনুসন্ধানের পর ষ্টেশনে একটি বাঙ্গালী বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইনিই হিন্দুস্থানি কৰ্ম্মচারিদের মধ্যে "হংসমধ্যে বক যথা" প্রায় বাঙ্গালী কেরাণী। ষ্টেশনে সকলেই বেহারী ও হিন্দুস্থানী—সুতরাং ইহাঁদের নিকট সহানুভূতির প্রত্যাশা করা কতদূর সঙ্গত—যাঁহারা ভুক্তভোগী তাঁহারা অবগত আছেন।

বাঙ্গালী বাবুটীর নিকট আমাদের বিপদের কথা বর্ণনা করিলাম। এরূপভাবে স্ব ইচ্ছায় বিপদ ও অসুবিধাকে ডাকিয়া আনিয়া আমি যে বুদ্ধিমানের কার্য্য করিয়াছি, ইহা তিনি মোটেই স্বীকার করিলেন না এবং একটা ছোট-খাট বক্তৃতাচ্ছলে উপদেশ প্রদান করিতেও তিনি বিরত হইলেন না। এই সময় ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলাম, একটা বাজিয়া তিন মিনিট হইয়াছে।

যাহা হউক তাঁহার সহিত পরিচয় হইলে তিনি যত্নের সহিত থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাঁহার আদর যত্নে আমরা গৃহের বাহির হইয়াছি বলিয়া মনে হইল না।

প্রত্যূষে উঠিয়া পুণ্যতোয়া জাহ্নবীতীরে ভ্রমণ করিয়া আসিলাম। পতিতপাবনী কলুষনাশিনী ভাগিরথীতীরে সুনির্ম্মল বায়ুসেবনে আমার সমস্ত অবসাদ ও ক্লান্তি দূর হইয়া গেল। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই দুইখানি গাড়িভাড়া করিয়া সীতাকুণ্ড অভিমুখে চলিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মুঙ্গের ষ্টেশন হইতে সীতাকুণ্ড তিন মাইল দূর। তখন পূর্ব্বদিক লোহিতাভায় সবেমাত্র রঞ্জিত হইতেছে, পুলকিত অন্তরে চারিদিক দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। মুঙ্গেরের কেল্লার ধ্বংশাবশেষ দেখিয়া মুসলমান রাজত্বের কত ঐতিহাসিক ঘটনা স্মৃতিপথে উদিত হইতে লাগিল। জগতে সকলেই যে নশ্বর, প্রবল রাজশক্তিও একদিন যে ধুলিকণার সহিত মিশাইয়া যায়, মুঙ্গের কেল্লার ভগ্ন ইষ্টকের উপর এককথাগুলি কে যেন অনলাক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছে। কেল্লার উপর শ্বেতাঙ্গদের যে অট্টালিকাগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে, সেগুলিও এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণ করিয়া দিতেছে।

কেল্লা দেখিবার জন্য আমরা গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। এই কেল্লা কাহার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে। লোকে সাধারণতঃ বলিয়া থাকে যে, মহাভারতোক্ত জরাসন্ধ রাজার এই কেল্লা ছিল—পরে মুসলমান শাসন সময়ে মুসলমানদিগের হস্তে পতিত হয়। মীরকাশিম বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন নবাব· তাঁহার সময়ে ইহা পুনরায় মেরামত হইয়াছিল এবং তিনি রাজধানী মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া মুঙ্গেরে আসিয়া

বাস করিয়াছিলেন। মীরকাশিম এই মুঙ্গের দুর্গ হইতেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভকে গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন এবং আরো অনেক নৃশংস হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মীরকাশিমের সহস্রগুণ ছিল—কিন্তু তিনি এই ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়া চিরদিনেব জন্য নিজ নামে কলঙ্ককালিমা অর্পণ করিয়া গিয়াছেন।

মুঙ্গের দুর্গের ভিতর জেল, আফিস, আদালত, চার্চ্চ ও ইংরাজের কবর স্থান আছে। স্থানটী অতি মনোরম--কাবণ গঙ্গাগর্ভ হইতেই ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে।

এই দুর্গটী দীর্ঘে চারিহাজার ফুট এবং প্রস্থে তিন হাজাব পাঁচশত ফিট্‌ এই প্রকার অনুমিত হইয়া থাকে। দুর্গ-প্রাচীব প্রায় ১৪।১৫ হাত উচ্চ। প্রকৃতির বক্ষের উপর ইহা অবস্থিত বলিয়া তিন দিকে প্রাচীর আছে- -অপর দিকে স্বয়ং ভাগীরথী প্রবাহিত হইতেছেন। দুর্গেব প্রবেশ তোরণকে "লাল দরওয়াজা" বলে।

অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোক বায়ু পরিবর্ত্তনার্থ মুঙ্গের আসিয়া থাকেন—তাঁহারা দুর্গ-মধ্যে বাটীভাড়া কবিলে অতি আরামে থাকিতে পারিবেন। পথ ঘাট অতি পরিষ্কার —বাজার অতি সন্নিকট—তারপর ভাগীবথীর নির্ম্মল বায়ু সেবনে যথেষ্ট উপকার দর্শিতে পারে।

আমবা আব অপেক্ষা করিতে না পারিয়া পুনবায় শকটে আসিয়া বসিলাম। তখন একবাব মনে হইতে লাগিল যে, সঙ্গে যদি লটবহর না থাকিত—দিনকয়েক এই স্থানে বাস করিতাম। কি সুন্দর স্থান!

কিন্তু যাহা ইচ্ছা কবা যায়—তাহা পবিপূর্ণ হয় না। সময়ান্তবে এই কথা গৃহিণীকে বলিয়াছিলাম বলিয়া তাহাব জন্য যথেষ্ট ফলভোগ করিয়াছি। কি কঠিন নিগড়ই আমবা পায়ে বাঁধিয়াছি!

বেলা নয় ঘটিকার সময় আমবা সীতাকুণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দলে দলে পাণ্ডা আসিয়া আমাদের গাড়িব চতুর্দ্দিকে পবস্পব বাক্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সকলেই জয়লক্ষ্মীকে করতলগত করিবাব জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ কবিয়া অবশেষে উচ্চৈঃস্ববে বলিল"আমার যজমান।" কেহ কেহ বলিল, "আমার বহুকালের পৈত্রিক যজমান।" তাহাদের হট্টগোলে কর্ণ বধির হইবার উপক্রম হইল, অতি কষ্টে আমরা তাহাদেব আত্মকলহ মীমাংসা করিয়া ভিতবে প্রবেশ করিলাম।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা সীতাকুণ্ডের "মিনারেল ওয়াটাব" সম্বন্ধে যাহাই ব্যাখ্যা করুন, অথবা তাঁহাদের প্রসাদভোজী ইংরাজীনবিশ বাবুরা সীতাকুণ্ডের জলের উপকারিতা সম্বন্ধে যাহাই বর্ণনা করুন, হিন্দুর চক্ষে যিনি সীতাকুণ্ড

দেখিবেন, তাঁহাকে পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। স্থানটী বড়ই পবিত্র ও আরামপ্রদ। দেখিলাম কত নরনারী, কত বালকবালিকা বৃদ্ধ ও যুবতী এই স্থানে স্নানদানাদি করিতেছেন। এখানে তীর্থযাত্রীদের বিশ্রাম করিবার জন্য দুইখানি ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ আছে, তাহার চতুর্দ্দিক প্রাচীর-বেষ্টিত, মধ্যে সুবৃহৎ প্রাঙ্গণ। সহস্র সহস্র লোক স্বচ্ছন্দে এই প্রাঙ্গণে বিচরণ করিতে পারেন। নিত্য যে কত সাধু, সন্ন্যাসী, যোগী এই কুণ্ডের জলে স্নান করিবার জন্য আগমন করেন তাহার ইয়ত্বা নাই।

কুণ্ডপ্রাচীরের চারিদিকে বৃক্ষশ্রেণী। নিবিড় বৃক্ষ-পত্রের অন্তরালে নানাজাতীয় বিহঙ্গমের মধুর কলরব, সাধু সন্ন্যাসিগণের স্তোস্ত্র ও ভজন-সঙ্গীতে স্থানটীকে যেন মধুময় করিয়া তুলিয়াছে। চারিদিক্ ঘুরিতে ঘুরিতে আনন্দে হৃদয় ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

শুনিলাম কয়দিন এখানে একজন সন্ন্যাসী আসিয়া বাস করিতেছেন। সন্ন্যাসীকে দর্শন করিবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাঁহার ভক্ত চেলাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম সাক্ষাতের এখনও বিলম্ব আছে। সন্ন্যাসী যোগরত হইয়া গৃহের মধ্যে রহিয়াছেন।

স্ত্রীলোকেরা স্নানাদি করিতে গেল। পাণ্ডাদের তখনও

বিবাদ শেষ হয় নাই। ইহাদের ব্যবসা পরিচালনার দক্ষতা ও কৌশল দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। ভাবিলাম তীর্থের পাণ্ডারা কি ভয়ঙ্কর জীব! ইহারা স্নানের সময় ফুল ও তুলসী হস্তে অর্পণ করিয়া ষোলআনা দক্ষিণা দিবার জন্য স্ত্রীলোক-দিগকে অগ্রে প্রতিশ্রুত করাইয়া লয়।

দিবা সার্দ্ধদশ ঘটিকার সময় স্বামীজি বাহির হইয়া আসিলেন। আমি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। তিনি আমাকে জুতা দূরে রাখিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। কিয়ৎ-ক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিবার পরেই তাঁহার প্রতি আমার অগাধ ভক্তি জন্মিল। বুঝিলাম ইনি ব্যবসাদার সাধু নহেন।

তাঁহার সহিত আমার অনেক কথা হইল, হৃদয়ের দুই একটী ব্যথার কথাও বলিলাম। সাধু বলিলেন "তোমরা সংসারী জীব, শান্তির কি কাজ করিতেছ বাবা, যে শান্তি পাইবে?" স্নেহপূর্ণস্বরে অনেক তিরস্কারও করিলেন।

সীতাকুণ্ডের জলের কথা উঠিলে তিনি বলিলেন "ভগবানের রাজ্যে তাঁহার সৃষ্ট বস্তুর যেখানে বিশেষত্ব, সেই-খানেই তাঁহার লীলা বিশেষ ভাবে প্রকটিত, সুতরাং পবিত্র স্থান। এই স্থান ভিন্ন আর কোথাও এমন গুণবিশিষ্ট জল নাই কেন? ইহা তীর্থস্থান বলিয়াই এখানে আসিয়া কয়দিন আছি।" জলের উপকারিতার কথা জিজ্ঞাসা করিলে

তিনি বলিলেন "পিত্তাধিক্য ধাতুর পক্ষে কুণ্ডের জল তেমন উপকারী নহে, কিন্তু বায়ু ও কফ প্রভৃতির পক্ষে এমন উপকারী জল আর কোথাও নাই। আমার এখন কয়দিন দেড় ছটাক করিয়া উষ্ণ জলের প্রয়োজন বলিয়াই এখানে আছি।" কি জন্য প্রয়োজন তাহা আর তিনি বলিলেন না। অনুমানে বুঝিলাম যোগের পর সীতাকুণ্ডের নানা রোগঘ্ন পবিত্র উষ্ণবারি কোন কারণে কয়দিন হয়ত তাঁহার শরীরের পক্ষে প্রয়োজন হইয়াছে।

কথা কহিতে কহিতে কখন দিবা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে তাহা জানিতে পারি নাই। অনিচ্ছাসত্বে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইল। সঙ্গে স্ত্রীলোক ও শিশু দুইটি না থাকিলে এত শীঘ্র তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইত না। আসিবার সময় সন্ন্যাসী বলিলেন "যেখানে মায়েরা যান, সেইখানেই সংসার। উঁহাদের কষ্ট হইতেছে তুমি শীঘ্র লইয়া যাও।" তিনি বুঝি ইঙ্গিতে ভৎর্সনা করিলেন —"যদি এখানে আসিলে ত সঙ্গে করিয়া সংসার লইয়া আসিলে কেন?

সীতাকুণ্ড ত্যাগ করিয়া আসিলাম বটে, কিন্তু অনেক জিনিস সন্ন্যাসীর কাছে রাখিয়া আসিতে হইল। গাড়িতে উঠিয়া সেই সন্ন্যাসীর চিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তা আর মনে

স্থান পাইল না। সংসারত্যাগী যথার্থ যোগীর কি অদ্ভুত ক্ষমতা। যতক্ষণ তাঁহার নিকটে ছিলাম, মন্ত্রপুত সর্পের ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিগুলাও যেন ফণা নত করিয়াছিল। বারংবার মনে হইতে লাগিল কেন এমন সংসর্গ ত্যাগ করিলাম।

কোন্ পথ দিয়া কতক্ষণ গাড়ী ছুটিয়া আসিল মনে নাই। আমি কেবল সীতাকুণ্ড ও সেই সন্ন্যাসীর কথাই ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছিলাম। অশ্বচালক চীৎকার করিয়া বলিল "বাবু আমরা পীরপাহাড়ে আসিয়াছি।" পীরপাহাড় দেখিবার জন্য আমরা পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিলাম। মাতুল মহাশয় উদর পূর্ণ করিয়া সীতাকুণ্ডের জল পান করিয়াছিলেন। সীতাকুণ্ডের উষ্ণবারি যে অত্যন্ত ক্ষুধা-বর্দ্ধক—ইহা তাঁহার বাল্যকাল হইতেই লোকপরম্পরায় শুনা ছিল। সুতরাং তিনি এরূপ অপূর্ব্বসুযোগ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই তিনি বলিলেন "বাবা, ক্ষুধায় আমার প্রাণ যায় যায় হইয়াছে।" মাতুলের সে সময়কার অবস্থা দেখিয়া হাসির কোলাহল উঠিত। কিন্তু পর্ব্বতগাত্র হইতে পদস্খলনের আশঙ্কায় অতি কষ্টে সে সময় হাস্য সম্বরণ করিতে হইয়াছিল।

পীরপাহাড়ে উঠিলে মুঙ্গের সহরটি বেশ সুস্পষ্ট ভাবে

দেখিতে পাওয়া যায়। পীরপাহাড়ের উপর হইতে আমরা সহরটি ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। এই পাহাড়ের উপর সুন্দর একটী দ্বিতল বাঙ্গালা আছে। বাঙ্গালার সম্মুখে বিস্তৃত উদ্যান। মুঙ্গেরে যাঁহারা বেড়াইতে আসেন, সকলেই এই পীরপাহাড় ও বাঙ্গালাটি যেন দেখিয়া যান। সত্যই ইহা দেখিবার জিনিষ! মীরকাশিমের সময় পীরপাহাড়ের উপর এই বাঙ্গালাটি প্রস্তুত হয়। তাহার পর একজন ইংরাজের ইহা নিজ সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত হয়। কিয়দ্দিবস পরে ইহা ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুরের জমিদারী ভুক্ত হয়। তিনি এই পাহাড়ের উপর একটি কূপ খননের চেষ্টা করেন। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও জল বাহির করিতে পারেন নাই। কূপের গভীরতা দেখিলে মনে হয়, তিনি ইহাতে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। শুনিলাম স্বর্গীয় মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরও পাহাড়ের এই বাঙ্গালাটির শোভাবর্দ্ধনের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। এখন ইহা চন্দননগরের মণ্ডলদের সম্পত্তি। ইহারা আমাদিগকে সমাদরের সহিত সকল স্থান দেখিবার সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

পীরপাহাড়ের নীচে একটি সুবৃহৎ কূপ আছে। ইহার সুনির্ম্মল জল অত্যন্ত স্বাস্থ্যপ্রদ। শুনিলাম বহু ইংরাজ ইহার জল পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, এই জলের সহিত

স্বর্ণের অংশ বিদ্যমান আছে। মুসলমান রাজত্বের সময়ে এই পাহাড়ের উপর পীর থাকায় ইহার নাম পীরপাহাড় হইয়াছে। পাহাড়ের পশ্চাদ্দিকে চাহিলে কেবল শ্যামল বনরাজি ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। মনে হয় ইহা যেন প্রকৃতির লীলা নিকেতন।

পর্ব্বতে ঘুরিতে ঘুরিতে বেলা তিনটা বাজিয়া গেল। ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা আমরা বিস্মৃত হইয়াছিলাম। মাতুল যে ক্ষুধার তীব্র দংশনে মনে মনে অভিসম্পাত করিতেছিলেন, ইহা তাঁহার মুখ বিকৃতিতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। মাতুলের সহিত কৌতুক করিয়া আর অভিসম্পাতগ্রস্থ হওয়া কর্ত্তব্য নহে মনে করিয়া আমরা পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলাম।

ইহার পর মুঙ্গেরের রায় বাহাদুর বৈজনাথ গোয়েঙ্কার ধর্ম্মশালা দেখিয়া আমরা ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিলাম। এই ধর্ম্মশালাটী দ্বিতল এবং সুব্যবস্থার গুণে সর্ব্বক্ষণই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রহিয়াছে। যে সমস্ত তীর্থস্থানে ধর্ম্মশালা আছে, সমস্তই প্রায় মাড়োয়ারীদের অর্থে নির্ম্মিত। ইহাদের অর্থোপার্জ্জন সার্থক। মুঙ্গেরের এই ধর্ম্মশালাটীতে নিত্য বহু নরনারী সীতাকুণ্ড দর্শনে আসিয়া এখানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দুঃখের বিষয় ধনবান বাঙ্গালীদের এরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানে মতিগতি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না!

ষ্টেশনে বাঙ্গালীবাবুটী আমাদিগকে আহারাদি করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমাদিগকে সেই দিনেই ঝাঝায় ফিবিতে হইবে, সুতরাং তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে না পারায় দুঃখের সহিত ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইয়া গাড়িতে উঠিলাম।

প্রস্তুত অন্ন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসা যে আমার বুদ্ধিমানের কার্য্য হইল না, মাতুল ক্ষুব্ধচিত্তে বারম্বার ইহা বলিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই ক্রোধব্যঞ্জক দৃষ্টি ও উপদেশ বাণী সকলেবই গাম্ভীর্য্য নষ্ট করিয়া হাস্যধ্বনিতে পরিণত করিল।

মাতুলেব অভিসম্পাত হাতে হাতে ফলিয়া গেল। কিউল জংসনে অবতরণ করিয়া রজনী দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও আমরা গাড়ী পাইলাম না। সমস্ত রজনী কিউলের ধর্ম্মশালায় আমাদিগকে অতিবাহিত করিতে হইল। রজনী দ্বিপ্রহরের সময় মাতুল মহাউৎসাহের সহিত আহারাদির উদ্যোগ করিতে ব্যস্ত হইলেন। মাতুলকে বাধা দেওয়া কাহাবও সাহসে কুলাইল না।

*কিউলেব ধর্ম্মশালা সংলগ্ন ৩।৪ খানি দোকান আছে। ইহাই কিউলের বাজার নামে প্রসিদ্ধ। সে দিন সেই ধর্ম্মশালাটীর আমরাই মালিক হইয়া পড়িলাম। অন্য লোকজন সে দিন কেহই ছিল না। দ্বারবান পুরস্কারের লোভে

শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া আমাদের হুকুম তামিল করিতে লাগিল। গৃহিণী শঙ্কিত হৃদয়ে বলিলেন "পাঁড়েজীর ভক্তির বাড়াবাড়ি দেখিতেছি, অতি ভক্তি দেখিয়া অন্ধকার রাত্রে মাঠের মধ্যে সত্যই আমার ভয় হইতেছে।" মাতুল তাড়াতাড়ি পৈত্রিক ভগ্ন চাকু ছুরিখানি মনিব্যাগ হইতে বাহির করিয়া বলিলেন—"ভয় নাই মা! মামা তোমার অস্ত্র ছাড়িয়া আসে না।" মাতুলের সিংহবিক্রম দেখিয়া হাসির কোলাহলে আঁধার রজনীর নিস্তব্ধতা ক্ষণেকের তরে ভঙ্গ হইয়া গেল। পাঁড়েজি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া আমাদের দিকে চাহিয়া রহিল।

মাতুলের কাতর চীৎকারে দোকানদারেরা শয্যা ত্যাগ করিয়া দোকানের ঝাঁপ উঠাইল। তিনি চাউল, ডাউল, ঘৃতাদি সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। আহারের পূর্ব্বেই কিউলের ধর্ম্মশালায় আমাদের রজনী প্রভাত হইয়া গেল। মাতুল সঙ্গে না থাকিলে সে কাল রজনী প্রভাত হইত কিনা কে জানে। গৃহিণীর মতে আমাদিগকে নিদ্রিত দেখিলেই পাঁড়েজী যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত।

দ্বারবান পাঁড়েজিকে পুরস্কারে সন্তুষ্ট করিয়া পরদিন ৯টার ট্রেনে আমরা ঝাঝায় প্রত্যাগমন করিলাম। মুঙ্গের ভ্রমণে এই পাঁড়েজী ও বাঙ্গালী বাবুটির উপকার অনেক

দিন আমাদের মনে থাকিবে। মাতুলের ক্ষুধা ও সাহসের কথাটাও বিস্মৃত হইবার নয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মুঙ্গের হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আরও কয়েক দিবস ঝাঝার বাঙ্গালায় বাস করিলাম! এক স্থানে বসিয়া থাকা আমার অভ্যাসবিরুদ্ধ! তাহার উপর ঝাঝার নির্জ্জনতা বিদ্রোহী হইয়া আমাকে ত্যক্ত করিয়া তুলিল—ক্রমশঃ আমার ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিল। অগত্যা ঝাঝা পরিত্যাগ করিয়া বৈদ্যনাথ জংসনে একটি বাঙ্গালা ভাড়া লইয়া স্থান পরিবর্ত্তন করিলাম। নূতন স্থানে আসিয়া কয়েকদিন বেশ আনন্দে কাটিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এক স্থানে কয়েদীর মত আবদ্ধ থাকা আমার অভ্যাসের চিরবিরুদ্ধ! শরীর অসুস্থ হইলে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার যাতনা—রোগযন্ত্রণাপেক্ষাও অধিকতর কষ্টকর বলিয়া মনে হয়। বৈদ্যনাথ জংসনে দিনকতক থাকিবার পর আর বসিয়া থাকিতে ভাল লাগিল না। "কোথায় যাই" "কি করি" অহরহঃ এই কথাই মনে হইতে লাগিল। আমার শরীর সুস্থ হইবার

পূর্ব্বেই বৈদ্যনাথ হইতে যেন "কলিকাতা পালাইয়া না আসি" এই মর্ম্মে আমার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণ বার বার পত্র লিখিতে লাগিলেন। তাঁহাদেব সেই স্নেহানুরোধ উপেক্ষা করিয়া কলিকাতা আসিতে ইচ্ছা হইল না। আমাব স্বভাব ও অভ্যাসের ধাঁবা বন্ধুবর্গেব অবিদিত নাই, সুতরাং প্রতি-পত্রেই আমার অসুস্থ দেহে কলিকাতা ফিবিবাব বিরুদ্ধে সঙ্কেতধ্বনি পঁহুছিতে লাগিল। বন্ধুবর্গেব ভয়ে আমি চুপ করিয়া বৈদ্যনাথে কাবাযন্ত্রণা ভোগ কবিতে লাগিলাম। এই যাতনার উপর মাঝে মাঝে ম্যালেরিয়া জ্বরের কশাঘাতও সহ্য করিতে হইল। সুতবাং বৈদ্যনাথ বাস আমার পক্ষে কিরূপ সুখকব হইতেছিল—পাঠকগণ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

এক দিন অপরাহ্নে সান্ধ্যভ্রমণে বহির্গত হইয়া একটি মৌয়া বৃক্ষের তলে বসিয়া শৈশব ও যৌবনের অতীত ঘটনা স্মৃতির পাতা উল্টাইয়া দেখিতেছিলাম। অতীতকালের ক্ষত শুষ্ক হইয়া যাইলেও হৃদয়ের বেদনা যে শুষ্ক হইয়া যায় নাই, চক্ষুকোণে দুই বিন্দু অশ্রু জমিয়া সে কথা আমাকে বুঝাইয়া দিল। মৌয়াগাছের পাতাগুলি বায়ু হিল্লোলে একবার স্বন্ স্বন্ শব্দ করিয়া নিস্তব্ধ হইল। মৌয়াগাছের পাতা-গুলি নড়িয়া উঠিয়া নিস্তব্ধ হইবামাত্র আমার মনে ভাবান্তর

উপস্থিত হইল। ভাবিলাম জগতে স্থায়ী ত কিছুই নহে। মৌয়াগাছের পাতাগুলির মত একবার নড়িয়া উঠিয়া সবই যেন নিস্তব্ধ হইয়া যায়। জগতের এই অজ্ঞাত বিধানের কথা আমি ক্ষুদ্র মানব কি বুঝিব?

নিজের মনে সেই নির্জ্জন মৌয়াগাছের তলে বসিয়া কত কি ভাবিতে লাগিলাম। হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সেই সুবৃহৎ মৌয়াগাছের শিরোদেশে বসিয়া একটা পাখী আমারই মত নিজের মনে ডাকিতে লাগিল। পাখিটির স্বর কি সুন্দর! দেখিতে দেখিতে পাখিটিও আকাশের গায়ে উড়িয়া গেল। পাখির সেই সুরলহরিও থামিয়া গেল। মৌয়া গাছের শিরোদেশ নিস্তব্ধ হইল।

অরণ্যের পার্শ্ব দিয়া একটি সঙ্কীর্ণ পথ বহু-দূর চলিয়া গিয়াছে। দুইটি পথিক সেই সঙ্কীর্ণ পথের উপর দিয়া সাংসারিক সুখদুঃখের কথা কহিতে কহিতে যাইতেছে। তাহাদের সাংসারিক কথার মধ্যে একজন অপরকে দৃষ্টান্তচ্ছলে বলিল—"সেই রামও নাই, আর তখনকার সেই অযোধ্যাও নাই।"

পথিকের কথাটি আমার হৃদয়ে গিয়া আঘাত করিল। মনে মনে বলিলাম পথিক একটি মর্ম্মভেদী মূল্যবান উপদেশ বাণী আমায় শুনাইয়া গেল। স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম রাম মানবের

হিতার্থে সংসারের এই অনিত্যতা দেখাইয়া গিয়াছেন। এই জাজ্জল্যমান দৃষ্টান্ত দেখিয়াও যদি আমরা দম্ভ অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া সংসারের অনিত্যতা বুঝিতে না পারি—সে কি আমাদের দুর্ভাগ্যের লক্ষণ নহে?

যে যুগের কথা শ্মশানের নির্ব্বাণোন্মুখ চিতাগ্নি-শিখার মত আজও ভারতের বুকে মিটিমিটি জ্বলিতেছে, যেখানে পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে স্থলে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন, যে পুণ্যভূমিতে আজও ধর্ম্মপ্রাণ ভারতের নরনারী পিতৃলোকের পিণ্ডদান ও তর্পনাদি করিয়া থাকেন, সেই অতীত যুগের কথা স্মরণ করিয়া যেখানে আজও মহামুনি বশিষ্ঠের আশ্রম ও বসিষ্ঠকুণ্ড দর্শনাশায় অগণিত নরনারী পাগলের মত ছুটিয়া থাকে, সেই পুণ্যভূমি অযোধ্যাধাম বা রামগয়া তীর্থ দেখিবার জন্ত প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

বৈদ্যনাথ জংসনের স্খলিতদন্ত গলিতকেশ ষ্টেশনমাষ্টার বাবু বহু দেশ ও বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন—মাঝে মাঝে তাঁহার ভ্রমণের গল্প শুনিতে যাইতাম। সুর তান লয় সংযোগে স্খলিত দন্তে হাসিতে হাসিতে তিনি আদর করিয়া আমাকে তাঁহার ভ্রমণ কাহিনী শুনাইতেন। আমার মত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুশীল শ্রোতা তাঁহার আর জুটিত না।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ভ্রমণ কথা শুনিতে শুনিতে সত্যই এক এক দিন আমি বড়ই আনন্দ পাইতাম। নিঃসঙ্গ অবস্থায় এই ষ্টেসনমাষ্টারের গল্পকাহিনী আমার দীর্ঘদিনগুলিকে অতি ছোট করিয়া আনিত।

প্রবাসবাসে আমার এই বৃদ্ধ সঙ্গীটিকে অযোধ্যা ভ্রমণের অভিলাষ জ্ঞাপন করিবামাত্র তিনি বিস্মিতনয়নে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ তাঁহার মুখ হইতে বাক্য নিঃসৃত হইল না।

একটু পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া ষ্টেসনমাষ্টার বাবু বলিলেন—"এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে কদাচ হস্তক্ষেপ করিবেন না। অযোধ্যা অতি ভীষণ স্থান। সেখানকার পাণ্ডারা এক একটি যমদূতের ন্যায়। তাহারা যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া পরে নিঃসহায় যাত্রীদিগকে তাড়াইয়া দেয়। আমি অযোধ্যা ষ্টেশন হইতে তাহাদের লাঠির বহর দেখিয়া প্রাণ লইয়া পালাইয়া আসিয়াছি।"

ইহা ব্যতীত তাঁহার পরিচিত, অপরিচিত লোকের নিকট হইতে অযোধ্যার পাণ্ডা ও গুণ্ডারা যে অলঙ্কার ও টাকাকড়ি বল প্রয়োগে আত্মসাৎ করিয়াছে তাহাও বলিতে লাগিলেন। তীর্থযাত্রীদের উপর নির্য্যাতনের বহু কাহিনীও তিনি শুনাইতে বিরত হইলেন না।

বৃদ্ধ মাষ্টারবাবুর কথায় একটু আশ্চর্য্য হইলাম বটে, কিন্তু অযোধ্যা ভ্রমণের ইচ্ছা আরও বলবতী হইয়া উঠিল। ভাবিলাম ষ্টেসনমাষ্টার বাবুর কথাগুলি যদি সত্যই হয়, তবে অযোধ্যা যাইয়া ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখিতেই হইবে। কৌতুহল এতই বাড়িয়া উঠিল যে, সে রাত্রে ভাবিতে ভাবিতে আমার আর নিদ্রা হইল না।

পাঠকগণকে আমার স্বভাবের কথা এই স্থানে একটু বলিয়া রাখি। আমি যখন যে কার্য্য করিব বলিয়া স্থিরপ্রতিজ্ঞ হই—যতক্ষণ না উহা কার্য্যে পরিণত হয়, ততক্ষণ আমার আহার নিদ্রার প্রবৃত্তি থাকে না। সুতরাং আমার মনটা যখন অযোধ্যার দিকে ছুটিয়া গেল, তখন কোন প্রতি-বন্ধকই তাহাকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না।

পরদিন গৃহিণী ও ভ্রাতৃবধুর অলঙ্কারগুলি ইন্সিওর করিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়াদিলাম। বৃদ্ধব্রাহ্মণের উপদেশ অবহেলা করিবার সাহস হইল না। প্রভাত হইতেই অযোধ্যা যাত্রার আযোজন হইতে লাগিল। গৃহিণী এসব কার্য্যে একবারে সিদ্ধহস্ত। ভ্রমণে যেগুলা একেবারে অনাবশ্যক সেগুলাও গ্রহণ করিতে গৃহিণী কোন দিন বিস্মৃত হ'ন না। এক্ত অনাবশ্যকীয় বোঝা লইয়া রেলপথে গমনাগমন যে সমূহ অসুবিধাজনক একথা গৃহিণী শ্রবণযোগ্য বিবেচনা করিলেন

না। তিনি তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিলেন—"পথে কখন্ কাহার কোন জিনিসটি প্রয়োজন হইবে, তাহা তোমার জানা থাকিলে বিজ্ঞের মত উপদেশ দিতে সাহস করিতে না।" অগত্যা আমি নিরস্ত হইলাম।

সত্য বলিতে গেলে গৃহিণীরও দোষ ছিল না। প্রবাসে অনেক সময় অনাবশ্যকীয় জিনিসও নিতান্ত প্রয়োজনের মধ্যে আসিয়া পড়ে। দেশভ্রমণের ফলে গৃহিণী এই অভিজ্ঞতা আমাপেক্ষা অনেক অধিক অর্জ্জন করিয়াছেন। বিশেষতঃ সংখ্যায় আমরা অনেকগুলি। তিনটি স্ত্রীলোক, একটি বালক, দুইটি শিশু, ভৃত্য, আমি ও আমার সেই মাতুলটি স্বয়ং—স্বশরীরে আমদের সঙ্গী। সুতরাং আমরা গণনায় নয়জন। এতগুলি লোকের প্রয়োজনীয় দ্রব্য গৃহিণীকে সঙ্গে লইতে হইয়াছে।

১৩২০ সালের ১৪ই মাঘ অপরাহ্ণ চারিটার সময় বৈদ্যনাথ জংসন হইতে অযোধ্যা গমনের জন্য প্যাসেঞ্জার ট্রেনে আরোহণ করিলাম। দুগ্ধপোষা শিশু ও স্ত্রীলোক লইয়া বিদেশে ভ্রমণে বহির্গত হইতে হইলে যে কি অসহনীয় ঝঞ্ঝট ভোগ করিতে হয়, যাঁহারা ভুক্তভোগী তাঁহারা অবগত আছেন। জংশন হইতে দুটি ষ্টেসন বাষ্পযান বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে ছুটিয়া গেল, তখনও আমাদের জিনিষ

পত্র সাজান শেষ হইল না। আমার বন্দোবস্ত গৃহিণীর মনঃপুত হইতেছিল না। সুতরাং তিনি পোর্টমেণ্টগুলার স্থানে আহারীয় দ্রব্যের বোঝা ও আহারীয় দ্রব্যের স্থানে পানীয় জলের পাত্র রক্ষা করিয়া গাড়ীর মধ্যে কেবল যে একটা বিপ্লবের সৃষ্টি করিলেন তাহা নহে—আমার ঘণ্টা-ব্যাপি পরিশ্রমের যে একটুও মূল্য আছে, এ কথাটা তাঁহার কার্য্যে ও ব্যবহারে বিন্দুমাত্র প্রকাশ পাইল না। "তর্কে আবার বিপরীত ফল" হইবে ভাবিয়া আমি গৃহিণীর এই অবিবেচনা ও অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া রহিলাম।

বাষ্পজান গৃহিণীর এই ব্যবহারের দিকে আদৌ লক্ষ্য না করিয়া গম্ভীরভাবে ছুটিতে লাগিল। তখন সন্ধ্যা আগমনের কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। সূর্য্যদেব ক্রমশঃ পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িতেছেন, আর পাহাড়ের গায়ে, শালবৃক্ষের উচ্চশাখায়,—লতায় পাতায় চারিদিকে স্বর্ণরেণু ছড়াইয়া দিতেছেন! গাড়ীর দ্রুতগমনে বোধ হইতে লাগিল যেন, পাহাড়ের গায়ে গায়ে স্বর্ণ-রেণু ঝরিয়া পড়িতেছে। অভিনব অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে আমার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। উচু নীচু পাহাড়গুলিকে যেন বাস্তবিকই সুবর্ণমণ্ডিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। একবার ঊর্দ্ধে—আকাশে—একবার স্বর্ণমণ্ডিত পাহাড়গুলির দিকে চাহিয়া জীবন সার্থক বোধ

হইতে লাগিল। আনন্দে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম—"মাগো! প্রকৃতি দেবী! তোমার মত শোভাসম্পদময়ী সুন্দরী জগতে আর কে আছে? আজ কি অপরূপ রূপ দেখাইলি মা! এই রূপের শোভা আর কি কখনও জীবনে দেখিতে পাইব মা?"

প্রকৃতি দেবীর এই রূপচ্ছটা অধিকক্ষণ আর অদৃষ্টে দেখা ঘটিল না! অল্পক্ষণের মধ্যেই নিবিড় অন্ধকাররাশি আসিয়া চক্ষুকে অন্ধ করিয়া দিল। প্রকৃতিদেবীর সেই অপরূপ রূপ কোথা হইতে অন্ধকাররাশি আসিয়া যেন নিমেষে ঢাকিয়া ফেলিল। জগতের নিয়ম এই কেহ কাহারও ভাল দেখিতে পারে না। তমোরাশি এতক্ষণ ঈর্ষায় যেন জ্বলিতে ছিল—এক্ষণে এই বিরাট সৌন্দর্য্য মসীলিপ্ত করিয়া দিয়া যেন নিশ্চিন্ত হইল।

বাষ্পজান ডুমরাঁও ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া ছুটিতে লাগিল। নিবিড় অন্ধকার রজনী! বনের ধারে ধারে কুটীরগুলিতে মিটি মিটি করিয়া আলো জ্বলিতেছে! লোক-জনের সাড়াশব্দ নাই। নক্ষত্রখচিত আকাশ আর ঐ কুটীরের মিটি মিটি আলোগুলি ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না। ইহাও আমার জীবনে একটি অভিনব সুন্দর দৃশ্য! হু হু করিয়া শীতল বাতাস বহিতেছে, সকলেই

আপাদমস্তক শীতবস্ত্রে আবৃত করিয়া বসিয়া আছে, কেবল আমি সেই প্রবল শীতলবায়ুকে উপেক্ষা করিয়া জানালার ফাঁক দিয়া রজনীর অভিনব সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতে লাগিলাম।

বনের ধারে সেই কুটীরের মিটি মিটি আলোকগুলিকে মাঝে মাঝে আকাশের তারকা বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল। দিনমানে এসব স্থান যেরূপ দেখায়, রজনীর অন্ধকারে তদপেক্ষা সহস্রগুণ সুন্দর দেখাইতে লাগিল। আঁধার রজনীর এরূপ বিচিত্রতা জীবনে আর কখন দেখা ঘটে নাই। হৃদয়ে আনন্দ যেন ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

গাড়ী মোকামাঘাটে আসিয়া পৌঁছছিল, কিন্তু সেদিকে আমার লক্ষ্য ছিল না। হঠাৎ বহু কণ্ঠে "বাবু কুলি, বাবু কুলি," বিকট রবে আমার চেতনা ফিরিয়া আসিল। মোকামাঘাটে বহু লোক অবতরণ করিল। দলে দলে কুলি আসিয়া তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল,—একটা মোট লইয়া পাঁচজনে কাড়াকাড়ি আরম্ভ করিল। মনে হইল এটা বুঝি কুলিরই রাজত্ব!

মোকামাঘাটে আসিয়া মাতুলের ক্ষুধার উদ্রেক হইল। তিনি বারবার আহারীয় দ্রব্যের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। মাতুলের মুখের দিকে চাহিয়া আমি

আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। আমার হাসির মর্ম্ম অবগত হইয়া গৃহিণী মাতুলকে খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করিতে লাগিলেন। মাতুল আহার করিতে করিতে এক একবার তাচ্ছিল্যভাবে আমার দিকে চাহিতে লাগিলেন! সে তীব্র তাচ্ছিল্যদৃষ্টিতে মাতুল ইহাই জানাইতেছিলেন যে, "আমার হাঁসিকান্নায় তাঁহার কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, আরও তাঁহার আহারের কোন ব্যতিক্রম ঘটিবে না! যেহেতু "লক্ষ্মী মাটি'র কাছে" মাতুলের গুণের আদর সর্ব্বদাই জয়যুক্ত হইযা রহিয়াছে।" বলাবাহুল্য গৃহিণীই মাতুলের "লক্ষ্মী মা" এবং "লক্ষ্মী মা'টি" বলিয়া তাঁহার নিকট সর্ব্বক্ষণ অভিহিত হইয়া থাকেন। অমৃত মাখা "মা" শব্দে বন্ধ্যানারীর শুষ্ক হৃদয় হইতেও স্নেহকণা বহির্গত হয়, তদুপরি আমার গৃহিণী সন্তান-জননী। বলিলে গৃহিণীর প্রশংসা করা হয়—কিন্তু না বলিয়াও থাকিতে পারিতেছি না। গৃহিণী লোকজন ভোজন করাইতে বড়ই উৎসাহী। এই কার্য্যে তাঁহার যেমন আনন্দ ও যত্ন দেখিতে পাওয়া যায়—এরূপ আমি কোন কার্য্যেই দেখিতে পাই না।

লুচি, কচুরি ও আলুভাজাগুলি নিঃশেষ করিয়া মাতুল গৃহিণীর দিকে চাহিলেন। এই দৃষ্টির অর্থ মিষ্টান্ন পরিবেশন। আমি একটু কৌতুকের জন্য গম্ভীরভাবে গৃহিণীকে বলি-

লাম—"মিষ্টান্নের পুঁটুলি বস্তার মধ্য হইতে বাহির করিতে হইলে অনেক ঝঞ্ঝট ভোগ করিতে হইবে সুতরাং"—

মাতুলের চীৎকারে অবশিষ্ট বাক্য আমার মুখ হইতে আর বাহির হইল না। মাতুল লাফাইয়া উঠিয়া আমার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া সপ্তমস্বরে বলিতে লাগিলেন যে, "আমার সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই; তাঁহার লক্ষ্মী মা'টির মাতুল বলিয়া সেই সম্পর্কে আমি তাঁহার ভাগিন্-জামাই মাত্র! সুতরাং লক্ষ্মী মা'টি তাঁর যত কদর বুঝিবেন "জন জামাই ভাগনে" আমি তাঁর সে কদর বুঝিতে পারিব না।" বলা বাহুল্য লক্ষ্মী মা'টির তিনি আপন মাতুল না হইলেও গৃহিণীর প্রতি তাঁহার স্নেহ যে সহোদরাকন্যাপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক একথাও একাধিকবার উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন। গৃহিণী ক্ষিপ্রতার সহিত ত্বরিতহস্তে মিষ্টান্ন বাহির করিয়া মাতুলকে পরিবেশন না করিলে মাতুলের ক্রোধ সে দিন কিরূপে কোথায় গিয়া পরিসমাপ্তি হইত, অথবা মাতুল কি লঙ্কাকাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া "কালনেমীর" দ্বিতীয় সংস্করণ করিতেন, তাহা আজও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই! আহারাদির পর গৃহিণীর ইঙ্গিতে আমি মাতুলের নিকট ক্ষমা চাহিলাম। মাতুলও প্রফুল্লচিত্তে আমাকে ক্ষমা করিয়া গল্প আরম্ভ করিলেন। মাতুলের আজগুবি গল্প শুনিতে

গুলিতে আঁধার রজনীর তৃতীয় প্রহর গাড়ীর মধ্যে আনন্দেই অতিবাহিত হইয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রজনী চারি ঘটিকার সময় আমরা মোগলসরাই ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম। এই স্থান হইতে কন্‌কনে শীত আমাদের সঙ্গী হইল। কুলির মস্তকে জিনিষপত্র তুলিয়া দিয়া আমরা ওয়েটিংরুমে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

কথাবার্ত্তায় অবশিষ্ট রজনীটুকু ওয়েটিংরুমে অতিবাহিত হইয়া গেল। বেলা এগারটার সময় অযোধ্যার গাড়ী ছাড়িবে, অপেক্ষা করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই, সুতরাং ওয়েটিংরুমে স্ত্রীলোকদিগকে বসাইয়া ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে পদচারণা করিতে লাগিলাম।

বেলা ১১টার সময় পুনর্ব্বার কুলির মাথায় মোট চাপাইয়া আমরা অযোধ্যার গাড়িতে উঠিলাম। একজন রেলকর্ম্মচারী আসিয়া আমাদের টিকিট চেক করিয়া গেল। গৃহিনী জিনিষ পত্র তাঁহার মনোমত করিয়া আবার সাজাইতে আরম্ভ করিলেন। আমার পণ্ডশ্রম হইবে ভাবিয়া এবার

একটি জিনিষও স্পর্শ করিলাম না। গৃহিনী আমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া খুব উৎসাহের সহিত নিজ কার্য্যে মনঃসংযোগ করিলেন।

ইঞ্জিনখানা উচ্চৈঃস্বরে বংশীধ্বনি করিয়া আমাদিগকে লইয়া ছুটিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে চারি পাঁচটা ষ্টেশন পার হইয়া গেল।

দ্বিপ্রহর রৌদ্রে মাঠ ধূ ধূ করিতেছে! গাড়ী আরও কয়েকটা ষ্টেশন পার হইয়া গেল। এবার কেবলই সরিসা ক্ষেত্র। মাঠের পর মাঠ অতিক্রম করিয়া যাইতেছি—কিন্তু সরিসা ক্ষেত্রের বিরাম নাই। হরিদবর্ণ সরিসা ফুলগুলি বায়ু হিল্লোলে কখন উত্তরে, কখন দক্ষিণে হেলিয়া পড়িতেছে! সে কি অপরূপ শোভা!

গাড়ী যতই ছুটিতেছে ততই যেন বোধ হইতেছে কে যেন হরিদ্রাভ গালিচা সেই মাঠের উপর বিছাইয়া দিয়াছে।

আরও কয়েকটি ষ্টেশন পার হইয়া আসিলাম, এবার কেবল পিয়ারা গাছের বন। দুই তিন মাইল ব্যাপি কেবলই পিয়ারা গাছের নিবিড় বন দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর রেল লাইনের দুইদিকে যত দূর দৃষ্টি যায়, কেবল অরহর ক্ষেত্র! এরূপ নিবিড় অরহর ক্ষেত্র আর কখনও দেখি নাই।

রেলের দুই পার্শ্বে নিবিড় অরহর ক্ষেত্র দেখিতে দেখিতে আমরা Jafarabad (জাফারাবাদ) ষ্টেশনে আসিয়া পঁহুছিলাম। ইহার অনতিদূরেই জৈনপুর সহর। জাফারাবাদ ষ্টেশনটি ছোট। বড় বড় যষ্ঠি স্কন্ধে হল্লা করিয়া যাত্রীরা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে উঠিতে লাগিল। তাহাদের লাঠির বহর ও বুকের ছাতি দেখিয়া আমার দুর্ব্বল বাঙ্গালীর প্রাণ চমকাইয়া উঠিল।

জাফারাবাদ ষ্টেশনটি ক্ষুদ্র হইলেও স্থানটি অতি মনোরম। ষ্টেশনের চারি পার্শ্বে মুকুলে ভরা আম্র বৃক্ষ। চ্যুত মুকুলের কমনীয় গন্ধে প্রাণ মন মোহিত হইল। আমি নিবিষ্ট চিত্তে ষ্টেশনটির অপরূপ শোভা দেখিতেছি, এমন সময় আমাদের পরবর্ত্তী তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে ভীষণ কোলাহল উত্থিত হইল। কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া আমি গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে যাইয়া বসিলাম। গাড়ী পবনবেগে ছুটিতে লাগিল।

দেখিলাম তৃতীয় শ্রেণী গাড়ীখানি বড় বড় যষ্টি ও হিন্দুস্থানী পশ্চিমে যাত্রীতে পূর্ণ। অগণনীয় বড় বড় পাগড়িতে গাড়ীখানি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে।

তিল ধারণের স্থান নাই। জনৈক হিন্দুস্থাণী যাত্রী আমাকে ভদ্রবেশী বাঙ্গালী দেখিয়াই হউক—অথবা যে

কোন কারণেই হউক দয়াপরবশ হইয়া তাহার পার্শ্বে আমাকে একটু বসিবার স্থান করিয়া দিল।

একজন বৃদ্ধ হিন্দুস্থানীর সহিত একজন যাত্রীর বসিবার স্থান লইয়া বিষম ঝগড়া উপস্থিত হইয়াছে! শেষোক্ত লোকটি ভদ্র হিন্দুস্থানীর পোষাক পরিচ্ছদে ভূষিত। শেষে পরিচয়ে জানিলাম লোকটা কাশীর গুণ্ডা! বয়স অনুমান পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর হইবে! দেহে অপরিমিত শক্তি, সবল মাংসপেশী! দেহের শক্তি অপেক্ষা হস্তস্থিত লগুড়ের পরিমাণও অল্প নহে। লোকটা মুখের বিতণ্ডা শেষ করিয়া এখন যেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। বৃদ্ধকে এখনই যে আক্রমণ করিবে,তাহার বাহ্যাকৃতি ও মুখের বিকটভঙ্গি দেখিয়া সহজেই অনুমান করা যায়। অকথ্য ভাষায় বৃদ্ধকে গালাগালি করিয়াছে, গালাগালির এখনও বিরাম নাই,—কিন্তু আশ্চর্য্য এই বৃদ্ধ ধীর ও স্থিরভাবে অটল পর্ব্বতের ন্যায় বসিয়া আছে! তাহার প্রত্যেক অকথ্য ভাষা বৃদ্ধ উপেক্ষার হাসির সহিত উড়াইয়া দিতেছে! ভাবিলাম বৃদ্ধ কি বধির! কিন্তু বৃদ্ধের বধিরত্বের কোন লক্ষণই দেখা গেল না! বরঞ্চ তাহার শ্রবণশক্তি যে প্রবল, মুখের গাম্ভীর্য্য ভাব ও উজ্জ্বল প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাহা বুঝাইয়া দিতে লাগিল। তবে কি বৃদ্ধ ক্রোধজয়ী যোগী পুরুষ! অকথ্য ভাষার জর্জ্জরিত

হইয়া মাঝে মাঝে যখন বৃদ্ধের মুখের গাম্ভীর্য্য ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া ক্রোধজয়ী যোগীপুরুষ বলিয়াও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলাম না, তবে কি বৃদ্ধ ভীরু, কাপুরুষ, দুর্ব্বল চিত্ত? যাহার সমক্ষে পিতামাতার উদ্দেশে এরূপ অকথ্য ভাষায় গালাগালি বর্ষিত হইতেছে, সে তাহার বিপক্ষে একটি কথাও কহিতেছে না, তাহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টামাত্রও করিতেছে না? অন্ততঃ লোকটার কাছে ক্ষমা চাহিয়া তাহাকে শান্ত করিবাব চেষ্টা করাও বৃদ্ধের উচিত ছিল না কি? এরূপ অপমান নীরবে নিশ্চেষ্টভাবে কেহ কি শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে? বৃদ্ধ নিশ্চয়ই ভীরু, কাপুরুষ, দুর্ব্বল!

বৃদ্ধের তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞাসূচক অস্ফুট হাসি, তেজো-ব্যঞ্জক দৃষ্টি, ও আক্রমণ রত বিপক্ষের তর্জ্জন গর্জ্জনে কিঞ্চিৎমাত্রও বিচলিতের লক্ষণ না দেখিয়া বৃদ্ধকে ভীরু, কাপুরুষ বা দুর্ব্বল ভাবিবারও অবসর পাইলাম না।

তবে কি বৃদ্ধ সত্যই জরাগ্রস্ত? বার্দ্ধক্যের তাড়নায় দেহের শোণিত সত্যই কি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে? তাই লাঞ্ছিত, দলিত হইয়াও বিপক্ষের সম্মুখে একটিও কথা বলিতে সাহস করিতেছে না! এই ধারণাই আমার শেষে সত্য বলিয়া মনে হইল।

বিনাদোষে বৃদ্ধের লাঞ্ছনা আমি আর সহ্য করিতে পারিলাম না! লোকটার অকথ্য ভাষায় গালাগালি সত্যই আমার হৃদয়ে কণ্টকের মত বিদ্ধ হইতে লাগিল। রুগ্ন দুর্ব্বল হইলেও এই অত্যাচারের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইবার জন্য জানি না কোথা হইতে সাহস আসিয়া আমার হৃদয়কে বলবান করিয়া তুলিল। আমি রক্তচক্ষু লইয়া কম্পিত-দেহে লোকটার দিকে অগ্রসর হইলাম। "চুপরাও" বলিয়া চীৎকার করিয়া দুই একটা কি কথা বলিয়া অগ্রসর হইয়াছিলাম—তাহা আর এখন আমার স্মরণ নাই।

বৃদ্ধ আমার হস্ত ধারণ করিয়া শান্ত, স্নিগ্ধ কোমলস্বরে বলিল "বাবু আপনি বসুন।" বৃদ্ধের কোমল ব্যবহারে এবার আমি সত্যই আশ্চর্য্য ও স্তম্ভিত হইলাম।

লোকটা আমার দিকে অমানুষিক ক্রোধে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া যষ্টি হস্তে বৃদ্ধের দিকে অগ্রসর হইল। লাঠিটা বাঙ্গালার লাঠি নহে। তাহার জন্ম পশ্চিমে—কাটখোট্টার দেশে। অগ্রপশ্চাৎ লোহা দিয়া বাঁধা;—প্রত্যেক গাঁট লৌহতারে জড়িত!

লোকটা বৃদ্ধের মস্তক লক্ষ্য করিয়া লাঠি তুলিল। মুহূর্ত্ত অতীত হইবার পূর্ব্বেই বৃদ্ধের মস্তকে ভীষণকায় যষ্টি পতিত হইবে। বজ্রমুষ্টিতে লোকটা যষ্টি ধারণ করিয়াছে,

মস্তক চূর্ণ করিতে দ্বিতীয়বার যষ্টি উত্তোলন করিবার প্রয়োজন হইবে না। বৃদ্ধ পূর্ব্বের ন্যায় ধীর, স্থির ও গম্ভীর! বিচলিত হওয়া দূরের কথা, আশঙ্কার একটু চিহ্ন মাত্র বৃদ্ধের মুখে নাই! তখনও সেই উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্যের হাসি বৃদ্ধের ওষ্ঠযুগলে দেদীপ্যমান্!

বৃদ্ধের মস্তক লক্ষ্য করিয়া সজোরে যষ্টি পতিত হইল আতঙ্কে উদ্বেগে আমি শিহরিয়া উঠিলাম। আমার মস্তক বিঘূর্ণিত হইল। চক্ষে অন্ধকার দেখিলাম, বৃদ্ধের দিকে চাহিতে না পারিয়া চক্ষু মুদিলাম। ভাবিলাম বিনাদোষে বৃদ্ধের মস্তক চূর্ণ হইল! কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া এই করুণ দৃশ্য দেখিবার জন্য কেন আমি এই গাড়িতে উঠিলাম। তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িখানা বিপদসূচক কোলাহলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। আমিও সেই সঙ্গে একবার চীৎকার করিয়া উঠিলাম।

পরমুহূর্ত্তে বৃদ্ধের হো হো হাস্যধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। তাহার মুখের স্থির, ধীর, গম্ভীরভাবের কিঞ্চিৎমাত্রও পরিবর্ত্তন হয় নাই! সেই একই ভাবে অচল পর্ব্বতের ন্যায় বৃদ্ধ উপবেশন করিয়া আছে।

আবার মস্তক লক্ষ্য করিয়া সেই লৌহ জড়িত যষ্টি ভীষণবেগে পতিত হইল। বৃদ্ধ তাচ্ছিল্য দৃষ্টিতে আশ্চর্য্য-

ভাবে বামহস্তের তালুদ্বারা মস্তক রক্ষা করিল। একটু আঘাতও বৃদ্ধকে স্পর্শ করিল না! বুঝিলাম প্রথম আক্রমণও বৃদ্ধ এই ভাবেই ব্যর্থ করিয়াছে। আবার যষ্টি উত্তোলিত হইয়া ভীমবেগে পতিত হইল, একই কৌশলে একই ভাবে বসিয়া বৃদ্ধ সে আক্রমণও ব্যর্থ করিয়া দিল। চতুর্থবার যষ্টি উত্তোলিত হইবামাত্র বৃদ্ধ দণ্ডায়মান হইয়া সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল! বৃদ্ধের তখন আর সে মূর্ত্তি নাই। এই কি সেই বৃদ্ধ? চক্ষু বিশ্বাস করিতে চাহিল না।

বৃদ্ধের আঁখিযুগল অগ্নিগোলকের মত জ্বলিতেছে, ললাটের শিরাগুলি স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, সে গাম্ভীর্য্য—সে শান্ত ভাব মুখমণ্ডলে আর নাই। সুপ্ত সিংহের ন্যায় জাগরিত হইয়া বৃদ্ধ গর্জ্জন করিতেছে! বৃদ্ধের রুদ্রভাব দেখিয়া মনে হইল,—শত শত প্রতিদ্বন্দ্বী বৃদ্ধের সম্মুখে এখন উপস্থিত হইলে পদদলিত করিয়া বৃদ্ধ তাহাদের প্রাণসংহার করিবে। সেই বৃদ্ধের কি ভীষণ মূর্ত্তি! তখনকার বৃদ্ধের সেই মূর্ত্তি কল্পনা করিতে গেলে এখনও হৃদয় শিহরিয়া উঠে!

চক্ষের নিমিষে লোকটার হস্তদ্বয় বামহস্তের বজ্রমুষ্টিতে ধারণ করিয়া বৃদ্ধ যেস্থানে বসিয়া ছিল, তথায় টানিয়া আনিল। লোকটা কম্পিতদেহে পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতে লাগিল। দেখিলাম বৃদ্ধের হস্তদ্বয় লৌহপেক্ষাও কঠিন! বৃদ্ধ

কর্কশ কণ্ঠে কহিল "ভয় নাই, দুইটা হাত তোর অকর্ম্মণ্য করিব না! একটা হাত ভাঙ্গিয়া দিব।" এই বলিয়া আরও একটু জোরে হাত দুইটা মুষ্টিবদ্ধ করিবামাত্র লোকটা চীৎকার করিয়া বৃদ্ধের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল! কাতর চীৎকার-ধ্বনি ও পদ লুণ্ঠিত হইবামাত্র বৃদ্ধের হৃদয় করুণায় পূর্ণ হইয়া উঠিল! হস্তদ্বয় ত্যাগ করিয়া বলিল "এইটুকু ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া কাহার উপর আর অত্যাচার করিবি না প্রতিজ্ঞা করিয়া যা।" লোকটা হাঁফাইতে হাঁফাইতে স্বীকৃত হইয়া গাড়ীর এক কোণে গিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার হস্তের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, বৃদ্ধের বজ্রমুষ্টিতে লোকটার হস্তদ্বয় লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছে। দেখিলাম বৃদ্ধের শক্তি, ও সহিষ্ণুতা অপেক্ষা ক্ষমা অল্প নহে।

এই ঘটনার অল্পক্ষণ পরেই বাষ্পজান একটি ক্ষুদ্র ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। পূর্ব্বোক্ত লোকটা শঙ্কিত, ও ভীত হৃদয়ে সেই ষ্টেশনে নামিয়া পড়িল। গাড়ীতে বসিয়া থাকিতে তাহার বুঝি আর সাহস হইল না। দুই মিনিট পরেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

বৃদ্ধের পরিচয় জানিবার জন্য আমার বড়ই কৌতুহল হইল। আমি বৃদ্ধের পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিলাম। বৃদ্ধের মুখমণ্ডলে আবার সেই শান্ত, সৌম্যভাব। বৃদ্ধ

আমার মুখের দিকে চাহিয়া স্নেহস্নিগ্ধস্বরে বলিল "বাবু আপনাকে ধন্যবাদ! আমাকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া সেই দুর্ব্বল দুষমনটাকে আপনি বাধা দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন—আমি সে জন্য আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।"

তাহার পর অনেক কথা হইল। বৃদ্ধ অকপট চিত্তে তাহার বাল্যকাল হইতে এই বার্দ্ধক্য সময়ের সংক্ষেপে পরিচয় দিল। জীবনের অনেক গুপ্তকাহিনীও আমার কাছে অপ্রকাশ রাখিল না। পাঠকগণের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য বৃদ্ধের জৌনপুরি ভাষার তর্জ্জমা করিয়া সংক্ষেপে তাহার জীবনকাহিনী পাঠকগণকে শুনাইব।

বৃদ্ধের নাম প্রতাপনারায়ণ। জৌনপুর সহরের তিন মাইল দক্ষিণে একটি পল্লীগ্রামে বৃদ্ধের বাস। বৃদ্ধের বয়স ছিয়াত্তর বৎসর। সুন্দর সুপুরুষ। যৌবনের তেজ সে অঙ্গে এখনও উছলিয়া উঠিতেছে।

বৃদ্ধ যখন বয়সের কথা বলিল,তখন সত্যই আমি আশ্চর্য্য হইলাম। বৃদ্ধের সুদৃঢ় বলিষ্ঠ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখিলে কাহার সাধ্য পঞ্চাশের অধিক বলিয়া অনুমান করিতে পারে? আমাদের মত দুর্ব্বল, নির্জ্জীব, ম্যালেরিয়াগ্রস্ত বাঙ্গালীর চক্ষে বৃদ্ধ যে দ্বাপর যুগের মানব একথা কে অস্বীকার করিবে?

বয়সের কথা একাধিকবার প্রশ্ন করিলে বৃদ্ধ হাসিয়া বলিল "বাবু। প্রতাপনারায়ণ জ্ঞানত কখন মিথ্যা কথা বলে নাই! মৃত্যু পর্য্যন্ত এ প্রতিজ্ঞা বজায় রাখিবে।"

প্রতাপনারায়ণ স্নিগ্ধ কোমলকণ্ঠে সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কোথায় যাইবেন?" আমি বৃদ্ধকে সম্মানের সহিত উত্তর করিলাম "অযোধ্যা তীর্থে।"

"আপনি কি একা তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন?" আমি বলিলাম "না"। সঙ্গে আমার পরিবারাদি আছেন। প্রতাপনারায়ণ বিস্মিতনয়নে কয়েক মুহূর্ত্ত আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"বেশ হইয়াছে বাবু! তাহা হইলে বহুক্ষণ আমরা এক সঙ্গে থাকিতে পারিব।"

প্রতাপনারায়ণের বিস্মিতভাবের কারণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পরিলাম না! আমি কথা কহিবার পূর্ব্বেই প্রতাপনারায়ণ নিতান্ত আত্মীয়ের মত জিজ্ঞাসা করিল—"লেড়কা ও মায়ী-দের কোন কষ্ট হয় নাই ত? আপনি আমাদের গাড়িতে আসিলেন—তাঁহারা চিন্তিত হবেন না ত?"

আমি একটি ক্ষুদ্র "না" বলিয়া প্রতাপনারায়ণের দুটি প্রশ্নেরই উত্তর দিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বৃদ্ধ প্রতাপনারায়ণ বলিতে লাগিলেন "বাবু! আমি আমার পিতার একমাত্র সন্তান। তিনি আমাদের গ্রামখানি ব্যতীত আরও দশখানি গ্রামের জমিদার ছিলেন। গ্রামের প্রজামাত্রেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভয় ভক্তি করিত। তাঁহার বিষয় সম্পত্তির যে আয় ছিল, তাহাতে তিনি বহু অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিতেন এবং আরও বহু জমিদারী বাড়াইতে পারিতেন, কিন্তু সে দিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। দুষ্টের দমন ও অত্যাচারী প্রবলের হস্ত হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করাই তাঁহার বুঝি জীবনের লক্ষ্য ছিল! ইহাতেই তিনি সমস্ত অর্থ ব্যয় করিয়া ফেলিতেন। তখন সবেমাত্র ইংরাজশাসন জৌনপুর জেলায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং অরাজকতা তখনও দূর হয় নাই। সেই সময়ে যাহার শক্তি, লোকবল ও লাঠির তেজ অধিক—সেই প্রবলের অত্যাচার হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইত।

আমাদের গ্রাম হইতে দশক্রোশ দূরে মুরলীধর নামে এক প্রবল জমিদার ছিল। তাহার অত্যাচারে প্রজারা পরিত্রাহি ডাক ছাড়িত। তাহার জমিদারির আয় আমার

পিতার আয় অপেক্ষা চতুর্গুণ অধিক। ইচ্ছা করিলে মুরলী-ধর আমার পিতার সমস্ত জমিদারী একদিনেই ক্রয় করিয়া লইতে পারিত। মুরলীধরের প্রজাকুল যখন ভীষণ অত্যাচারিত হইয়া পরিত্রাণের আর উপায় পাইত না, তখন কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া আমার করুণ-হৃদয় পিতার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিত। আমার উদারহৃদয় পিতা অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা না করিয়া মুরলীধরের প্রজাগণের দুঃখমোচনের জন্য দণ্ডায়মান হইতেন। মুরলীধর ভয় প্রদর্শন করিয়া আমার পিতাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়া সফল-মনোরথ হইতে না পারিয়া অবশেষে তাঁহার ভীষণ শত্রু হইয়া উঠিল। কিন্তু সহস্র শত্রুতাচরণ আমার পিতার সাহসকে তিলমাত্রও স্বস্থানচ্যুত করিতে পারিল না।

আমার পিতৃদেবের মনের বল অপেক্ষা শারীরিক শক্তি অল্প ছিল না। আমার পিতার দেহে মত্তহস্তির বল ছিল—একথা বলিলে বোধ হয় অতিরঞ্জিত হইবে না। তিনি আমাকে উপদেশচ্ছলে প্রায়ই বলিতেন "যাহার দেহে শক্তি নাই, মনে মনুষ্যোচিত তেজ নাই, তাহার ধরাধামে বাস কেবল জগতের ভার বৃদ্ধি করা মাত্র। শরীরে শক্তি না থাকিলে রোগের আক্রমণমাত্রেই মানুষকে পরাস্ত হইতে হয়, দেহ মন অবসাদে ভাঙ্গিয়া পড়ে,—প্রতিপদে পরের মুখা-

পেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। শারীরিক শক্তির সহিত মনের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, অতএব দেহে যাহাতে অটুট স্বাস্থ্য ও বল সঞ্চয় করিতে পার, সর্ব্বতোভাবে তাহার চেষ্টা করিবে। শরীরে শক্তি থাকিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ কিছুরই অভাব হইবে না।"

আমার পিতা বাল্যকাল হইতেই আমাকে ব্যায়াম অভ্যাস করাইতেন এবং ভবিষ্যত জীবনে যাহাতে আমি প্রচুর শারীরিক শক্তিলাভ করিতে পারি, তজ্জন্য তিনি কায়-মনোবাক্যে চেষ্টা কবিতেন। তিনি বলিতেন "মনুষ্যোচিত শক্তি শরীরে সঞ্চিত থাকিলে মানুষ অসাধ্যসাধন করিতে পারে। দুর্ব্বল রুগ্ন মানবের দ্বারা জগতের কখন কোন উপকার হয় না এবং ভবিষ্যতেও হইবে না।"

"বাবু! সে আজ চৌষট্টি বৎসরের কথা।" প্রতাপনারায়ণ উজ্জ্বল চক্ষু দুটি আমার চক্ষের উপর ন্যস্ত করিয়া বলিল—"বাবু! সে আজ চৌষট্টি বৎসরের কথা, তখন আমি দ্বাদশ বর্ষ অতিবাহিত করিয়া ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছি। ফাল্গুনের মধ্যাহ্নে আমার সৌম্যমূর্ত্তি পিতার কাছে বসিয়া পাঠাভ্যাস করিতেছি, এমন সময়ে এক বৃদ্ধ তাহার যুবতী কন্যার হস্ত ধারণ করিয়া অশ্রুবিগলিত নেত্রে আমার জনকের পদপ্রান্তে আসিয়া পতিত হইল! পাষণ্ড মুরলীধরের

লোলুপ দৃষ্টি নিরাশ্রয় বৃদ্ধের রূপবতী কন্যার উপর পতিত হইয়াছে। বৃদ্ধের কন্যাকে রক্ষা করিতে পারে যৌনপুর সহরে এমন আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই।

পাষণ্ড মুরলীধরের পশুবৎ আচরণের কথা শুনিয়া ধর্ম্ম-প্রাণ পিতার হৃদয় শিহরিয়া উঠিল। তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া নীরবে কি চিন্তা করিলেন। বহুক্ষণ তাঁহার মুখ হইতে বাক্য নিঃসৃত হইল না। পিতাকে নীরব ও নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বৃদ্ধ কাঁদিতে কাঁদিতে আবার তাঁহার চরণযুগল জড়াইয়া ধরিল। এবার পিতৃদেব সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিলেন "বৃদ্ধ! আজ হইতে তোমার কন্যা আমার গর্ভধারিণী জননী! পশু মুরলীধরের সাধ্য নাই যে, আমার মাকে স্পর্শ করিতে পারে! তোমার কন্যাকে আমার গৃহে রাখিয়া যাও এবং ইচ্ছা করিলে তুমিও তোমার কন্যার সহিত আমার গৃহে অবস্থান করিতে পার।"

বৃদ্ধ কাঁদিতে কাঁদিতে করযোড়ে বলিল "আজ আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। কন্যার হাত ধরিয়া দশ দিন যৌনপুর সহরে ঘুরিতেছি, কত লক্ষপতি জমিদারের গৃহে গিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছি, কেহই আমার কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত করে নাই! আর আমি সেই নরাধমের জমিদারিতে ফিরিব না! আমার সাতপুরুষের বাস্তুভিটা আজ পাষণ্ড মুরলীধরের

অত্যাচাবে আমায় ত্যাগ কবিতে হইল। মেহেরা আমাব কন্যা নয়, আজ হইতে সে আপনার কন্যা! আমি মাঝে মাঝে আসিয়া মেহেরাকে দেখিয়া যাইব। আজ আমি বিদায় হইলাম।"

বৃদ্ধ চলিয়া গেল। আমাব জননী অন্তবালে দাঁড়াইয়া সকলই শুনিতেছিলেন। বৃদ্ধ ছিল বলিয়া এতক্ষণ জননী পিতাব সম্মুখে আসিতে পারেন নাই।

জননী মেহেরার হস্ত ধারণ করিয়া সযত্নে গৃহেব মধ্যে লইয়া গিয়া তখনই ফিরিয়া আসিলেন। জননী আমাব বড়ই বুদ্ধিমতী ছিলেন। অনেক সময় আমাব পিতা জননীর কাছে পরামর্শ গ্রহণ কবিতেন। মেহেবাকে আশ্রয় দিয়া যে ভয়ঙ্কব বিপদকে সাদবে বরণ করিয়া ঘবে তোলা হইল একথা জননী পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। জননী পিতাব সম্মুখে আসিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—

"মুরলীধরকে আমি ভালরূপ জানি! সে যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে, তাহার উপায় কি স্থির করিলেন?"

আমার ভগবৎভক্ত পিতা মৃদু হাসিয়া একবার আকাশের দিকে চাহিয়া উজ্জ্বল চক্ষুদুইটি জননীর মুখেব উপব ন্যস্ত করিলেন জননী বলিলেন "তাহাই হউক! ভগবানের ইচ্ছায়

যাহা ঘটে ঘটুক।” সেদিন মেহেরার সম্বন্ধে আর কোন কথা হইল না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমি পিতামাতার একমাত্র সন্তান! তনয়ার স্নেহাস্বাদ জননী কখন ভোগ করিতে পান নাই। জননী মেহেরাকে কন্যাস্নেহে যত্ন করিয়া গৃহে রাখিলেন। এক সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল। ইতিমধ্যে তিন দিন মুরলীধরের তিন জন পাষণ্ড লোক আসিয়া পিতাকে নানারূপ ভয় প্রদর্শন করিয়া গেল। কিন্তু তিনি তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না।

অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার রজনী! আমরা মাতা পুত্রে একঘরে শয়ন করিয়া আছি। মেহেরা জননী পার্শ্বে এলাইতকুন্তলা হইয়া ঘুমঘোরে চেতনাহীন। আমরা মাতা পুত্রে মেহেরার কথা লইয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছিলাম। রজনী তখন দেড়প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে! মা বলিতেছিলেন “বাবা! প্রতাপ! মেহেরা যেন সদাই কুন্ঠিতা! বলে আপনারা আমাকে আশ্রয় দিয়া শত্রুর কোপদৃষ্টিতে পড়িলেন! ভগবান আমাকে কেন এমন হতভাগিনী করিয়া জগতে পাঠাইয়াছিলেন। আমার জন্য হয় ত আপনাদিগকে পাষণ্ডের কত অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে।” আমি বলিলাম “মেহেরা দিদি বড় ধীর ও শান্ত! এই কয়দিনেই মেহেরা যেন আমার আপনার ভগিনির অপেক্ষাও অধিক হইয়া

পড়িয়াছে।" ঠিক এই সময়ে আমাদের বর্হিবাটীতে কিসের একটা কোলাহল উত্থিত হইল। আমার পিতা বাহিরে শয়ন করিতেন এবং সদরে কয়েকজন দ্বারবান ও দশজন লাঠিয়াল থাকিত। ইহা ব্যতীত সদর কাছারির কয়েকজন কর্ম্মচারি ও গোমস্তা বাস করিত। আমাদের অন্দরের দেউড়িতে চারিজন দ্বারবান ব্যতীত আর কেহ থাকিত না।

কোলাহল উত্থিত হইবামাত্র জননীর মুখমণ্ডল মুহূর্ত্তের মধ্যে পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। অনেকক্ষণ তাঁহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

আরও কয়েকমুহূর্ত্ত অতীত হইয়া গেল। জননী প্রকৃতিস্থা হইলেন। তাঁহার মুখভাবেরও পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। জননীর সেই দিনকার সেই মুখের অপূর্ব্ব স্বর্গীয় জ্যোতিঃ এই বৃদ্ধ বয়সেও অহরহঃ যেন আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তাহার পর কি করিতে হইবে, জননী যেন এই কয়েকমুহূর্ত্তেই সমস্ত স্থির করিয়া ফেলিলেন। জননীর চক্ষু দুটি যেন জ্যোতিঃপূর্ণ হইয়া ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। আমি মায়ের সন্তান হইয়াও সে চক্ষুর দিকে তখন চাহিতে পারিলাম না।

জননী ধীর, স্থির, গম্ভীরভাবে আমার প্রতি চাহিয়া

বলিলেন—"বাবা প্রতাপ! দেউড়ির চারিজন রক্ষককে এখনই বাহির বাটিতে পাঠাইয়া দাও! তাহাদিগকে বল, যেন প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া তাহারা তাহাদের অন্নদাতার জীবন রক্ষা করে। যদি তাহারা দেউড়ি ত্যাগ করিয়া যাইতে না চায় বলিবে যে, আমি তাহাদিগকে যাইতে আদেশ করিতেছি।"

অন্দরের দেউড়ি রক্ষকদের দেউড়ি ছাড়িয়া কোথাও যাইবার আদেশ ছিল না। বিশেষতঃ রাত্রিকালে। আমি যাইয়া দ্বারবানদিগকে মাতার আদেশ জ্ঞাপন করিলাম। তাহারা অন্দরের দ্বার রক্ষকহীন অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতে স্বীকৃত হইল না। তাহারা যে অস্বীকৃত হইবে—জননী বুঝি তাহা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন। আমি মায়ের কাছে ফিরিয়া আসিতেছি, এমন সময় জননী যাইয়া দেউড়িতে উপস্থিত হইলেন। জননী অন্দরের বাহিরে দেউড়িতে কোন দিন আসেন নাই। অন্দরের দ্বাররক্ষকেরাও আমার জননী মূর্ত্তি কোন দিন চক্ষে দেখিতে পায় নাই। আজ তাহারা তাহাদের অন্নদাতৃকে হঠাৎ সম্মুখে দেখিয়া করযোড়ে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। প্রধান-দ্বাররক্ষক উমিনচাঁদ করযোড়ে বলিল—"মা! আজ বিশ বৎসর আপনার অন্ন খাইয়া দেহ বর্দ্ধিত করিতেছি, কৈ

এমন আদেশ ত কোন দিন গোলামের প্রতি হয় নাই মা! আমাদিগকে দ্বার পরিত্যাগ করিয়া বর্হিবাটিতে যাইতে আদেশ কেন মা?”

মা বলিলেন—“বাবা! উমিন্‌চাঁদ! তোমরা আমার সন্তানতুল্য! প্রতাপকে যে চক্ষে দেখি, তোমাদিগকেও সেই চক্ষে দেখিয়া থাকি! আজ তোমাদের অন্নদাতা পিতার জীবনরক্ষার ভার তোমাদের উপর। তাঁহাকে শত্রুর হস্ত হইতে আজ রক্ষা কর।”

উমিন্‌চাঁদ ধীরে ধীরে বলিল—“আমি যে উভয় সঙ্কটে পড়িলাম মা! সদর বাটিতে অন্নদাতা পিতা বিপন্ন—সম্মুখে অন্নপূর্ণারূপিণী জননী! আমি আজ কাহাকে রক্ষা করিব মা? উমিন্‌চাঁদ প্রতিজ্ঞা করিয়াছে সে জীবিত থাকিতে তাহার জননীকে আজ স্বয়ং যম আসিলেও স্পর্শ করিতে দিবে না! উমিন্‌চাঁদ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ পাপে ত লিপ্ত হইবে না মা?”

উমিন্‌চাঁদের চক্ষু দুটি অগ্নিগোলকের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল।

জননী ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—“উমিন্‌চাঁদ আমার চিন্তা তোমাকে করিতে হইবে না। তোমার অন্নদাতা প্রভুকে অগ্রে রক্ষা কর।”

উমিন্‌চাঁদ চীৎকার করিয়া বলিল—"না মা! উমিন্‌চাঁদ এই দেউড়ি ত্যাগ করিয়া একপদ কোথাও অগ্রসর হইবে না। উমিন্‌চাঁদ আজ স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালন করিবে।"

এবার বার্হিবাটি হইতে ভীষণ কোলাহল উত্থিত-হইল! "গেল! গেল!! সব গেল!!! আমাদের প্রভুকে বাঁচাও!"

কোলাহল শুনিয়া আমার জননী সিংহিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—

"উমিন্‌চাঁদ! নিমক্‌হারাম উমিন্‌চাঁদ! এখনও তুই আমার সম্মুখে নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়াইয়া রহিলি? তোব অন্নদাতা প্রভু আজ শত্রু কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইতেছেন. আর তুই এখনে নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়াইয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতেছিস্? তোব প্রভু যে তোকে প্রাণ দিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন উমিন্‌চাঁদ! সেই প্রভুষ আজ বিপদ জানিয়াও তুই এখনও রক্ষার জন্য অগ্রসর হইলি না? ঘৃণিত কুক্কুর। বিপক্ষের গুপ্তচর! তুই এখনই আমার সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যা'।"

উমিন্‌চাঁদ এই দারুণ তিরস্কার বাণী শ্রবণ করিয়া ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। তাহার অগ্নিগোলকের মত চক্ষু দুইটা আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

কিন্তু উমিন্‌চাঁদ কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া বলিল—"চলিয়া যাও মা! উন্মাদের ন্যায় দেউড়ির দিকে পাষণ্ডেরা ছুটিয়া আসিতেছে। কর্ত্তার জন্য আপনার কোন চিন্তা নাই।"

জননী অনিচ্ছাসত্বে আমার হস্ত ধারণপূর্ব্বক ভিতর বাটিতে আসিয়া শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। আমি ত্রাসে তাড়াতাড়ি অর্গল বন্ধ করিয়া দিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আমাদের অন্দরের দেউড়িতে ভীষণ কোলাহল উত্থিত হইল। রজনী তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত সেই কোলাহলের নিবৃত্তি হইল না। মা আমার পিতার বিপদাশঙ্কায় লুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে করিতে চেতনা হারাইলেন। আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া মাতার লুণ্ঠিত মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলাম।

কতক্ষণ এই ভাবে অতীত হইয়াছিল বলিতে পারি না। উমিন্‌চাঁদের চীৎকারে যখন আমি দ্বার খুলিয়া দিলাম—তখন পূর্ব্বদিক প্রায় ফর্সা হইয়া গিয়াছে।

উর্ম্মিন্‌চাঁদের দিকে চাহিয়া আমার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। তাহার সর্ব্বশরীব রক্তে ডুবিয়া গিয়াছে। বক্ষঃস্থলের ক্ষত হইতে প্রবলবেগে রক্তধারা গড়াইয়া পড়িতেছে এবং কথা কহিবার শক্তি নাই। উমিন্‌চাঁদ অতিকষ্টে বলিল—"ভাই প্রতাপনারায়ণ। আমি মায়ের কাছে চিরদিনের জন্য বিদায় লইতে আসিয়াছি, মাকে একবার আমায় দেখা দিতে বল।"

আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম—"উমিন্‌চাঁদ দাদা! তুমিই মায়ের যথার্থ সন্তান। তোমার ঋণ কি করিয়া পরিশোধ করিব ভাই?"

উমিন্‌চাঁদ দেওয়াল ধরিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার দাঁড়াইবার শক্তি তখন লোপ হইয়া গিয়াছে। লোকজন ছুটিয়া আসিয়া মায়ের চেতনা সম্পাদন করিল। জননী একবার উঠিয়া বসিলেন। পরক্ষণে উমিন্‌চাঁদের রক্তাক্ত কলেবরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আবার মুর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

আমাদের কর্ম্মচারীবর্গ আসিয়া উমিন্‌চাঁদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিল। তখন প্রভাত হইয়া গিয়াছে। মা পাগলিনীর ন্যায় ছুটিয়া বর্হির্বাটিতে পিতার কাছে আসিলেন। পিতা সর্ব্বাঙ্গে আঘাতিত হইয়াছেন, তবে সে আঘাত তত সাংঘাতিক নহে।

প্রভাতের পূর্ব্বেই পুলিসের লোকে আমাদের বর্হিবাটী পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। চারিজন বিপক্ষের ও আমাদের তিনজন লোক জগৎ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে। তিনজনের মস্তক দেহ হইতে একেবারে বিচ্যুত। পুলিসের অনুসন্ধানে পাষণ্ড মুরলীধরের চক্রান্তের কথা সকলই প্রকাশ পাইল। জেলায় মোকদ্দামা আরম্ভ হইল। দুই-বর্ষ ব্যাপি মোকদ্দামায় আমাদের যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় হইয়া গেল। স্ব-গ্রাম তালুকখানি ব্যতীত আমাদের আর কিছুই রহিল না। আমার পিতা বিচারে নিষ্কৃতি পাইলেন, তবে আমাদের পক্ষীয় অনেককেই কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। পাষণ্ড মুরলীধর লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়া, যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও নিষ্কৃতি পাইল না। দশ বৎসরের জন্য কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইল। তৎপক্ষীয় বহুলোকের দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হইল।"

প্রতাপনারায়ণ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল —"আমার পিতা সেই অর্দ্ধমৃত অবস্থাতেও উমিনচাঁদ দাদাকে বাঁচাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমার মাতা একমাস আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উমিনচাঁদের শিয়রে বসিয়া সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। আমিও এক-দণ্ডের জন্য উমিনচাঁদের শয্যা ত্যাগ করি নাই। কিন্তু আমার

জনক জননীর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া একমাস সাত দিনের ঠিক সেইরূপ তৃতীয় প্রহর অন্ধকার রজনীতে উমিন্‌চাঁদের পবিত্র আত্মা কোন অজানিত দেশে চলিয়া গেল।”

“উমিন্‌চাঁদের মৃত্যুর পর আমার জননী তাঁহার অলঙ্কার ও সমস্ত সঞ্চিত ধন ব্যয় করিয়া উমিনচাঁদের স্মৃতি রক্ষা-কল্পে এক আতুরাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন একবার দেখিতে যাইবেন না বাবু?”

প্রতাপনারায়ণের মর্ম্মভেদী কাহিনী শুনিতে শুনিতে আমি পলকহীন নয়নে অভিভূত হৃদয়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিলাম! প্রতাপনারায়ণের প্রশ্নের উত্তর দিবার তখন আমার শক্তি ছিল না। কিন্তু বড়ই “খেদ” আমার হৃদয়ে রহিয়া গিয়াছে যে, “উমিন্‌চাঁদের স্মৃতিমন্দির ও উমিন্‌চাঁদ আতুর আশ্রম” আমি দেখিয়া আসিতে পারি নাই। গৃহিনী ও গৃহিনীর শিশুগুলি আমার সে পথে কণ্টক হইয়াছিল। সহস্র চেষ্টাতেও আমি ফিরিবার সময় জোনপুরে অবতরণ করিবার সুবিধা করিতে পারি নাই।

প্রতাপনারায়ণ আবার একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিল—

“আমার পিতার আঘাতও সাংঘাতিক হইয়া ছিল। তাঁহার শরীরে অমিত শক্তি ও অকুতোভয় না

থাকিলে তিনি সে যাত্রা রক্ষা পাইতেন না! পঞ্চাশজন বলবান লাঠিয়ালের আক্রমণ তিনি একা ব্যর্থ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বৎসরাধিক কাল শয্যাশায়ী হইয়া থাকিতে হইয়াছিল!”

“এই ঘটনার পর হইতে শরীরে শক্তি সঞ্চয় করা আমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য হইল! আমি দ্বিগুণ উৎসাহে ব্যায়াম অভ্যাস করিতে লাগিলাম। আমার জনকজননীও আমাকে প্রাণপণশক্তিতে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। আমার যখন পঞ্চবিংশতিবর্ষ বয়স, তখন একসের ঘৃত, দুইসের দুগ্ধ, দেড়সের জাঁতা ভাঙ্গা গমের আটা, আধসের ডাউল, আধসের চিনি আমার দৈনিক খাদ্য ছিল। এখন বৃদ্ধ হইয়াছি আহারের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। তবে দুগ্ধের পরিমাণ পূর্ব্বের ন্যায়ই আছে, কেবল ঘৃত একসেরের স্থলে আধসের হইয়াছে।”

ডিস্‌পেপ্‌সিয়াগ্রস্ত অর্দ্ধপোয়া বালাম চাউলের মুখাপেক্ষী বাঙ্গালী আমি—সুতরাং বৃদ্ধ প্রতাপনারায়ণের কথা শুনিয়া বাঙ্গালী জীবনে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হইল!

বৃদ্ধ প্রতাপনারায়ণ বলিল, “কার্য্যানুরোধে বিশক্রোশ পথ এখনও আমি দ্বিপ্রহরের মধ্যে হাঁটিয়া যাই, পঁচিশজন লাঠিয়ালের আক্রমণ হইতে এখনও আমি নিজেকে রক্ষা

করিতে পারি, প্রতাপনারায়ণ এসম্বন্ধে দুই তিনটি সত্য ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিল—"বাবু! মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া পিতামাতা স্বীকার করাইয়া গিয়াছেন—"আত্মরক্ষার নিতান্ত আবশ্যক ব্যতীত কখন কাহার প্রতি বলপ্রয়োগ করিব না, দুর্ব্বল নিঃসহায় ব্যক্তি সহস্র অপমান করিলেও তাহার অঙ্গস্পর্শ করিব না, দুর্ব্বলকে অন্যায় অত্যাচারের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য যতটুকু বল প্রয়োগের আবশ্যক তাহার অধিক বল প্রয়োগ করিতে পারিব না, ক্রোধাভিভূত হইয়া ক্ষমতার অপব্যবহার জীবনে করিব না। মুমূর্ষু পিতার অঙ্গস্পর্শ করিয়া স্বীকার করিয়াছি—তাই বাবু সেই দুর্ব্বল লোকটার শত অপমানেও আমার প্রতিশোধ বাসনা হৃদয়ে জাগরিত হয় নাই!"

প্রতাপনারায়ণের জীবনের কাহিনী শুনিতে শুনিতে অনেকগুলি ষ্টেশন পার হইয়া আসিলাম। অপর গাড়িতে স্ত্রীলোকেরা ও শিশু দুইটি আছে! বিদেশ বিশেষতঃ রেলপথে কখন কি বিপদ ঘটিতে পারে, একথা প্রতাপনারায়ণ আমাকে স্মরণ করাইয়া দিল! আমি বৃদ্ধের কথা শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম। বাহ্যজ্ঞানও বুঝি অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। আমি যাহাদের রক্ষক হইয়া যাইতেছি তাহাদের চিন্তায় বিশেষতঃ চঞ্চল শিশু দুটির জন্য সত্যই

একটু ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম। কলিকাতা হইতে বাহির হইয়া অবধি রেলপথে এরূপভাবে তাহাদের সঙ্গছাড়া কোন দিন হই নাই! গৃহিনীরও যে আমার জন্য একটু চিন্তা হইবে না—এ কথাটাও শপথ করিয়া বলা যায় না।

অগত্যা বৃদ্ধ প্রতাপনারায়ণের জীবনের অবশিষ্ট কাহিনী আমার আর শ্রবণ করা হইল না। জোনপুর ষ্টেশনে গাড়ি আসিবামাত্র অনিচ্ছাস্বত্তে প্রতাপনারায়ণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া আমাদের গাড়িতে আসিয়া উপবেশন করিলাম। গাড়ি হইতে পরিবারবর্গকে নিঃসহায় অবস্থায় এতক্ষণ ফেলিয়া গিয়া যে "বেকুবের" মত কার্য্য করিয়াছি, এ কথা গৃহিণী বেশ করিয়া বুঝাইতে ছাড়িলেন না।

জোনপুর ষ্টেশনে চতুর্দ্দিকেই কেবল লাঠির বহব। পঞ্চম বর্ষীয় শিশুর স্কন্ধেও বংশদণ্ড শোভা পাইতেছে। জোন-পুরিয়া লাঠিতেই লোককে বশীভূত করে! শুনিলাম পুলিশ ফৌজকেও ইহাদের লাঠির নিকট সময়ে সময়ে মস্তক অবনত করিতে হয়! সে সময়ে শ্বেতাঙ্গ সৈনিক আসিয়া ইহাদিগকে শাসন করে।

প্রতাপনারায়ণের কথা ভাবিতে ভাবিতে (Kheta-sarai) খেতাসরাই ও সাহাগঞ্জ (Shahganj) দুইটি ষ্টেশন পার হইয়া (Malipur) মালিপুর ষ্টেশনে আসিয়া

উপস্থিত হইলাম। খেতাসরাই ষ্টেশনে হইতে সাহাগঞ্জ ষ্টেশন পর্য্যন্ত অগণিত নিবিড় নিম্ববৃক্ষের বন। ঝুর ঝুর করিয়া নিম্বগাছের স্নিগ্ধ স্বাস্থ্যপ্রদ বায়ু প্রাণকে যেন নববলে বলীয়ান করিয়া তুলিল। এমন স্নিগ্ধ শীতল বায়ু জীবনে কোন দিন উপভোগ করি নাই। সাহাগঞ্জ হইতে মালিপুর ষ্টেশন পর্য্যন্ত আবার কেবল অরহর ক্ষেত্র! অরহরের সবুজবর্ণ ক্ষেত্রগুলি দেখিতে কি নয়নাভিরাম! বিশাল-জগতে সৃষ্টিকর্ত্তার অদ্ভুত কারুকার্য্য এবং প্রকৃতি দেবীর পূর্ণ বিকাশ দেখিয়া আমার ক্ষুদ্র প্রাণ যেন আনন্দে অধীর হইয়া ছুটিয়া যাইতে লাগিল। মালিপুর ষ্টেশন হইতে মুকুল-ভরা চ্যূত বৃক্ষের উদ্যান দেখিতে দেখিতে আমরা আকবর-পুর ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। চ্যূতমুকুলের কমনীয় গন্ধে হৃদয় মন স্বর্গীয় সৌরভে মোহিত হইয়া উঠিল।

বেলা ৩৷৷০ টার সময় আমরা (Goshainganj) গোঁসাইনগঞ্জ ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। ষ্টেশনগুলি যেন আমার চক্ষে মরুভূমির ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ষ্টেশনে একটি ফেরিওয়ালা নাই, রেলকোম্পানীর একটি "পানিপাঁড়েও" নাই, সুতরাং পিপাসায় ছাতি ফাটিয়া গেলেও একটু জলবিন্দু পাইবার উপায় নাই। পান, চুরুট, বিড়ি,

দিয়াশালাই বলিয়া কেহ একবার ভুলিয়াও হাঁকে নাই। আমরা যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম "পানিপাঁড়ের অভাব" বিলক্ষণ অনুভব করিতে লাগিলাম। আমরা সহস্রচেষ্টাতেও "একলোটা পানি" সংগ্রহ করিতে পারিলাম না—জল এসব দেশে এতই দুর্ম্মূল্য! এখান হইতে আমরা ত্রিপান্তর মাঠের মধ্যে (Billharghat) বিলহারঘাট ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই ক্ষুদ্রষ্টেশনটি সত্যই মরুভূমির মধ্যে অবস্থিত। জনমানবের সমাগম নাই, দেখিলে প্রাণে আশঙ্কার উদ্রেক হয়।

বেলা সার্দ্ধ চারি ঘটিকার সময় আমরা অযোধ্যা ষ্টেশনে আসিয়া অবতরণ করিলাম। অযোধ্যাধামে অবতরণ করিয়া পুরাকালের কত কথা প্রাণে জাগিয়া উঠিল। কি একটা অব্যক্ত বিষাদ-যন্ত্রণায় হৃদয় যেন ভরিয়া উঠিল! দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলাম হায়! এই কি আমাদের সেই সুরম্য সৌধরাজি পরিপূর্ণ লোককোলাহল মুখরিত শান্তিপূর্ণ রামরাজ্য! কোথায় আমাদের সেই নবদূর্ব্বাদল-ঘনশ্যাম রামচন্দ্র! কোথায় সেই জনকনন্দিনী বৈদেহী! কোথা সেই ভরত, লক্ষ্মণ, ও শত্রুঘ্ন! রামায়ণ বর্ণিত সেই রামরাজ্য ক্ষণেকের তরে যেন নয়ন সমক্ষে ভাসিয়া উঠিল! ভাবিলাম সে সব দিন কোথায় গেল!!

মনে মনে কালের অপ্রতিহত ক্ষমতার বিষয় ভাবিয়া সেই অদৃশ্য বিরাট শক্তিমান দেবতার চরণে মস্তক নত করিলাম।

রামায়ণে পড়িয়াছিলাম সরযূতীরে প্রচুর ধনধান্য পরিপূর্ণ আনন্দ কোলাহলময় কোশল নামে এক প্রদেশ আছে—এবং লোকবিখ্যাত অযোধ্যা উহার রাজধানী। ঐ নগরী দীর্ঘে দ্বাদশ এবং প্রস্থে তিনযোজন। রাজধানী তিনটী প্রধান রাজপথে সুবিভক্ত,রাজপথ সকল, সুশোভিত,বিক্ষিপ্ত কুসুমসমূহে পরিশোভিত ও জলসেকে সতত পরিসিক্ত। ঐ নগরীর চতুর্দ্দিক কপাট, তোরণ ও বিপণিপূর্ণ। কোনও স্থানে যন্ত্রসমূহের অবস্থিতি, কোথাও বা অস্ত্ররাজি বিরাজমান, কোন স্থান বা শিল্পিগণ অধিকার করিয়া রহিয়াছে! রাজধানী দেখিতে শ্রীমতী ও অতুল শোভাময়ী। ইহার উন্নত সৌধশিখর সমূহে ধ্বজা সকল সমীরণ সহযোগে উড্ডীন হইতেছে। স্থানে স্থানে প্রমোদ বাটিকা ও পুষ্পোদ্যান সকল শোভা পাইতেছে! দুর্গের চতুর্দ্দিক পরিখা শোভিত—সুতরাং সাধারণে ইহার ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না! ইহার কোনও স্থানে হয়, হস্তী, খর, উষ্ট্র ও গো-গণে পরিব্যাপ্ত। কোনও স্থানে সামন্ত নৃপতি অসিহস্তে দণ্ডায়মান, কোথায় বা নানাদেশীয় বাণিক্‌গণ বাণিজ্যভার গ্রহণে

সুসজ্জীভূত। এই স্থানের ভূমি সকল সমতল এবং ঐ ভূমি শালি ও তণ্ডুলে পরিপূর্ণ! পেয় ইক্ষুরসের ন্যায় সুমধুর। নগরীর নানাস্থানে দুন্দুভি, মৃদঙ্গ; বীণা ও পণবাদি যন্ত্রে নিরন্তর নিনাদিত।

তারপর অযোধ্যা দেখিয়া ফিরিবার সময় মনে হইল—

"যদুপতে ক্ক গতা মথুরাপুরী
রঘুপতে ক্ক গতোত্তরকোশলা
ইতি বিচিন্ত্য কুরু স্থিরং মনঃ
ভবসঙ্গঃ খলু পান্থসঙ্গমঃ।"

সব ভুলিয়া,—বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া, রামরাজ্য ও রামাবতারের কথা ভাবিতে ভাবিতে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম। হঠাৎ অযোধ্যার পাণ্ডা ও একাওয়ালাদের চীৎকারে বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল।

দেখিলাম রেল ষ্টেশনের সীমার বাহিরে বড় বড় বংশদণ্ড স্কন্ধে যমদূতের ন্যায় অগণিত পাণ্ডা লোলুপদৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাহিয়া আছে। গোলযোগের আশঙ্কায় রেলকোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ পাণ্ডাদিগকে ষ্টেশনের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। শীকারের আশায় ষ্টেশনের সীমার বাহিরে ক্ষুধিত সিংহের ন্যায় তাহাদিগকে অপেক্ষা করিতে হয়। ষ্টেশনের বাহিরে দৃষ্টিপাত করিয়া ক্রমে

আমার অন্তরাত্মা কম্পিত হইতে লাগিল। শত শত ভীমকায় দীর্ঘাকৃতি পাণ্ডা বড় বড় যষ্টিস্কন্ধে আমাদেরই জন্য অপেক্ষা করিতেছে, সকলেরই তীব্র লোলুপ দৃষ্টি আমাদেরই উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। সে দিন কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুস্থানী যাত্রীও আমাদের সঙ্গে অযোধ্যা তীর্থে অবতরণ করিল, কিন্তু তাহাদের প্রতি এরূপ তীব্রভাবে দৃষ্টিপাত করিতে কোন পাণ্ডাকেই দেখিলাম না।

যষ্টিস্কন্ধে ভীমকায় পাণ্ডাগণের লোলুপ দৃষ্টিপাতে গৃহিণী ক্রোড়স্থ সন্তানটিকে বক্ষে চাপিয়া আমাব পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। দেখিলাম একটা আশঙ্কার ছায়া গৃহিণীকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে।

আমি বিষম সমস্যায় পড়িলাম। অগণিত পাণ্ডার মধ্য হইতে কি উপায়ে কাহাকে বাছিয়া লইব? কে ভাল, কে মন্দ জানিবারই বা উপায় কি? এই পাণ্ডাসমুদ্র হইতে রত্ন উদ্ধার করা সে ত আমার মত লোকের কার্য্য নয়। এই সুদূর অপরিচিত দেশে কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করি কে ভাল, কেবা মন্দ। ষ্টেশনের মধ্যে কয়েকজন হিন্দুস্থানী কুলি, একজন টিকিট ক্লার্ক ও একজন হিন্দুস্থানী ষ্টেশন মাষ্টার, আর ষ্টেশনের বাহিরে বড় বড় যষ্টিস্কন্ধে শত শত পাণ্ডার দল। পরামর্শ করিবার মত একজন লোকও দেখিতে

পাইলাম না, অধিকন্তু যশিডির ষ্টেশনমাষ্টার বাবুর কথাগুলি স্মৃতিপথে উদিত হইয়া আমার আশঙ্কাকে আরও প্রবল করিয়া তুলিতে লাগিল।

ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ একটা উপস্থিত বুদ্ধি আসিয়া মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই বিপদের সময়েও গৃহিণীর সঙ্গে একটু কৌতুক ও তাঁহাকে আমার বুদ্ধির কাছে একটু ছোট করিবার লোভও সংবরণ করিতে পারিলাম না। হাওড়ার ষ্টেশনে গাড়িতে উঠিয়া অবধি গৃহিণী নিজের গৃহিণীপণা ষোলআনা বজায় রাখিবার জন্য অনেক সময় আমার আদেশ উপদেশ তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। তাঁহার ব্যবস্থাই ঠিক, আর আমার ব্যবস্থা ভ্রান্তিপূর্ণ এইটাই বারংবার তিনি প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়াছেন। সত্য বলিতে কি সুবিধা পাইলেই আমি ইহার প্রতিশোধ লইব, আমার বুদ্ধির কাছে তাঁহাকে হার মানাইব, জলে ফেলিয়া বিপদে ডুবাইয়া আমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করাইব, এইরূপ সুবিধা অনুসন্ধান করিয়া আসিতেছিলাম। সুতরাং গৃহিণীকে আরও ভীত, ও ব্যতিব্যস্ত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। ভাবিলাম এই অপরিচিত দুর্গমস্থানে গৃহিণীর আশঙ্কাটাকে আরও বাড়াইয়া তুলিতে পারিলে গৃহিণী কাকুতি মিনতি করিয়া

আমাকে সদুপদেশ নির্দ্দেশ করিতে বলিবেন এবং আমার মতে কার্য্য করিয়া গৃহিণী কৃতজ্ঞচিত্তে আমার প্রশংসা করিবেন। এই বুদ্ধিটা আমার মস্তিকে উদিত হইবামাত্র মনে মনে খুব একটা আনন্দ হইল। ভাবিলাম গৃহিণী এইবার আমার করতলগত হইয়াছেন। গৃহিণীর আশঙ্কার উপর আরও কতকগুলা মিথ্যা আশঙ্কার ভার চাপাইয়া তাহাকে আরও বাড়াইয়া তুলিতে হইবে।

দেখিলাম গৃহিণী তাহার চৌদ্দমাসের শিশুটিকে বুকে চাপিয়া শুষ্কমুখে নির্নিমেষ নয়নে পাণ্ডাসমুদ্রের দিকে চাহিয়া আছেন। সে দৃষ্টি আশঙ্কাপূর্ণ, ব্যাকুলতা মাখান। গৃহিণীর অবস্থা দেখিয়া একবার হাসি আসিয়াছিল, কিন্তু সে হাসি রুদ্ধ করিয়া আমি আরও গম্ভীরভাব ধারণ করিলাম। ভয়ের বাহ্য চিহ্নগুলি আমার মুখমণ্ডলে গৃহিণী যাহাতে সুস্পষ্ট ভাবে দেখিতে পান, প্রাণপণ শক্তিতে তদ্রুপ চেষ্টা করিতে বিরত হইলাম না!

গৃহিণী ভয়ে তখন আমার প্রায় বাহু স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এক অঙ্গুলী মাত্রও ব্যবধান ছিল না। এই উপযুক্ত সময় মনে করিয়া ভীতিব্যঞ্জক স্বরে আমি গৃহিণীকে চুপি চুপি বলিলাম—

"ভগবান আজ কি বিপদেই ফেলিলেন! রাত্রিকালে

এই সব পাণ্ডাদের কবলে পড়িয়া হয়ত যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে হইবে!"

গৃহিণী উত্তর করিলেন—"এমনই করিয়া স্ত্রীলোকের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ভাবিলেই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবে নাকি?"

আমি বলিলাম—"তা'ত হ'বে না জানি! কিন্তু আমি একটা স্থির করিব, শেষে একটি বিপদ ঘটিলে তুমি বল্‌বে হয়ত আমার বুদ্ধির দোষেই এই কাণ্ড ঘট্‌ল।"

"গৃহিণী।—তুমি কি স্থির কর্‌লে আগে বল দেখি শুনি!"

আমি।—এই আগে দুই চা'র জন পাণ্ডার সঙ্গে কথা-বার্ত্তা কহিয়া দেখি, যাহাকে ভাল বলিয়া মনে হইবে তাহার সঙ্গেই যাইব।

গৃহিণী।—আর যা'কে ভাল বলে মনে কর্‌বে সে যদি দুর্দ্দান্ত দস্যু হয়?

আমি।—লোক চিনিবার ক্ষমতা কি আমার এতটুকুও নাই, তুমি মনে কর?

গৃহিণী।—হয়'ত কিছু আছে! কিন্তু সে ক্ষমতার পরীক্ষা এমন ভীষণ সময়ে না করিলেও ক্ষমতাটা নষ্ট হইবার ত আশঙ্কা নাই? এখন আমি যা বলি তাই ক'র; তুমি ষ্টেশনমাষ্টারের কাছে যাইয়া বল "আপনার পরিচিত একজন পাণ্ডার নাম বলিয়া দিন।"—

আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম—"সব কার্য্যেই তোমার গৃহকর্ত্রীর ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাও নাকি? আমি একজন ভাল লোক বাছিয়া লইতাম, সেটাও তোমার মনঃপূত হইল না।"

কথাটায় গৃহিণীর আনন্দ হইল কিনা জানি না, তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন—"তোমার নির্ব্বাচিত পাণ্ডা যদি অসাধু হয়, কাহাকে তজ্জন্য দায়ী করিবে? কিন্তু ষ্টেশনমাষ্টারের নির্ব্বাচিত পাণ্ডা অত্যাচার করিলে ষ্টেশন-মাষ্টারকে দায়ী করিতে পারিবে; ষ্টেশনমাষ্টার রেলওয়ে কর্ম্মচারী! তাহাকে ত চাকরির ভয় করিতে হইবে।"

কথাটা সঙ্গত বটে! কিন্তু গৃহিণীকে নিজের জেদ বজায় রাখিতে দেখিয়া একটু রাগ হইল। কিন্তু পথের মধ্যে গৃহিণীর সঙ্গে তর্ক করা আর কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইল না!

ফররুখাবাদ জেলাবাসী পক্ককেশ ষ্টেশনমাষ্টার বাবু তখন একজন সন্ন্যাসীকে ধরিয়া কিছু "উপরি" আদায়ের চেষ্টা করিতেছিলেন। সন্ন্যাসী সেতুবন্ধ হইতে শ্রীপঞ্চমী উপলক্ষে সরযূতে স্নান করিতে আসিয়াছেন। সন্ন্যাসী যে স্থান হইতে টিকিট করিয়াছেন, সেই টিকিটের ভয়ঙ্কর গোলযোগ উপস্থিত! সেই টিকিট লইয়া পূর্ব্বদিন অযোধ্যা ষ্টেশনে

অবতরণ করা উচিত ছিল। পথে একদিন বিলম্ব করিয়া ফেলিয়াছে। সন্ন্যাসীর কাছে এক কপর্দ্দকও নাই। সুতরাং ষ্টেশনমাষ্টার বাবুর শীকার হাতছাড়া হওয়ায় তাঁহার মনটা তখন ভাল ছিল না। আমার প্রশ্নে ষ্টেশন-মাষ্টাব বলিলেন—"এত পাণ্ডা রহিয়াছে, আপনার মনোমত একজন বাছিয়া লইতে পারেন বাবু!"

আমি গৃহিণীর বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলাম—"আপনি নির্ব্বাচিত করিয়া দিলে বিনা সন্দেহে তাহার গৃহে গিয়া উঠিতে পারি।"

মাষ্টার বাবু একজন পাণ্ডাকে ডাকাইয়া বলিলেন—"এই পাণ্ডা আচ্ছা আদমী বাবু! ইহার সঙ্গে যাইলে আপনাদের কোন কষ্ট হইবে না।"

একখানি ঠেলাগাড়িতে আমাদের জিনিষ পত্র সমস্ত তুলিয়া দিয়া দুইখানি একাতে আমরা সকলে উঠিয়া বসিলাম।

গাড়িতে উঠিয়া পাণ্ডার সঙ্গে চুক্তি করিলাম, সরযূ তীরে আমাদের বাড়ী চাই এবং যে বাড়ী আমরা বাসোপযোগী মনে করিব সেই বাড়ী লইব।

স্ত্রীলোকদিগকে গাড়ীতে রাখিয়া আমরা সরযূতীরে ৮।১০খানি বাড়ী দেখিলাম। কোন বাড়ীই আমার পছন্দ

হইল না। অবশেষে আরও চারি পাঁচখানি বাড়ী দেখিয়া সরযূতীরে একখানি দ্বিতল বাড়ী মনোনীত করিলাম। এখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা আছে, কিন্তু সে অট্টালিকায় জানালা নাই! বাহিরের নির্ম্মল বায়ু সহস্র চেষ্টা করিয়াও গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতে পায় না! আমরা অনেক চেষ্টা করিয়া নির্ম্মল বায়ু প্রবেশের দ্বারযুক্ত একটি বাড়ী সংগ্রহ করিলাম। এই অট্টালিকার জানালা না থাকিলেও প্রতি গৃহে দুইটি করিয়া দ্বার ছিল। গৃহিণীও পছন্দ করিলেন, নচেৎ সেই রজনীতে আবার গৃহান্বেষণে বহির্গত হইতে হইত। গৃহিণীর জিনিষপত্র গুছাইতে ও ও ঘরকন্না সাজাইতে এক প্রহর রজনী অতিবাহিত হইয়া গেল। তাহার পর পাকাদির অনুষ্ঠান হইল। মাতুল সে ভার মহা উৎসাহের সহিত গ্রহণ করিলেন। আহারাদির পর আমরা সকলেই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম। বিদেশে এই প্রকার প্রগাঢ় নিদ্রা সুখ অনেক দিন উপভোগ করি নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

১৯১৪ অব্দের ২৯শে জানুয়ারি ১৩২০ সালের ১৬ই মাঘ প্রভাতে যে বিমল আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম, তাহা লেখনীমুখে বর্ণনা করিবার শক্তি আমার নাই! হৃদয়ের সে আনন্দ ভাষায় ব্যক্ত করিবার মত শক্তি হইতে ভগবান আমাকে বঞ্চিত করিয়াছেন! হৃদয়াভ্যন্তরে যে সূক্ষ্ম ভাবকণা ভাসিয়া উঠিয়া মানুষকে সময় বিশেষে আনন্দরাজ্যে ভাসাইয়া লইয়া যায়, আমার মত অক্ষমের সাধ্য কি যে, সেই অবক্তব্য অনির্ব্বচনীয় ভাবকে লেখনীর সাহায্যে ভাষার আবরণ দিয়া ধরিয়া রাখিতে পারি! যে দিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যায় শয়ন করিয়া ঘুমঘোরে অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে যখন সরযূ দর্শন করিলাম, তখন কি এক অব্যক্ত ভাবরাজ্যে আমাকে যেন ভাসাইয়া লইয়া গেল!. ভগবানকে অশ্রুসিক্ত নয়নে বার বার প্রণাম করিয়া বলিলাম—হে সুন্দর। হে প্রিয়দর্শন! হে সচ্চিদানন্দ! তোমার সৃজিত রাজ্যে এমন সুন্দর সুন্দর দৃশ্য না জানি কতই আছে! দেখিবার মত পুণ্য নাই, সামর্থ্য নাই, শক্তি নাই, তাই আমরা দেখিতে পাই না।

প্রত্যুষে সরযূ দর্শন করিয়া ভাবিলাম আজ আমাদের

সুপ্রভাত! এমন সুন্দর প্রভাত,—প্রভাতে এমন সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য—আঁখিযুগল ইহা কোনদিনই উপভোগ করিয়া ধন্য হয় নাই!

আমরা ঠিক সরযূর উপরেই দ্বিতল বাড়ীভাড়া লইয়াছিলাম। রজনীর অন্ধকারে সরযূর সুন্দর দৃশ্য দেখিতে পাই নাই! উষালোকে সরযূ দর্শন করিয়া প্রাণমন পুলকিত হইয়া উঠিল। সরযূর পরপারে যত দূর দৃষ্টি যায়, বালুকারাশি ধূ ধূ করিতেছে। সে কি অপরূপ দৃশ্য—পূর্ব্বগগণে তপনদেবের উদয় হইবার এখনও চিহ্নমাত্র নাই! সেই দারুণ শীতে শত শত নরনারী, বালক, বৃদ্ধ, যুবা স্নান করিয়া ফিরিতেছে, আবার দলে দলে অন্যলোক যাইয়া তাহাদের স্থান পূর্ণ করিতেছে! মুখে অবিরাম 'রাম' 'রাম' শব্দ! রাম নাম গানে, সরযূরতীর মুখরিত হইয়া সেই প্রভাতকে আরও যেন সুন্দর করিয়া তুলিতেছে! সে দৃশ্যের ভাষায় বর্ণনা হয় না! প্রত্যুষে শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে এমন আনন্দ আমি কোন দিন পাই নাই! অনেকক্ষণ শয্যায় পড়িয়া সরযূর এই নয়নাভিরাম দৃশ্য অবলোকন করিলাম। সরযূ হইতে চক্ষু ফিরাইতে—আঁখির পলক ফেলিতে আমার ইচ্ছা হইল না। আমি নির্নিমেষ নয়নে আনন্দে আত্মহারা হইয়া চাহিয়া রহিলাম।

কতক্ষণ আমি এই ভাবে ছিলাম—বলিতে পারি না। খোকাদের উৎপাতে যখন আমি শয্যা ত্যাগ করিলাম, তখন তপনদেবের স্বর্ণরশ্মিতে সরযুর পবিত্র ধারাগুলি স্বুবর্ণ পাতের মত দেখাইতেছিল!

শয্যাত্যাগান্তে ছাদে আসিয়া উদাসনয়নে উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ে সরযূর পানে চাহিয়া রহিলাম। কাহাকেও জিজ্ঞাসা কবিবার পূর্ব্বে আমাব মনে হইল, সবযূ প্রায় তিন মাইল প্রশস্ত হইবে। মাঝে মাঝে সামান্য জল থাকিলেও যতদূব দৃষ্টি যায়, কেবল বালুকারাশি ধূধূ করিতেছে! বর্ষাকালে যখন সরযূর দুই কুল ছাপাইয়া যায়, তখন যে কি ভয়ানক দৃশ্য, হয়, তাহা চক্ষে না দেখিলেও অনুমান করা কঠিন নয়। পরে জানিলাম প্রত্যুষে প্রথম দর্শনে সরযূকে তিন মাইল প্রশস্ত বলিয়া আমি যে অনুমান করিয়াছিলাম আমার সে অনুমান ঠিক নহে।

ছাদ হইতে অনেকক্ষণ অনিমেষ নয়নে সরযূর পানে চাহিয়া থাকিয়া আমি গৃহের বাহির হইয়া পড়িলাম। তারপর সরযূতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে আমার মনে হইল আমি যেন একটি অভাবনীয় দেশে অভিনব স্বর্গরাজ্যে উপনীত হইলাম! সরযূতীরে দেবালয়ে দেবালয়ে শঙ্খঘণ্টা সমূহ গম্ভীরভাবে নিনাদিত হইতেছে। সে কি পবিত্র গম্ভীর নিনাদ! প্রাণ যেন আনন্দে লাফাইয়া উঠিতে লাগিল। সরযূর তীরে

তীরে সোজা পথ ধরিয়া যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম—ততই কেবল দেবালয়। আর প্রত্যেক দেবালয়ে প্রভাতী পূজার শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসরের বাদ্যের সঙ্গে "রাম," "রাম," "জয় রামের" শব্দ শুনিলাম পাইলাম! যতই অগ্রসর হই—ততই দেবালয়, আর দেবালয়ের মধ্য হইতে প্রাণমাতান "রাম রাম" ধ্বনি!

সরযূতীরে দেবালয় দর্শন করিতে করিতে বেলা নয় ঘটিকার সময় বড় রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বাসা হইতে কত দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, স্থির করিতে না পারিয়া চিন্তায় পড়িলাম। কোন পথ ধরিয়া আমাকে বাসার দিকে ফিরিতে হইবে, তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। অনেক চিন্তার পর একখানি ঠেলাগাড়ী ভাড়া করিলাম। দুই চাকার ঠেলাগাড়ী অযোধ্যায় এই নূতন দেখিলাম। এই ঠেলাগাড়ী আমাদের দেশের কতকটা গরুর গাড়ীর মত। তবে চওড়াতে আমাদের দেশের গরুর গাড়ীর দ্বিগুণ হইবে। দুইজন মানুষে এই ঠেলাগাড়ীকে ঠেলিয়া লইয়া যায়। গাড়ীর উপরে একটা ছাউনি থাকে বটে, কিন্তু রৌদ্রের তাপ বা আকাশের বারিধারা হইতে আরোহীকে রক্ষা করিতে পারে না। ঠেলাগাড়ীতে উঠিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে বেলা সার্দ্ধ দশ ঘটিকার সময় বাসায় আসিয়া পৌঁছিলাম।

একটু বিশ্রাম করিবার পর সরযূতে স্নান করিবার জন্য বহির্গত হইলাম। পাণ্ডাদের মুখে শুনিলাম সম্মুখের ঐ এক মাইল ব্যাপি বালুকারাশি পার হইয়া যাইতে পারিলে স্বচ্ছ, নির্ম্মল ও পবিত্র জল পাওয়া যায়। আমাদের বাসার সম্মুখেই সরযূ, কিন্তু সেখানে প্রতি মুহূর্ত্তে শত শত তীর্থ যাত্রী স্নান করার জন্য তত্রস্থ সলিল রাশি একবারে কর্দ্দমাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা এক মাইল বালুকারাশি পার হইয়া সরযুব নির্ম্মল সলিলে অবগাহন করিতেই মনস্থ করিলাম।

মনের আনন্দে প্রাণপণে ছুটিয়া এক মাইল বালুকারাশি পার হইয়া পড়িলাম। আহা! সরযূর কি স্বচ্ছ মনোহর সলিলরাশি! এরূপ পরিষ্কার কাকচক্ষুর ন্যায় স্বচ্ছ জল আমি আর কোথাও কথন দেখি নাই! সলিলে অবগাহন করিয়া হৃদয় মন পবিত্র হইল।

আমি তিন মাস ম্যালেরিয়া জ্বরের যাতনা ভোগ করিতেছিলাম। তিনমাসের মধ্যে এক দিনও অবগাহন স্নান করি নাই। আজ প্রায় ঘণ্টাব্যাপি সরযূতে পড়িয়া থাকিয়া কেবল যে তৃপ্ত হইলাম, তাহা নয় নবজীবন প্রাপ্ত হইলাম। স্নান করিয়া যখন তীরে উঠিলাম তখন মনে হইল, আমার পাপ তাপ, রোগ শোক, জ্বালা যন্ত্রণা সকলই যেন সরযূ স্রোতে ভাসিয়া গেল। সরযূতীরে অগণিত নরনারী সুগন্ধি

পুষ্পমাল্যে ডালা পূর্ণ করিয়া বিক্রয়ার্থ উদয়াস্ত বসিয়া আছে! তাহাদেব নিকট হইতে অঞ্জলী পুরিয়া পুষ্পমাল্য লইয়া পুণ্যতোয়া সবযূর পূজা করিয়া আরও তৃপ্ত হইলাম।

স্নানান্তে বাসায় ফিবিতে প্রায় একটা বাজিয়া গেল। নিম্নতলে উপস্থিত হইয়াই শুনিতে পাইলাম, দ্বিতলে স্ত্রীলোকেরা ভয়ঙ্কর কোলাহল করিতেছে! কেহ হো হো করিয়া হাসিতেছে, কেহ বা নাকী স্বরে কাঁদিতেছে, খোকা এক একবাব আধ আধ ভাষায় হো হো করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। কোলাহল শুনিয়া প্রথমে একটু ভয় হইয়াছিল না জানি কি বিপদ ঘটিয়াছে! কিন্তু খোকার আনন্দ চীৎকার ও স্ত্রীলোকদের হাস্যরবে আশঙ্কা দূর হইলেও কোলাহলের কারণ হৃদয়ঙ্গম কবিতে পারিলাম না। দ্রুতপদে উপরতলে আসিয়া গৃহিণীর মুখে যাহা শুনিলাম এবং স্বচক্ষে যাহা দেখিলাম তাহাতে সত্যই স্তম্ভিত হইয়া পড়িলাম। গৃহিণী বলিলেন "আমাদের বাঙ্গালা দেশে অনেক ডাকাতির গল্প শুনিয়াছি—কিন্তু অযোধ্যায় যে, এমন দিনে ডাকাতি হয়, তাহা জানিতাম না! আর একটু হইলে আমাদিগকে খুন করিয়া যথাসর্ব্বস্ব লইয়া পলাইত। আর তীর্থে কাজ নাই, এখন ছেলেদিগকে লইয়া পালাইতে পারিলে বাঁচি। বাপ্ রে বাপ"—এই বলিয়া গৃহিণী বসিয়া পড়িলেন!

একক্রোশ বালুরাশি অতিক্রম করিয়া আসিলাম। বেলা একটা বাজিয়া গিয়াছে, পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ! ক্ষুধায় প্রাণ যায় যায়! কোথায় বাসায় আসিয়া আহারাদি করিয়া শ্রান্তি দূর করিব আশা করিয়া আসিতেছি না অদৃষ্টগুণে বিধাতা সকলই উল্টাইয়া রাখিয়াছেন। আমিও হতভম্ব হইয়া গৃহিনীর পার্শ্বে বসিয়া পড়িলাম। আবার ডাকাতের দল গৃহে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল! তাহাদিগকে বাধা দেয় কাহার সাধ্য!

যাঁহারা কখন অযোধ্যায় গিয়াছেন, তাঁহারা অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্রের বাহনের উৎপাত স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা কখন অযোধ্যা গমন করেন নাই, তাঁহারা হয়ত অযোধ্যায় বানরের অত্যাচার কাহিনী পুস্তকে পাঠ করিয়া সমুহ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্র এখন নাই, কিন্তু অযোধ্যা এখন "বানরের রাজ্য" একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অযোধ্যায় বানরেরা ইংরাজরাজের ভয় রাখে না, পুলিশকে মানে না, সিপাহী ফৌজকে গ্রাহ্য করে না! লাঠি লইয়া তাড়াইতে গেলে শত সহস্র বানর আসিয়া আক্রমণকারীকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়, আক্রমণকারী তখন লাঠি ফেলিয়া প্রাণ লইয়া ছুটিয়া পলায়। তাহার জীবন সঙ্কটময় হইয়া উঠে। অযোধ্যায় বানরের দল সত্যই স্বাধীন, তাহাদের অবারিত দ্বার, স্বাধীন গতি! একতায় বলে ইহারা

বলীয়ান, মানুষের শক্তিকে ইহারা গ্রাহ্যই করে না! দুর্গী-বাড়ী, মথুরা, বৃন্দাবন, কাশী প্রভৃতি স্থানে বানরের উৎপাত দেখিয়াছি,কিন্তু অযোধ্যায় বানর সমাজে যেরূপ একতাশক্তি বিরাজমান—এমনটি অন্য কোথাও দেখি নাই! একটি বানরকে অপমান করিলে এমন কি চক্ষু রাঙ্গাইলে দলে দলে বানর সমবেত হইবে। অযোধ্যাবাসী পাণ্ডাদেরও কড়া হুকুম রামজীর ভক্ত সেবককে কেহ কিছু যেন না বলে! যে বানরের গায়ে হাত তুলিবে, তাহার আর রক্ষা নাই! অযোধ্যাবাসীরা বানরকে সত্যই দেবতার ন্যায় ভক্তি করিয়া থাকে। অযোধ্যাবাসী নরনারীরা অগ্রে বানরকে কিঞ্চিৎ খাইতে দিয়া তবে ভোজনাসনে উপবেশন করে। অযোধ্যার বানরেরা টেক্স দিবার ভয়ে কথা কহে না। ইহারা অতিশয় বুদ্ধিমান। কথা কহিতে না পারিলেও সকলই বুঝিতে পারে। আকার ইঙ্গিতে ইহারা মনোভাব প্রকাশ করে। খাইতে দিলে ইহারা যাত্রীদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করে; কিন্তু ইহাদের সঙ্গে অসৎব্যবহার করিলে যাত্রীদের আর রক্ষা নাই। যে কোন যাত্রী অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেই বানরের দলকে কিছু ভোজন সামগ্রী দিতে হইবে—না দিলে যাত্রীদিগকে বানরের হস্তে অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিত হইতে হইবে। আবার ভোজন সামগ্রী না দিয়া তাহাদিগকে

যদি বিরক্তি বা অপমানিত করিতে চেষ্টা করে, তবে যাত্রীদের লাঞ্ছনার আর সীমা থাকে না। আমাদের এই শেষোক্ত অবস্থা ঘটিয়াছিল।

আমি বাসা হইতে বাহির হইয়া যাইবার পরেই একে একে বানরেরা দেখা করিতে আসিল। কেহই তাহা-দিগকে বসিতে বলিল না, খাইতে দিল না, অধিকন্তু স্ত্রীলোকেরা তাহাদিগকে "দগ্ধবদন" বলিয়া গালাগালি করিল! কেহ কেহ তাহাদিগকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া তাড়াইয়া দিতে অগ্রসর হইলেন। আমার দুরন্ত খোকা একটা যষ্টিহস্তে তাহাদিগকে মারিতে গেল! ফলে তাহারা জোর করিয়া খাবার আদায়ের চেষ্টা করিল। কেহ রন্ধনশালায় অন্নের হাঁড়িতে হাত দিল—কেহ বা ডালের হাঁড়িতে চুমুক মারিল—কেহ বা শিশুদের দুগ্ধ লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিল! ব্যাপার দেখিয়া স্ত্রীলোকেরা ভয়ে ত্রাহি মধুসূদন রবে ছুটিয়া পলাইল! তখনই তাহাদিগকে সযত্নে কিঞ্চিৎ খাদ্য সামগ্রী দিলে তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিত না! কিন্তু এ অভিজ্ঞতা বাসায় কাহারও ছিল না! মাতুল এক দীর্ঘ যষ্টি লইয়া তাহাদিগকে মারিয়া তাড়াইয়া দিতে গেল, ইহাতে তাহাদের ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিল;—লঙ্কাকাণ্ডের সূচনা হইল। বানরেরা জোর করিয়া জিনিষ

পত্র কাড়িতে আরম্ভ করিল। কেহ গামছা লইয়া পলাইল, কেহ কাপড়, কেহ কাপড়ের পুঁটুলি, কেহ জুতা, কেহ বা খোঁকার সাটিনের পোষাক লুঠতরাজ করিয়া পলাইল। মেয়েরা তখন কোলাহল করিয়া কান্নাগোল তুলিল; মাতুল গৃহকোণে বসিয়া বলিতে লাগিলেন "আমাদের দেশ হইলে একবার বানরের দলকে দেখিয়া লইতাম!" ব্যাপার দেখিয়া দুইজন সাধু ছুটিয়া আসিলেন। তাঁহাদের উপদেশে বাজার হইতে গৃহিনী তাড়াতাড়ি দুইসের খাবার ক্রয় করিয়া আনাইলেন। সাধুদ্বয় স্নেহজড়িতস্বরে মিষ্ট ভাষায় নিমন্ত্রণ করিয়া বানরের দলকে ডাকিতে লাগিলেন, অনভিজ্ঞ নবাগত যাত্রীদের অপরাধ ক্ষমা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। অনেক সাধ্যসাধনার পর বানরের দল একে একে নামিয়া আসিল। একখানি গামছা ও একখানি কাপড় ব্যতীত সমস্ত জিনিষপত্রই বানরের দল দয়া করিয়া ফিরাইয়া দিলেন। পরে অনুসন্ধানে জানা গেল, খোকা ও মাতুল যে বানরদুটিকে প্রহারের জন্য যষ্টি উত্তোলন করিয়াছিল, তাহারা ক্রোধে কাপড় গামছাখানি দন্তে ছিন্ন করিয়া সরযূ সলিলে নিক্ষেপ করিয়াছে। অযোধ্যায় বানরের কাহিনী, তাহাদের বংশ পরম্পরায় ইতিহাস, এবং তাহাদের হস্তে আমাদের নির্য্যাতনের কথা বিস্তারিত লিখিতে হইলে

পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হইয়া পড়ে, সুতরাং বাধ্য হইয়া এইখানেই আমাদিগকে নিরস্ত হইতে হইল। অযোধ্যায় মাছির অত্যাচারও বানরের অত্যাচার অপেক্ষা অল্প নহে। মক্ষিকার অত্যাচারে খাদ্যসামগ্রী,—ডাল, ভাত, তরকারী মুহূর্ত্তের জন্যও অনাবৃত রাখিবার উপায় নাই। মক্ষিকা ও বানরের দল আমাদের অযোধ্যাবাসের প্রধান শত্রু হইয়া উঠিল।

আমাদের আহারীয় সামগ্রী অধিকাংশই বানরে নষ্ট করিয়া দিয়াছিল, অবশিষ্ট যাহা ছিল তাহাতেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। নানারূপ গল্প গুজবের পর গৃহিণী বলিলেন—"বেলা শেষ হইয়া আসিতেছে, দেব-দর্শনে কখন যাওয়া হইবে? আমরা এখনও কিছু দেখিতে পাই নাই।"

বেলা সার্দ্ধ পাঁচ ঘটিকার সময় দুইখানি ঘোড়ার গাড়ী আনাইয়া আমরা দেবদর্শনে বহির্গত হইলাম।

অযোধ্যায় ঠেলা গাড়ী ও একাই অধিক, ঘোড়ার গাড়ী অতি অল্পই আছে এবং তাহাদের ভাড়াও অত্যাধিক। স্ত্রীলোকদিগকে একায় লইয়া যাওয়া সুবিধাজনক হইবে না ভাবিয়া অতিরিক্ত ভাড়া দিয়া আমরা দুইখানি ঘোড়ার গাড়ীই ঠিক করিলাম। এখানে আমরা অনেক অনুসন্ধান

করিয়াও একজনমাত্রও বাঙ্গালীর সন্ধান পাইলাম না। আমরা যেখানেই গিয়াছি সেইখানেই দুই একটি বাঙ্গালী দেখিয়াছি, কিন্তু অযোধ্যায় বাঙ্গালীর মুখ দেখিতে না পাইয়া বড়ই ক্ষুণ্ণ হইতে হইয়াছিল।

আমরা বাসা হইতে বহির্গত হইয়া প্রথমেই হনুমান-পুরীতে হনুমানজীকে দর্শন করিতে গেলাম। হনুমানজীর মন্দির ও নাটমন্দির বহুসংখ্যক হিন্দুস্থানী যাত্রীতে পরিপূর্ণ। অনেক কষ্টে জনতা ঠেলিয়া আমাদিগকে ভিতরে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। একটী বৃহৎ ছত্র মস্তকে ধারণ করিয়া হনুমানজী উপবেশন করিয়া আছেন। বহু সাধু-সন্ন্যাসীকে এখানে দেখিতে পাইলাম। হনুমানজীর মন্দিরটী অতি সুন্দর, মন্দির মধ্যে একটী ভাল চাঁদোয়া ও উৎকৃষ্ট ছাতা আছে।

হনুমানজীকে দর্শন করিয়া আমরা কনকভবনে উপস্থিত হইলাম। এই দেবালয়টি প্রকাণ্ড। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কনকভবনের চারি পার্শ্বে মার্ব্বেল মণ্ডিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে! দুঃখের বিষয় এত বড় বৃহৎ দেবালয়ে একটিও জানালা নাই। আলো না জ্বালিলে দেবদর্শন করা কঠিন। এখানে রামসীতা মূর্ত্তি বিরাজমান। শুনিলাম রামসীতা এই কনকভবনে রাত্রিযাপন করিতেন। কনকভবন রামসীতার নিদ্রা যাইবার ঘর।

কনকভবন হইতে আমরা রতনসিংহাসন দেখিতে গেলাম। এখানে রাম, সীতা ও লক্ষণের সুন্দর মূর্ত্তি বিরাজমান। বাড়ীটী সুন্দর নানা কারুকার্য্যখচিত, নাই কেবল জানালা! দেবালয়ের মধ্যে অনেক অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু বায়ু চলাচলের একটি ছিদ্রও দেখিতে পাইলাম না। এখানে রামসীতা ও লক্ষ্মণ বহুমূল্য স্বর্ণালঙ্কার ও স্বর্ণমুকুটে সজ্জিত। এখান হইতে আমবা ভরতের বাড়ী দেখিয়া দশরথের যজ্ঞশালায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। যজ্ঞশালায় সিঁড়ি দিয়া নামিতে হয়। দশরথ পুত্রেব জন্য যেরূপভাবে যজ্ঞ করিয়াছিলেন সমস্তই দেখিতে পাওয়া যায়! দেখিতে দেখিতে হৃদয়ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠে। মনে হয় সত্যই বুঝি এটা রামরাজ্যের যুগ! এখান হইতে আমরা ইচ্ছা ভবনে আসিলাম। এখানে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত শত্রুঘ্ন ও সীতাদেবীর সুন্দর মূর্ত্তি আছে। ইহাও একটি প্রকাণ্ড দেবালয়।

ইহার পর আমরা দশরথের বাড়ী বা আনন্দভবন দেখিতে গেলাম। এখানে বশিষ্ঠ ঋষি, দশবথ, কৌশল্যা, রামচন্দ্র প্রভৃতির সুন্দর মূর্ত্তি বিরাজমান। কৌশল্যা রামচন্দ্রকে ক্রোড়ে করিয়া আছেন, অন্যান্য রাণীদেরও সন্তান ক্রোড়ে রহিয়াছে, তাই ইহার নাম বোধ হয় আনন্দভবন

দেওয়া হইয়াছে। লক্ষ্মণ কাকের সঙ্গে খেলা করিতেছে, মূর্ত্তিটি বড়ই মনোরম।

কৈকয়ীর ক্রোধাগার বা মানঘর দেখিতে গেলাম। কৈকয়ী দেবী ক্রোধে শয়ন করিয়া আছেন, পুত্র ভরত নানা প্রকারে জননীকে বুঝাইতেছেন। সে দৃশ্য অতি সুন্দর! এখান হইতে আমরা চব্বিশ অবতার দেখিতে গেলাম। রামচন্দ্র কখন কোন্ অবতার হইয়াছিলেন, তাহারই মূর্ত্তি বর্ত্তমান। এই স্থানেই আমাদের রজনী দশ ঘটিকা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। চারিদিকে বিরাট অন্ধকার! হঠাৎ সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে গৃহিণীর পদস্খলন হইল এবং তিনি ধরণীতলে পড়িয়া গেলেন! এই অতর্কিত পতনে তাঁহার বামপদে ভীষণ আঘাত লাগিল। সে রাত্রে আমাদের আর কিছুই দেখা হইল না। গাড়ী লইয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম। আসিতে আসিতে দেখিলাম সহস্রাধিক যাত্রী সরযূর দিকে আসিতেছে, ইহাদের মধ্যে ত্রৈলঙ্গী যাত্রীই অধিক। বাসায় আসিয়া জলযোগান্তে ক্লান্তদেহে শয়ন করিবামাত্র আমরা নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রত্যুষে সরযূ দর্শন করিয়া আনন্দে হৃদয় ভরিয়া উঠিল। সেই প্রচণ্ড শীতে অগণিত নরনারী "রামজী কি জয়" বলিতে বলিতে "অযোধ্যাপতি রঘুনাথজীকি জয়" শব্দ করিতে করিতে সরযূতে স্নান করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছে। সে কি অভিনব সুন্দর দৃশ্য! দেবালয়ে দেবালয়ে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিতেছে, মুহুর্মুহু "ধনুকধারী রাম" "জয় জয় রাম" "সীতাপতি রাম" ।"জয় রাম সীতারাম" রবে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। কাহারও মুখে অন্য কথা নাই, অন্য চিন্তা নাই, কেবল "রাম রাম" শব্দ। প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় যখন রামায়ত বৈষ্ণবগণ সরযূতীরে বসিয়া মধুর রামনাম উচ্চারণ পূর্ব্বক স্তোত্র পাঠ করেন—শুনিলে মনে এক আশ্চর্য্য ভাবের উদয় হয়।

অযোধ্যায় দ্বাদশ সহস্র বৈষ্ণব সাধু বাস করিতেছেন। ইহার উপর প্রত্যহই বিদেশ হইতে সাধু সন্ন্যাসী আসিয়া থাকেন, দুই একদিন অযোধ্যায় বাস করিয়া তাঁহারা চলিয়া যান। আর কোন তীর্থে এরূপ রামভক্ত বৈষ্ণব সাধুর সমাগম নাই। শুনিলাম ঠাকুরবাড়িতে বিশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া ভোগ দিলে অযোধ্যায় সমস্ত বৈষ্ণব

সাধুকে একবেলা ভোজন করান যায়। আমরা গণনা করিয়া তিন শত ষাটটি ঠাকুর বাড়ী অর্থাৎ রামচন্দ্রের মন্দির দর্শন করিয়াছিলাম। হনুমানজীর মন্দির, লছমনজীর মন্দির, ত্রেতানাথ মন্দির, নাগেশ্বর নাথের মন্দির বিশেষ প্রসিদ্ধ। হনুমানজীর মন্দিরই বহু পুরাতন। ইহার সমকক্ষ পুরাতন মন্দির অযোধ্যায় আর নাই। হনুমানজীর মন্দির ব্যতীত প্রায় সমস্ত মন্দিরই আড়াই শত বৎসর হইতে তিনশত বৎসরের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে রামনবমীর মেলা অতি প্রসিদ্ধ। রামনবমীতে যেরূপ উৎসব হয় অযোধ্যায় আর সেই প্রকার উৎসব কখনও হয় না। তখন এত সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হয় যে, অযোধ্যায় তিলধারণের স্থান থাকে না। অযোধ্যা লোকারণ্য হইয়া উঠে। শ্রাবণ মাসে আর একটি ঝুলন মেলা হইয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষেও আর একটি মেলা হয়। এই দুই মেলাতেও বহু সাধু সন্ন্যাসী ও যাত্রীর সমাগম হয়, তবে রামনবমীর মেলাই শ্রেষ্ঠ মেলা। বর্ষাকালে ঝুলন মেলার সময় সরযূর প্রশস্ততা ছয় মাইল বৃদ্ধি হয়। তখন সরযূর বিশলতা কল্পনা করিলেও হৃদয় শিহরিয়া উঠে।

অযোধ্যায় ২৫৮ ঘর পাণ্ডা আছে। ৮৪ ক্রোশ জুড়িয়া

অযোধ্যাব সীমা। মেলার সময় সাধু সন্ন্যাসীগণ এই ৮৪ ক্রোশ পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। সাধু সন্ন্যাসী-গণের অযোধ্যা পবিভ্রমণ করিতে ১৫ দিন সময় লাগে। ধর্ম্মপ্রাণ যাত্রীরা কেহ ১২ ক্রোশ, কেহ ৫ ক্রোশ, আবাব কেহ বা ২॥০ ক্রোশ পরিভ্রমণ করিয়া নিয়ম রক্ষা করে। চৈত্রমাসের পূর্ণিমা, কার্ত্তিকের শুক্ল নবমী ও একাদশী অযোধ্যা পরিভ্রমণেব প্রশস্ত দিন। অযোধ্যাব সীমা—প্রথম ফটক লক্ষৌ, দ্বিতীয় ফটক বারাহিচ, তৃতীয় ফটক গোবথপুর ও চতুর্থ ফটক জোনপুব। এখানে গোমতী গঙ্গা অযোধ্যার শেষ সীমা।

পূর্ব্বদিন রাত্রি হইয়া যাওয়ায় আমাদের অদৃষ্টে সমুদায় দেবালয় দর্শন করা ঘটে নাই। অদ্য প্রাতে স্নানকৃত্য সমাপন করিয়া দেবালয় দর্শনে যাইবার মনস্থ করিলাম। প্রাতঃকালেই দেবদর্শনে যাইবার কথা শুনিয়া মাতুল চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া উঠিলেন। ক্রোধে তাঁহার ক্ষীণতনু কম্পিত হইতে লাগিল। ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে মাতুল বলিলেন "প্রাতঃ-কালে দেবদর্শনে যাইবে তবে আহারাদি হইবে কোথা? আত্মাকে কষ্ট দিয়া পুণ্য করিতে গেলে তাহাতে পুণ্য হয় না, পাপই অর্জ্জন করা হয়। আত্মা নারায়ণ, তাঁহাকে কষ্ট দিবার তোমার কি অধিকার আছে। বাজারে দেখিয়া

আসিলাম, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফুলকপি সাজান রহিয়াছে। এক একটি ওজনে পাঁচ ছয় সেরের কম হইবে না! বড় বড় আলু মটর সুটি ইত্যাদিরও অভাব নাই। কপির দর জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম তিন চারি পয়সার বেশী নহে। তবে দুঃখের কথা অযোধ্যায় মৎস্য আহার নিষেধ! মাছ খাইলে পাণ্ডারা নানাপ্রকারে নির্য্যাতন করিয়া অযোধ্যা হইতে তাড়াইয়া দেয়। এমন কপি কিন্তু বাবা! তুমি কলিকাতায় দু টাকা দিলেও পাবে না। কি সুন্দর সুন্দর সব তরি-তরকারি দেখিলাম। আমি জোগাড় করিয়া দিই, দশটার মধ্যেই খাওয়া দাওয়া শেষ হইয়া যাইবে। পরে সুস্থদেহে দেবদর্শনে চল—ফুর্ত্তি হইবে। আত্মা নারায়ণও সন্তুষ্ট থাকিবেন। আমার বাবা বলিতেন "তৈয়ারি খানা মাৎ ছোড় না"। তিনি আরও বলিতেন "বাবা যেথানেই যাও আহারটা—"

মাতুলের বক্তৃতার বিরাম নাই। দেখিলাম বাধা না দিলে বক্তৃতা বন্ধ হইবার সম্ভাবনা অল্প! অগত্যা মাতুলকে আহারের আশ্বাস দিয়া সান্ত্বনা করিলাম। মাতুল আনন্দে আমার প্রদত্ত টাকাটা দুই তিন বার মেঝের উপর বাজাইয়া লইয়া ভৃত্য সঙ্গে বাজারে চলিয়া গেলেন। দ্বিপ্রহরের মধ্যে আহারাদি শেষ করিয়া দেবদর্শনে বহির্গত হইব এবং রজনী

দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত অযোধ্যায় দেবালয়ে দেবালয়ে ঘুরিয়া বেড়াইব, ইহাই স্থির হইল।

মাতুল অল্পক্ষণ মধ্যেই বাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়া রন্ধনের উদ্যোগ করিয়া ফেলিলেন। দেখিলাম বাস্তবিকই অযোধ্যায় তরকারী খুব সস্তা। মাতুল প্রাতে উঠিয়াই কোথায় কোন জিনিষ পাওয়া যায়, তাহার সন্ধানে থাকিতেন। একাজটা মাতুলকে কখন বলিতে হইত না, কিন্তু অন্য কাজে সহস্রবার অনুরোধ করিলেও মাতুল যাইতে চাহিতেন না। এইস্থলে একদিনের একটি ঘটনার কথা বলিব।

একদিন রজনী আট ঘটিকার সময় আমাদের বাসায় হ্যারিকেন আলোটি নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। সে দিন ভ্রমক্রমে সন্ধ্যার সময় কেরোসিন তৈল লওয়া হয় নাই। বিদেশে বিশেষতঃ রাত্রিকালে আলো না থাকিলে কত রকম বিপদ ঘটিতে পারে, সুতরাং স্ত্রীলোকেরা মাতুলকে কেরাসিন আনিবার জন্য অনেক সাধ্য সাধনা করিতে লাগিল। মাতুল যে কেবল বাজারের দূরত্ব ও অন্ধকার রজনীর আপত্তি করিতেছেন তাহা নহে, তিনি বলিলেন "আমার দক্ষিণ পঞ্জরে একটা ফিক্ বেদনা ধরিয়াছে, আজ আর তোমরা আমাকে কোন ফরমাইস করিও না। করিলেও আমি এক পা কোথাও নড়িব না!"

স্ত্রীলোকদের বহু কাকুতি মিনতিতে কোনই ফল হইল না দেখিয়া আমি মাতুলকে বলিলাম—"এখানের রাবড়িটা আসিযাবধি এক দিনও খাওয়া হইল না। সন্ধ্যার পর এখানকার রাবড়িই খুব ভাল হয়। সের দুই রাবড়ি আনিলে সকলেরই খাওয়া হইত। এখানকার রাবড়িটার এত প্রশংসা শুনিলাম না খাইযা যাওয়াটা ঠিক নয়? কি বল মামা?"

মাতুল বলিলেন "নিশ্চয়ই নয় বাবা। আমি আসিয়াবধি এখানকার রাবড়ির প্রশংসা শুনিতেছি। তুমি যখন খাইতে সখ করিয়াছ দাও লইযা আসি। তেলটাও লইযা আসিব। আজ শরীরটা ভাল নাই বাবা। কেবল তেল আনার কাজ হইলে শর্ম্মা আজ আর কোথাও নড়িত না।" মাতুল বাজারে যাইতে আর তিলমাত্র বিলম্ব করিল না। মাতুল চলিযা গেলে হাস্যরবে আমাদের অন্ধকারবাসাটা সজীব হইযা উঠিল।

১২টার মধ্যেই আমাদের আহারাদি শেষ হইযা গেল। পূর্ব্বদিনের গাড়োয়ান দুইজনও ঠিক সময়ে গাড়ী লইয়া উপস্থিত হইল। ভৃত্যের উপর বাসার ভার দিয়া আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম। অযোধ্যায় এই ভৃত্যটিকে লইয়া একটু ব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। একেই অযোধ্যার ভাষা

ঝঝা আমাদের পক্ষে একটু কষ্টকর হইয়াছিল, তাহার উপর এই নিম্নশ্রেণী বেহারার কথা বুঝা আমাদের পক্ষে একবারেই সম্ভবপর ছিল না। তাহাকে সরযূ হইতে জল আনিতে বলিলে পয়সা চাহিত। লবণ আনিতে পাঠাইলে অড়হরের ডাল আনিয়া হাজির করিত। কিন্তু ভৃত্যটি বড়ই সরল, অমায়িক ও অকপট ছিল। ভদ্রলোকের মত কপটতা জুয়াচুরি সে একবারেই জানিত না। সদাই হাসিমুখে কাজ করিত। তিনআনা পয়সার জন্য সকাল হইতে রজনী দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত সরযূ হইতে জল তুলিয়া দিত। আসিবার সময় গৃহিণীর কাছে একখানি পুরাতন বস্ত্র পাইয়া সে আনন্দপূর্ণ সরল মুখছবিখানি লইয়া ছলছল নেত্রে বলিল—"মায়ী! আমি তোদের কি করিতে পারিযাছি যে বকৃসিস দিলি? যা কিছু করিযাছি তার জন্য ত রোজ পযসা দিয়াছিস্? তবে আবার এই কাপড় দিলি, এতে তো আমার পাপ হবে না মায়ী?"

ভৃত্যের সরলতা ও সাধুতা দেখিযা সত্যই আমি চক্ষে জল রাখিতে পারি নাই। লোকটা গরীব ও অল্পে তুষ্ট বলিয়া মিথ্যা চাতুরী কাহাকে বলে শিখিবার অবসর পায় নাই এবং বোধ হয় প্রয়োজনও হয় নাই।

দ্বিপ্রহর রৌদ্রে বাহির হইয়া প্রথমেই আমরা হনুমান-

জীর মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। অযোধ্যায় বহু পুরাতন এই হনুমানজীর মন্দিরটি পূর্ব্বদিন ভাল করিয়া দেখিবার সুবিধা ঘটে নাই! একটিও জানালা না থাকায় মন্দিরের ভিতর সেই দিবা দ্বিপ্রহরেও অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া বসিয়া আছে। দেখিলাম আজ অগণিত বানরের পাল মন্দির বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছে। হনুমানজীর প্রসাদ লইয়া খোকা আমাদিগকে বিতরণ করিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ এক বানর আসিয়া খোকাকে চপটাঘাতে ভূলুণ্ঠিত করিয়া সেগুলি কাড়িয়া লইয়া গেল। খোকা ভয়ে আর বানর ব্যূহের মধ্যে দাঁড়াইতে চাহিল না। অগত্যা আমরা হনুমানজীকে প্রণাম করিয়া রামচন্দ্রের জন্মভূমি দেখিতে আসিলাম। বেদীর মত খানিকটা উচ্চ স্থান ইহাই শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থান বলিয়া কথিত। এই স্থানে পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বৃক্ষলতা সমাচ্ছন্ন স্থানটি অতি মনোহর। অদ্যাপি যাত্রীরা যাইয়া এই বেদী প্রদক্ষিণ করিয়া থকে। বেদির নিকটে এক জোড়া জাঁতা ও একটী উনান আছে। অনেকে বলে রামচন্দ্র সীতাকে বিবাহ করিয়া আনিলে বৌভাতের যজ্ঞ হয়। তাহাতে ঐ উনানে রান্না এবং ঐ জাঁতায় ডাইল ভাঙ্গা হইয়াছিল। অযোধ্যায় সমস্ত তীর্থগুলি দেখিয়া বেশ হৃদয়ঙ্গম হইল যে, রামের অপেক্ষা হনুমানের আদর অনেক বেশী।

শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি দেখিয়া আমরা সীতাদেবীর বন্ধনশালা দেখিতে গেলাম। বন্ধনশালা পাতালের মধ্যে অবস্থিত। সিঁড়ি ধরিয়া বহুদূর নামিয়া গেলে তবে বন্ধনশালা দেখিতে পাওয়া যায়। এখান হইতে অন্যান্য দেবালয় দর্শন করিয়া আমরা অযোধ্যায় মহারাজের বাড়ী দেখিতে গেলাম। চারিটি ফটক পার হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। বৃহৎ রাজঅট্টালিকা, কিন্তু জানালা সম্বন্ধে সেই একই প্রথা। এখান হইতে আমরা বাজার ইত্যাদি ঘুরিয়া বেড়াইলাম। মোটামুটি প্রায় সর্ব্বপ্রকার জিনিষই অযোধ্যার বাজারে পাওয়া যায় দেখিলাম। বাঙ্গালীর দোকান অযোধ্যা অঞ্চলে একটিও নাই। তরকারী দুগ্ধ এখানে প্রচুর এবং অন্যস্থানাপেক্ষা সুলভ। চাউল এখানে ভয়ঙ্কর মহার্ঘ্য।

রজনী সার্দ্ধ দশঘটিকা পর্য্যন্ত আমরা দেবালয়ে দেবালয়ে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলাম। প্রত্যেক দেবালয়েই শ্রীরামচন্দ্র, সীতাদেবী ও লক্ষ্মণ ভরতাদির মূর্ত্তি। যদিও এখন অযোধ্যার ত্রেতাযুগের কিছুই নাই, তত্রাচ স্থান মাহাত্ম্য হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠে। ইহা যে ত্রেতাযুগের ধ্বংসাবশেষ, সরযূনদীই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আমি কয়েকজন পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ইহাই যে

রামচন্দ্রের লীলাভূমি অথবা এই স্থানই যে রামরাজ্য ছিল তাহার প্রমাণ কি? দুইজন পণ্ডিতজী শাস্ত্রবচন আওড়াইয়া ও সরযূকে দেখাইয়া ইহাই যে ত্রেতার অযোধ্যা তাহা প্রমাণ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রে বর্ণিত অযোধ্যার চিহ্নিত স্থানগুলি তাহারা আমাকে বিশেষ করিয়া দেখিতে বলিয়াছিলেন। শাস্ত্রবচন হইতে অযোধ্যার স্থানগুলির কোনই অসামঞ্জস্য দেখিতে পাইলাম না!

রজনী একাদশ ঘটিকার সময় আমরা বাসায় আসিয়া শয়ন করিলাম।

নবম পরিচ্ছেদ।

১৯১৪ অব্দের ৩১শে জানুয়ারী। প্রত্যূষে সরযূ দর্শন করিয়া হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠিল। অসংখ্য ধর্ম্মপ্রাণ নরনারী সরযূতে স্নান করিয়া চলিয়া যাইতেছে, আবার "রামলছমন" শব্দে দলে দলে লোক সরযূর দিকে অগ্রসর হইতেছে। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই সেই সমুদ্রবৎ জনসংঘ কেবলই আসিতেছে এবং যাইতেছে। আজ সরযূ যেন আমাকে শত বাঁধনে বাঁধিয়াছে। কাল হইতে আর অদৃষ্টে সরযূ দর্শন ঘটিবে না, কারণ আজ আমাদিগকে অযোধ্যার

কাছে বিদায় লইতে হইবে। উদাসপ্রাণে নির্নিমেষ নয়নে সরযূপানে চাহিয়া পাছি। অযোধ্যাধাম ত্যাগ করিতে মন সরিতেছে না। এই পবিত্র স্মৃতিময়ী নগরী আজ ত্যাগ করিয়া যাইব, যখনই এই কথা মনে করিতেছি তখনই অজস্র অশ্রুধারা আসিয়া বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া দিতেছে।

হায়। কোথায় সেই ত্রেতাযুগ। কোথায় সেই রামরাজ্য, আর কোথায় সেই পূর্ণব্রহ্ম ভগবান রামচন্দ্র। সেই আদর্শ-চরিত্র রামের অযোধ্যা জানি না, কোন পাপে পরিবর্ত্তিত হইল। সুখের স্মৃতিতেও সুখ, তাই আজ অযোধ্যা দর্শনে সুখলাভ করিলাম। আমাদের যে সুখ, যে সমৃদ্ধি ছিল, তাহা ত কোন দেশে কোন জাতির ছিল না। আমাদের সেই ধর্ম্মবল, সেই সামর্থ্য, সেই স্বাস্থ্য, সুখ, শান্তি আজ গেল কোথায়? কি পাপে আমরা সমস্ত হারাইলাম। যে দেশে অযোধ্যা, বৃন্দাবন, কাশী,—যে দেশে গঙ্গা, গোদাবরী, সরযূ তেমন দেশ পৃথিবীতে আর আছে কি? এই ফলজলশস্য সমন্বিত নদীমাতৃক দেশ আর কোথায় আছে কি? আমার মনে বারবার এই প্রশ্ন হইতে লাগিল যেন এই দেশেই পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে পারি। আমাদের এখনও যাহা আছে, কোন্ দেশ তাহার সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইতে পারে কি? হায়। পুণ্যতোয়া সরযূ, তুমি যে

ত্রেতাযুগের স্মৃতি বুকে ধরিয়া আজও বহিয়াছ, তাই তোমার দর্শনে কত ব্যথা হৃদয়ে জাগিয়া উঠিতেছে। প্রাণের কত সুখের কথা এই ক্ষীণপঞ্জরের ভিতর ঢাকা রহিয়াছে। সে সব স্বপ্নের কথা আর কহিবে না কি জননী! ত্রেতা দ্বাপরের সব কথাই ত তোমার বক্ষে ঢাকা রহিয়াছে মা। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আজানুলম্বিত বিশাল বাহু, শান্তসৌম্য মুখমণ্ডল, জ্যোতিষ্মান উজ্জ্বল চক্ষু ধর্ম্মবলে মাতোয়ারা ভগবৎ ভক্ত দেবর্ষির মত বীরবপু লইয়া তোমার সলিলে অবগাহন করিয়া যাইত, আর আজ আমরা কি অবস্থায় তোমার তীরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি মা? আমাদের ধর্ম্ম নাই, কর্ম্ম নাই, শক্তি নাই, সামর্থ্য নাই, মিথ্যা, কপটতা, অধর্ম্মভরা শক্তিহীন, ক্ষীণ কঙ্কালসম তনু লইয়া তোমার তীরে আসিয়াছি! কলুষিত হস্তে তোমার সলিল স্পর্শ করিবারও যে সাহস হয় না মা। ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষদের বংশধর হইয়া প্রাচীন বনিয়াদি বংশের সন্তান হইয়া আজ আমরা নষ্ট চরিত্র, কলুষিত চিত্ত ভিখারীরও অধম। জানি না আরও কত যুগ ধরিয়া অবনতির অতল সলিলে নিমজ্জিত হইয়া থাকিতে হইবে মা।

প্রাতে সরযূতীরে দাঁড়াইয়া কত কথাই মনে হইতে লাগিল! মনের কথা খুলিয়া বলিলে মানুষ পাগল বলে! পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের আমাদের যুগসমৃদ্ধির কথা মনে উঠিয়া

সত্যই প্রভাতে সরযূর তীরে আমাকে পাগল করিয়া তুলিল! কেন আমরা আচার ভ্রষ্ট হইলাম, কেন যোগভ্রষ্ট হইলাম, কেন পূর্ব্বপুরুষেব আচার, ব্যবহার, নিয়ম, শৃঙ্খলা ত্যাগ করিলাম, কেন পুরাতন রীতি নীতি ত্যাগ করিয়া নূতনের চাকচিক্যে ভুলিলাম, কেবল এই সবই মনে হইতে লাগিল! শত বৎসর পুর্ব্বে হিন্দু বলিয়া গর্ব্ব করিবার আমাদের যাহা ছিল, তাহাও যে আমাদের এখন আর নাই! ভাবিতে ভাবিতে মস্তক বিঘুর্ণিত হইয়া গেল! চক্ষু মুদিয়া সরযূ-তীরে বসিয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ বসিয়াছিলাম মনে নাই! যখন চক্ষু উন্মীলন করিলাম, তখন পূর্ব্বগগণ লোহিতাভায় রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে! সরযূব ধূ ধূ বালুকারাশির উপর কে যেন স্বর্ণরেণু ছড়াইয়া দিয়াছে, সরযূব পবিত্র সলিলে কে যেন একখানি সুবর্ণেরপাত বিছাইয়া দিয়া গিয়াছে! হায়! এমন স্বর্ণরেণু মাখা সরযূ আর কোন্ দেশে আছে! তাই বুঝি ভারত জগতের মাঝে শ্রেষ্ঠ পবিত্র দেশ! আজ ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে সরযূর অপরূপ শোভা দেখিয়া শরীর সত্যই পুল-কিত হইয়া উঠিল! জীবন সার্থক ও হৃদয় পুলকিত হইল।

অদূরে চাহিয়া দেখি সেই প্রচণ্ড শীতে, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে আমাদের বাসার স্ত্রীলোকেরা স্নান করিয়া ফিরিতেছে!

একেই মাঘমাসের শীত, তাহার উপর আমাদের বঙ্গদেশাপেক্ষা অযোধ্যায় শীত চতুর্গুণ প্রবল! অযোধ্যার ভীষণ শীতে সরযূর বরফ মিশ্রিত সলিলে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে স্নান করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। স্ত্রীলোকদিগের ধর্ম্মভাবের মনে মনে প্রশংসা করিয়া বলিলাম—ধন্য হিন্দু নারীগণ! এখন তোমরাই কেবল আমাদের অন্তঃপুরে ধর্ম্মভাব জাগাইয়া রাখিয়াছ। তোমাদের সমকক্ষ হইবার আমাদের এখন আর শক্তি নাই।

যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, "হনুমানজী" "রাম লছমনজী" প্রভৃতি উচ্চগম্ভীর নিনাদের সঙ্গে শঙ্খ ঘণ্টারব কর্ণে প্রবেশ করিয়া হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, বৈষ্ণব সাধু সন্ন্যাসীগণ রামমূর্ত্তি সন্মুখে রাখিয়া পূজা করিতে বসিয়াছেন। সম্মুখস্থ জনসংঘকে তাঁহাদের লক্ষ্য নাই; তাঁহারা যেন চিরতরে পার্থিব দৃষ্টি রোধ করিয়া ভগবানের চরণে নয়নযুগল ন্যস্ত করিয়াছেন। আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, কতকগুলি সাধু মহাত্মা রামস্তোত্র ও তুলসীদাসের রামায়ণ ভক্তি গদগদচিত্তে পাঠ করিতেছেন! তাঁহাদের অমিয়মাখা স্বর হৃদয় মোহিত করিয়া তুলিল।

আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া যাহা দেখিলাম, তাহা

চক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না! কয়েকজন সন্ন্যাসী সরযূর বালুকারাশির উপর উলঙ্গদেহে ধ্যানস্তিমিত নেত্রে বসিয়া আছেন! দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন তাঁহাদের এই ভাবেই গত হইয়া যাইতেছে! সে বালুকারাশি বরফ অপেক্ষাও শীতল, বেলা দশ ঘটিকার পূর্ব্বে যে বালুকার উপর খালি পায়ে বিচরণ করা ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক, সেই বালুকার উপর সমস্ত রজনী অনাবৃত অঙ্গে অতিবাহিত করা অল্পশক্তির কার্য্য নহে। মস্তকের উপর সমস্ত রজনী বরফ পতিত হইতেছে,—আর বরফ অপেক্ষাও শীতল বালুকা-রাশি তাঁহাদের আসন। ভগবৎভক্ত সাধুদের অসীম শক্তি দেখিয়া সত্যই আমি শিহরিয়া উঠিলাম!

সন্ন্যাসীদের পুণ্যপ্রভাব অবলোকন করিয়া এবং পুরা-ঙ্গনাদিগকে ব্রহ্মমুহূর্ত্তে স্নান করিয়া আসিতে দেখিয়া আমার হৃদয়ে অভিনব বলের সঞ্চার হইল! ছুটিয়া বাসায় আসিয়া রুগ্ন দেহ হইতে অলষ্টার, পশমিকোট, গেঞ্জ, ওয়েষ্টকোট, মোজা, সার্ট ইত্যাদি রজকের ভারবাহী রুগ্ন গর্দ্ধভের মত বোঝাগুলা নামাইয়া ফেলিয়া মাতুলের অনুসন্ধান করিলাম। মাতুল তখনও দুইখানি লেপে আপাদমস্তক মণ্ডিত করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। অতি কষ্টে মাতুলকে শয্যায় বসাইয়া বলিলাম—"আজ শ্রীপঞ্চমী অদৃষ্টে এমন দিন আর আসিবে

না, চল আমরা সংক্রান্ত প্রাতঃস্নান করিয়া আসি।" মাতুল চীৎকার করিয়া বলিলেন—"হে ভগবান্! আমার সমস্ত বাকি ছিল, বুকে বেদনা, পেটের ভয় বা ব্রঙ্কাইটিস্ বা নিমোনিয়া এই ভাব একটা হইয়াছে। আমাকে মাপ কর বাবা!" স্নান করিলে আমি আর একদণ্ড বাঁচিব না।"

হাত ধরিয়া বলপূর্ব্বক মাতুলকে সরযূর দিকে টানিয়া লইয়া গেলাম। মাতুল চীৎকার করিয়া মুখে যাহা আসিল, তাহা বলিয়াই গালাগালি দিতে আরম্ভ করিল। আমি সে দিকে আদৌ কর্ণপাত করিলাম না। সরযূর বালুকারাশির উপর আসিয়া যখন পদযুগল একেবারে অসাড় হইয়া উঠিল, তখন মাতুলের কণ্ঠস্বর উচ্চ হইতে আরও উচ্চতর হইল। গালাগালির ভাষাটাও তখন ভগবানের দিকে প্রস্ত করিল। সহসা বালকের মত আস্ফালন করিয়া মাতুলকে লইয়া উভয়ে একত্রে সরযূতে স্নান করিয়া হৃদয় মন শীতল করিলাম। স্নানান্তে মাতুল বলিলেন—"বাবা! তোমার চেষ্টাতেই আমার আজ অদৃষ্টে সরযূ স্নান ঘটিল।" তখন আমি মাতুলকে গালাগালিগুলি ফিরাইয়া লইবার জন্য অনুরোধ করিলাম এবং মাতুলও আনন্দিত চিত্তে মুখ গহ্বর হইতে রাশি রাশি আশীর্ব্বাদবাণী বাহির করিয়া ফেলিলেন।

স্নানান্তে অর্দ্ধক্রোশব্যাপী বালুকারাশি বালকের ন্যায়

ছুটিয়া আসিলাম! সে আনন্দ ভাষায় বুঝাইবার নয়! অদ্য শ্রীপঞ্চমী সুতরাং অগণিত যাত্রী সরযূতে স্নান করিতে আসিয়াছে, সাধু সন্ন্যাসীরও সংখ্যা নাই! সরযূ আজ যেন বিশাল নরসমুদ্রে পরিণত হইয়াছে। অযোধ্যায় বৈষ্ণব সাধুগণ অধিকাংশই চিরকুমার! তাঁহাদের কমনীয় তেজব্যঞ্জক মূর্ত্তিগুলিতে যেন দৈন্য মাথান! দেখিবামাত্র প্রাণে ভক্তির উদ্রেক হয়! অনেকগুলি বৈষ্ণব সাধুর সহিত আমাদের পরিচয় ঘটিয়াছিল! বিদায়মুহূর্ত্তে তাঁহাদিগকে ত্যাগ কবিয়া আসিতে সত্যই প্রাণে অসহনীয় যাতনানুভব করিয়াছিলাম।

অযোধ্যায় আমাদের তিন রাত্র অতিবাহিত হইয়া গেল। অদ্য আমাদের বিদায়ের দিন। তাড়াতাড়ি আহারাদি শেষ করিয়া লইলাম। কারণ ১১টার সময় আমাদিগকে ট্রেন ধরিতে হইবে।

দেখিতে দেখিতে বিদায় মুহূর্ত্ত সমাগত হইল। পাণ্ডা মহাশয় প্রকাণ্ড লম্বা খাতা লইয়া আসিলেন। সাতপুরুষের নাম তাহাতে লিখিয়া দিতে হইল। পাণ্ডা হনুমান মহারাজ বিশাল দেহখানি খাড়া করিয়া আমাদিগকে একে একে আশীর্ব্বাদ করিলেন। দক্ষিণাদি লইয়া পাণ্ডা আমাদের সঙ্গে কোন গোলযোগ করে নাই, বরঞ্চ সদ্ব্যবহারই করিয়া-

ছিলেন। তিনদিনেই অযোধ্যা মমতা ডোবে আমাদিগকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল। অতি কষ্টে সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া আমরা বাসা হইতে বহির্গত হইলাম। অশ্বযান ষ্টেশনাভিমুখে ছুটিতে লাগিল। বারবার প্রণাম করিয়া সরযূ ও অযোধ্যার নিকট আমরা চিরবিদায় গ্রহণ করিলাম।

দশম পরিচ্ছেদ।

বহুদিনের সাধ ছিল হরিদ্বার দর্শন করিব। সময় না হইলে কোন বাসনাই পূর্ণ হয় না। আবার কত বাসনা জীবনে অপূর্ণই থাকিয়া যায়। ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত মানুষের ইচ্ছায় কিছুই ঘটে না, বা ঘটিতে পারে না! মানুষ দারুণ ভ্রমবশে বলিয়া ফেলে কাজটা আমি করিলাম! কিন্তু মানুষ যখন সহস্র চেষ্টাতেও কোন কাজ সম্পন্ন করিতে পারে না, তখন মানুষ হতাশ হইয়া বলে, একাজটা সম্পন্ন হওয়া ভগবানের অভিপ্রেত নয়! মানুষের ইচ্ছা বা চেষ্টায় কিছুই ঘটে না! আমার বিশ্বাস জগতে ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কার্য্যেই সেই মঙ্গলময় করুণাময়ের কোমল হস্তাঙ্গুলির নির্দ্দেশ আছে। অযোধ্যা হইতে বাহির হইয়া গাড়ীর

মধ্যেই জল্পনা কল্পনা চলিতে লাগিল, এই দারুণ শীতে একটি দেড় বৎসরের ও একটি চারি বৎসরের দুগ্ধপোষ্য শিশুকে লইয়া হরিদ্বার যাওয়া কর্ত্তব্য কিনা? মাঘের প্রচণ্ড শীত, তাহার উপর হরিদ্বারের মত স্থান! যাহাকে জিজ্ঞাসা করি সেই উপদেশ দেয়, বরফের দেশে দুগ্ধপোষ্য শিশু ও স্ত্রীলোক লইয়া যাওয়া সুবিবেচনার কার্য্য নহে। আকাশ পাতাল ভাবিতেছি এমন সময় অশ্বযান আমাদিগকে অযোধ্যার ষ্টেশনে আনিয়া পৌছাইয়া দিল। ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া জানিলাম, ট্রেনের জন্য আমাদিগকে তিনকোয়াটার অপেক্ষা করিতে হইবে।

গৃহিণীর মত জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি বলিলেন "হরিদ্বার না দেখিয়া ফিরিব না!" প্রচণ্ড শীতে দুগ্ধপোষ্য শিশু ও স্ত্রীলোকের দল লইয়া প্রাণসঙ্কট অবস্থায় যাইতে হইবে, ভগবান না করুন যদি কোন বিপদ ঘটে, সকল দায় আমার ঘাড়েই পড়িবে,—কেবল ঘাড়ে দায় লইয়াই নিষ্কৃতি পাইব না। যত দোষ, যত অপবাদ, যত কলঙ্ক হয়ত আমাকেই চির-দিন বহন করিতে হইবে। বন্ধুরা হয়ত বলিবেন, অর্দ্ধাঙ্গিনীর কথায় দুর্দ্দান্ত মাঘের শীতে হরিদ্বারের ন্যায় স্থানে, বরফের মাঝে শিশু দুটীকে লইয়া যাওয়া কি বুদ্ধিমানের কার্য্য হইয়া-ছিল! গৃহিণীও এখনকার আবেগ বিস্মৃত হইয়া হয়ত

বলিবেন—"তোমারই বুদ্ধির দোষে এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে!" কি করিব, কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করিব। একটি পরামর্শ করিবার লোক নাই! সম্বল মাত্র গৃহিণী! অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া গৃহিণীকে বলিলাম,—"দেখ হরিদ্বার যাইতে আমার অপত্তি নাই, কিন্তু যদি কোন বিপদ আপদ ঘটে, আমি তজ্জন্য দায়ী হইব না! যত কিছু দায়িত্ব সব তোমাকে গ্রহণ করিতে হইবে,—আর মনে থাকে যেন আমি তোমাকে ও তোমার ছেলেদের লইয়া যাইতে চাহিতেছিনা, তুমিই আমাকে জেদ করিয়া লইয়া যাইতেছ! বিপদ আপদ যদি কিছু ঘটে, তাহাও তোমার জন্য ঘটিয়াছে মনে করিতে হইবে। আমি কোনরূপ কলঙ্কের ভাগী হইব না! এই সব যদি স্বীকার কর, তবে স্পষ্ট উত্তর দাও, আমি টিকিট করিয়া লইয়া আসি।" গৃহিণী গম্ভীরবদনে বলিলেন—"তুমি পুরুষ মানুষ, সুতরাং তোমার কোন দায়িত্ব থাকিবে না, আমি স্ত্রীলোক সুতরাং যত কিছু আপদ বিপদ সবই আমার ঘাড়ে! এমন সুবিচার ত দেখি নাই।"

খালাসী ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া দিল। যাত্রীরা জিনিষপত্র লইয়া তাড়াতাড়ি রেল লাইনের কাছে আসিয়া ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল! তফাৎ করিয়া দুইটা চাপরাশি তাহাদিগকে পশ্চাতে হাটাইয়া দিল! দুই তিনজন লোক ছুটিয়া

আসিয়া "বাবু টিকিস্, বাবু টিকিস্" রবে ষ্টেশন কাঁপাইয়া তুলিল! তাহারা বহুদূর হইতে ছুটিয়া আসিতেছে। একটা খালাসী হাঁকিল "গাড়ী ছোড়া প্যাসেঞ্জার লোক তৈয়ারি রও।" ষ্টেশনমাষ্টার মাথায় টুপি পরিতে পরিতে ছুটিয়া প্লাটফরমের দিকে গেল। টিকিট বাবু টিকিট গ্রহণের জন্য মিলিটারি মেজাজে ফটকের ধারে যাইয়া দাঁড়াইল। যুদ্ধের জন্য সবাই প্রস্তুত, সকলেই নির্নিমেষ লোচনে চাহিয়া আছে গাড়ী কত দূরে! কেবল আমিই তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গৃহিণীর মুখের দিকে চাহিয়া আছি। মাঘের শীতে হিমালয়ের মধ্যে দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগকে লইয়া যাওয়া কম দুঃসাহসের কথা নহে! ভাবিয়া কূল পাইতেছি না।

গাড়ীর সোঁ সোঁ শব্দ ও বংশীধ্বনি স্পষ্টভাবে শুনা যাইতে লাগিল! গৃহিণী বলিলেন "যাহা হয় একটা স্থির কর, গাড়ী আসিয়া পড়িল।"

গৃহিণীর কথায় বড়ই রাগ হইল! আমার বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি গৃহিণীর চক্ষের উপর ন্যস্ত করিয়া রুক্ষস্বরে বলিলাম:— "আমার দ্বারা কিছুই স্থির হইবে না, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর।" কথা কয়টা বলিয়াই আমি বসিয়া পড়িলাম। সত্যই তখন আমি প্রকৃতিস্থ ছিলাম না! এদিকে গাড়ী আসিয়া পড়িল, তখনও টিকিট হইল না! কোথাকার টিকিট করিব,

কোথায় যাইব, সেটাও তখন পর্য্যন্ত জানা নাই। এরূপ সন্ধিক্ষণে মানুষের কিরূপ অবস্থা হয়, সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। কোথাও যাইতে হইলে মানুষ তিন দিন পূর্ব্বে তাহার ব্যবস্থা করে,—অন্ততঃ বাসার বাহির হইবার পূর্ব্বেও একটা স্থির করিয়া তবে ষ্টেশনে যায়, কিন্তু গাড়ী আসিয়া পড়িল, তখনও আমাদের গন্তব্য স্থানের স্থির হইল না! ইহাকেই বলে "পথে নারী বিবর্জ্জিতা!"

এই সময়ে একটা অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিল! কোথা হইতে একজন সন্ন্যাসী আসিয়া আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। কয়েকমুহূর্ত্ত আমার মুখের দিকে চাহিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—"কোথায় ভগবান্ নাই বাবা? হিমালয়ের বরফের মধ্যেও তিনি রহিয়াছেন, তাঁহার নাম করিয়া যেখানে ইচ্ছা নির্ভয়ে চলিয়া যাও!" সন্ন্যাসীর কথায় আমার দেহে যেন তড়িৎ প্রবাহ ছুটিয়া গেল। সুপ্তোত্থিতের মত উঠিয়া দাঁড়াইলাম, কিন্তু সন্ন্যাসীকে আর দেখিতে পাইলাম না! প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল! সন্ন্যাসীকে যেন ইতিপূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল! কিন্তু কোথায় তাঁহাকে দেখিয়াছি ঠিক করিতে পারিলাম না। ব্যাকুলচিত্তে চারিদিকে চাহিতেছি, যদি সন্ন্যাসীকে জনতার মাঝে দেখিতে পাই। এমন সময় ফোঁস ফোঁস শব্দ করিয়া

ষ্টেশনে গাড়ী আসিয়া পড়িল। ভগবানের নাম করিয়া মাতুলকে টিকিট ক্রয় করিতে পাঠাইয়া আমরা গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম। গাড়ী ৫ মিনিট ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া রহিল, সুতরাং আমাদের জিনিষপত্র উঠাইবার কোনই কষ্ট হইল না! গাড়ী ছাড়িবার পূর্ব্বে আমি আরও একবার সন্ন্যাসীর সন্ধান করিলাম। কিন্তু সাধু দর্শন আমার অদৃষ্টে আর ঘটিল না।

ড্রাইভার একবার, দুইবার, তিনবার বংশীধ্বনি করিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল। তখনও সন্ন্যাসীর সেই শান্তসৌম্য মুর্ত্তিখানি আমার নয়নের উপর ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। এবার মনে পড়িল সন্ন্যাসীকে সরযূর সেই বালুকারাশির উপর ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দেখিয়া অসিয়াছি। তবে কি সন্ন্যাসী অযোধ্যা হইতে অন্য তীর্থে চলিয়া যাইতেছেন? সংসারী ক্ষুদ্র জীব হইয়া মহাপুরুষের গতিবিধির ব্যাপার কিরূপে হৃদয়ঙ্গম করিব? ভক্তিভরে সন্ন্যাসীকে শতবার প্রণাম করিলাম। সন্ন্যাসী কি তবে আমার ব্যাকুলতা-দূর করিয়া গেলেন? কিন্তু মনের কথা কি করিয়া জানিলেন? একি প্রহেলিকা বুঝিতে পারিলাম না।

গাড়ী হু হু শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে! সকলেরই হৃদয়ে আনন্দ ভরা! সকলেরই বহুদিনের সাধ হরিদ্বার দর্শনে

যাইবে! আজ সত্য সত্যই আমরা হরিদ্বারের পথে চলিয়াছি। আমার মনে কি যে আনন্দ হইতেছে, তাহা ভাষায় বর্ণনা করিতে পারি না।

পিয়ারা গাছের নিবীড় বন দেখিতে দেখিতে আমরা Fyzabad City ষ্টেশন পার হইলাম। এখান হইতে ইঞ্জিনের গতি আরও দ্রুত হইল। উদ্দামগতিতে এঞ্জিন ছুটিতে লাগিল, সুতরাং অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা (Salarpur) সালারপুর ষ্টেশনে পৌছিলাম। গাড়ী সালারপুর ষ্টেশনে অল্পক্ষণ থামিয়া আবার ছুটিতে লাগিল। চারিদিকে শস্য শ্যামল অরহরের ক্ষেত ও মুকুলভরা আম্রের কানন দেখিতে দেখিতে মনের আনন্দে পবনবেগে ছুটিয়া আসিতে লাগিলাম। এসব স্থান জীবনে কখন দেখি নাই। সুতরাং নূতন দেশে নূতন নূতন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া আনন্দে হৃদয় ভরিয়া উঠিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে মরুভূমির মত মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। সত্যই মরুভূমি বলিয়া ভ্রম হয়! একগাছি তৃণ পর্য্যন্তও দেখিতে পাইলাম না!

এঞ্জিনখানি গাড়ীগুলাকে একদমে টানিয়া আনিয়া (Sohwal) সোয়াল ষ্টেশনে নিশ্বাস ফেলিল! কোন ষ্টেশনেই খাবারওয়ালা বা পানিপাঁড়েকে দেখিতে পাইলাম

না। জল এদেশে খাদ্য সামগ্রী অপেক্ষাও দুর্ম্মূল্য! তবে আমাদের উভয় জিনিষেরই প্রয়োজন ছিল না। কারণ অযোধ্যা হইতে নির্ম্মল পানীয় ও মিষ্টান্ন যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ করা হইয়াছিল। এদেশের খট্‌খটে শুষ্ক মাঠ দেখিয়া আমাদের বাঙ্গালার সেঁত সেঁতে জলাভূমি মনে পড়িল। ম্যালেরিয়া রাক্ষসী এদেশে বেড়াইতে আসিয়া একদিনের জন্য যে কোথাও মাথা গুঁজিয়া থাকিবেন, এমন স্থানটুকু নাই! আমাদের বাঙ্গালা দেশে নানা ব্যাধির আস্তানা আছে,কিন্তু এদেশের লোক বাঙ্গালার পোনর আনা ব্যাধির নাম জানে না। ফাঁকা মাঠ ধূ ধূ করিতেছে, নির্ম্মল বায়ু হু হু করিয়া পল্লীর মধ্য দিয়া বহিয়া যাইতেছে। চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে শয্যাত্যাগ করিয়া নরনারী বালক বৃদ্ধ ভজন গাহিতে গাহিতে কেহ কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিতেছে। কেহ বা কার্য্যানুরোধে গ্রামান্তরে চলিয়া গেল। বালকগণ গ্রামের মধ্যস্থলে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে পাঠ আবৃত্তি করিতে লাগিল, বধূরা গৃহকার্য্য সারিয়া গম পিষিতে বসিল! রাখাল বালকেরা গুরু মহিষাদি লইয়া মাঠের দিকে চলিয়া গেল।

ধনী মহাজন যাহারা, যাহাদের জোত-জমি টাকাকড়ি আছে, তাহারাও হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে! তাহারাও

হাতে বুনা মোটা কাপড় পরে। একজোড়া নাগরায় তিন বৎসর চালাইয়া দেয়! বিলাসিতা কাহাকে বলে, এসব দেশের লোক এখনও জানে না। খাদ্য ইহাদের গম ভাঙ্গা আটার রুটী, গৃহ প্রস্তুত দেবদুর্লভ ঘৃত, মাঠের পরিশ্রম লব্ধ তরি তরকারী, মহিষ গাভীর অপর্য্যাপ্ত ঘৃত ও দুগ্ধ! শুনিলাম এসব দেশে এখনও খাঁটি দুগ্ধ টাকায় কুড়ি সের পাওয়া যায়। এ দেশে নাই কেবল কাঁচা পয়সা! ইহারা অতিথি ফকিরকে সানন্দে এক সের আটা দান করিতে পারে, কিন্তু একটি পয়সা দান করিতে কষ্ট বোধ করে। আমার ইচ্ছা ছিল বড় বড় গ্রামগুলিতে দুই এক দিন থাকিয়া আনন্দ উপভোগ করিব, কিন্তু যে দল লইয়া ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম তাহাতে একঘণ্টা কোথাও থাকিবার উপায় ছিল না।

আমরা (Sohwal) সোয়াল ষ্টেশনের পর (Baragaon) বরগাঁ, ও (Rudauli) রুদাউলি দুইটি ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া আসিলাম কিন্তু একটি বৃক্ষ বা লতা এমন কি একটি দুর্ব্বাঘাস আমাদের নয়ন সমক্ষে পড়িল না। বৃক্ষলতাদিশূন্য কেবলই ধূ ধূ মাঠ! যেদিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবলই মরুভূমির মত মাঠ যেন গ্রাস করিতে আসিতেছে। সেই বৃক্ষলতাদিশূন্য মাঠের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া রেলগাড়ি ছুটিয়া চলিয়াছে, জন মানব, গরু, বাছুর, বিহগ

বিহগী কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না! রেলপথের এরূপ ভীষণতা কোন দিন কোথাও দেখি নাই! এঞ্জিনের ধূমরশির সঙ্গে ধুলিরাশি উড়িয়া আমাদের গাড়িগুলিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া তুলিল। শস্যশূন্য বসুন্ধরার উপমা এইস্থানে আসিয়া বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম। সাহারার মরুভূমি কোন দিন চক্ষে দেখি নাই, কিন্তু এই মাঠে আসিয়া মনে হইল ইহা বুঝি সাহারা মরুভূমির দ্বিতীয় সংস্করণ। বহুক্ষণ রেলগাড়ী ছুটিয়া আসিবার পর আমরা ডরিয়াবাদ ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখান হইতেও দুইধারে মরুভূমির মত ধূ ধূ মাঠ, তবে মাঝে মাঝে অরহর ক্ষেত্র দৃষ্টিগোচর হইল। বহু দূরে দূরে দুই একটি ক্ষুদ্র পল্লী, নির্জ্জন মাঠের মধ্যে অপরূপ সুন্দর দেখাইতেছিল। মনে হইল ছুটিয়া গিয়া পল্লীগুলি দেখিয়া আসি। সভ্যতা বিলাসিতার বিষাক্ত সমীরণ যে সুদূর পল্লীগুলিতে এখনও প্রবেশ করে নাই সে গুলি কেমন অবিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে, দেখিবার বড়ই সাধ হইয়ছিল কিন্তু অদৃষ্টে তাহা ঘটিল না

ইহার পর মাকদায়গঞ্জ, রাসাউলি, বারবাঙ্কি প্রভৃতি ষ্টেশন পবনবেগে অতিক্রম করিয়া আসিলাম। ইহার মধ্যে কোথাও ধূ ধূ মাঠ, কোথাও অরহর ক্ষেত্র, কোথাও মুকুল-ভরা আম্রকানন, কোথাও বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী, কোথাও ক্ষ

গরু ও মহিষের পাল প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে মনের আনন্দে আসিতে লাগিলাম।

মালহাউর ষ্টেশনে আসিয়া এক বিষম সমস্যায় পড়িলাম। আমরা যে গাড়িতে আসিতেছি সেই গাড়িতেই যদি বরাবর যাই, তাহা হইলে অহোরাত্র গাড়িতে থাকিয়া পরদিন তিনটার সময় হরিদ্বারে পৌঁছিব। সমস্ত দিন ও রাত্রে এবং পরদিন তিনটা পর্য্যন্ত গাড়িতে বসিয়া থাকা সহজ ব্যাপাব নহে! বিশেষতঃ দুগ্ধপোষ্য শিশু, বালক ও স্ত্রীলোক ইহাদের কষ্টের একশেষ হইবে। দুগ্ধ, পানীয়, খাদ্যাদি রাত্রি পর্য্যন্ত চলিবে, কিন্তু পরদিন প্রাতেই শিশুদের দুগ্ধাভাব ঘটিবে, যদি পথে দুগ্ধাদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলেই বা কি উপায়ে উহাদের প্রাণরক্ষা হইবে! কিন্তু আমরা যদি লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া পাঞ্জাব মেল ধরিতে পারি, তাহা হইলে আজ রজনী চারি ঘটিকার সময় হরিদ্বারে পৌঁছিতে পারিব।

এ দিকে লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া পাঞ্জাব মেল ধরাও সহজ ব্যাপার নহে। রাশি রাশি লগেজ পত্র এবং স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া লাইন পার হইয়া মেলে উঠান দুঃসাহসিক ব্যাপার। তাহার পর লগেজ পত্র আবার মেলে উঠাইতে হইবে। মেলে স্থানাভাব ঘটিবে কি না তাহাই

বা কে বলিতে পারে? অনেক চিন্তা করিলাম, কিন্তু কোন্‌টা সুবিধাজনক ঠিক করিতে পারিলাম না। যাঁহারা স্ত্রীলোক লইয়া রেলপথে দূরদেশ ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারাই এই সব বিরক্তিকর ব্যাপার প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে পারিবেন। অন্যের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হইবে না।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পাঞ্জাব মেল ধরাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলাম। গৃহিনী বলিলেন "আজ সমস্ত দিন রাত্রি ও কাল তিনটা পর্য্যন্ত গাড়িতে থাকিলে হাঁপাইয়া মারা যাইব।" ভাদ্রবধূটীও গৃহিনীর কাণে কাণে তাঁহার কথারই পোষকতা করিলেন। মাতুল রক্ত চক্ষু করিয়া বলিলেন, "কাল তিনটা পর্য্যন্ত গাড়ীতে থাকিতে হইলে অনাহারে সকলে মারা যাইব, তোমার কি এতটুকুও বিবেচনা নাই? যাহাতে শীঘ্র হরিদ্বারে পৌছনা যায় তাহারই ব্যবস্থা কর।"

বাগবিতণ্ডা শেষ হইবার পূর্ব্বেই গাড়ী লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনে উপস্থিত হইল! "বাবু কুলি" "জল খাবার" "সিগারেট পান" "লেমনেড সোডা" প্রভৃতি রবে ফিরিওলারা গগনভেদী চীৎকার আরম্ভ করিল। কয়েকজন কুলি ডাকিয়া মালপত্র নামাইয়া ফেলিলাম। স্তূপাকার মাল ও স্ত্রীলোক সঙ্গে দেখিয়া রেলওয়ে কুলি মহাশয়েরা নিজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। সকলেই চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল "বাবু পাঁচ রোপেয়া বকসিস্

দেনে হোগা।"তাহার পর যখন শুনিল পরপারে পাঞ্জাব মেলে উঠাইয়া দিতে হইবে, তখন তাহারা একযোগে রুক্ষ গোঁপে দুই তিনবার চাড়া দিয়া হরিদ্রা রঙ্গের পাগড়ী মাথা হইতে খুলিয়া আবার জড়াইতে লাগিল। সকলেরই মুখে আনন্দ দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। মনে মনে তাহারা অর্দ্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যার আশা করিয়াছিল কি না জানি না—কিন্তু মুখ ফুটিয়া কেহই সে কথাটা প্রকাশ করিল না। রেলপথে ভ্রমণ করিয়া রেল কুলি সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলাম। সুতরাং বাক্যব্যয় না করিয়া সাতজন কুলির নম্বর নোটবুকে টুকিয়া লইয়া স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া অগ্রসর হইলাম। কুলিগুলার মধ্যে কেহ বলিল "বাবু পেট ভরণা চাই"। কেহ বলিল "দশ রোপেয়া বক্সিস্ মিল যাগা।" একটা ছোক্‌রা কুলি সে বোধ হয় অল্পদিনই কুলিশ্রেণীতে নাম লিখাইয়াছে, সে ফুকরাইল "এক এক মোটমে এক এক রোপেয়া দেনে হোগা বাবু।" তাহার হিসাবে কুলিদের পারিশ্রমিক চৌদ্দ টাকারও অধিক হয়!

অতি কষ্টে, অনেক বিরক্তিকর ব্যাপার অতিক্রম করিয়া আমরা মেলে উঠিলাম। গাড়ীতে উঠিবার এক মিনিট পরেই গার্ড সাহেব সবুজ নিশান নাড়িয়া

দিল! মেল বংশীধ্বনি করিতে করিতে ষ্টেশন ত্যাগ করিল; আমরাও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

মেল হু হু করিয়া ছুটিতে লাগিল। গৃহিনী জিনিষ পত্র গুছাইতে ব্যস্ত হইলেন। কোনটা বাঁধিতেছেন, কোনটা খুলিতেছেন, তাঁহার আর কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই! আমি গাড়ীতে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম—যদি কোন পরিচিত মুখ দেখিতে পাই! অনুসন্ধানে কোন ফলই হইল না,—একটীও বাঙ্গালীর মুখ দৃষ্টিগোচব হইল না! অগত্যা গাড়ীর জানালায় মুখ বাড়াইয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু অধিকক্ষণ সৌন্দয্য উপভোগ অদৃষ্টে ঘটিল না, মেল দুই একটি ষ্টেশন অতিক্রম করিবার পরই সন্ধ্যাদেবী তিমিরাঞ্চল দিয়া ধরণীর বক্ষ ঢাকিয়া ফেলিলেন।

রজনী দ্বিপ্রহরের সময় আমরা বেরিলিতে আসিয়া পৌছিলাম। একটা হিন্দুস্থানী তাহার বৃহৎ পাগড়ী সমন্বিত মস্তক নাড়িয়া মাতুলকে বলিতেছিল:—"হাঁ বাবু ইয়াকা খাবার আচ্ছা হ্যায়!" বুঝিলাম মাতুল সারাপথ খাস্তাদি

সম্বন্ধেই আন্দোলন আলোচনা করিয়া আসিতেছেন এবং বেরিলিতেই যে যথেষ্ট খাবার মিলিবে এই আশাতেই তিনি এতটা পথ সাহসে বুক বাঁধিয়া আসিয়াছেন। মাতুল রকম বেরকমের ফিরিওয়ালা ডাকিয়া খাবার সংগ্রহ করিলেন। সকলকে খাদ্যাদি বিতরণের ভার গৃহিনী মাতুলের উপরেই অর্পণ করিলেন! মাতুলের মুখকমলে হাসি উছলিয়া উঠিল, এবং তিনি সর্ব্বাগ্রে সেই হিন্দুস্থানীটিকে কিঞ্চিৎ খাদ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন।

গাড়ীর মধ্যে মাতুলকে লইয়া নানারূপ আনন্দ আহ্লাদের মধ্য দিয়া রজনী দেড় ঘটিকার সময় আমরা লক্সর জংসনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই লক্সর ষ্টেশনেই অবতরণ করিয়া আমাদিগকে হরিদ্বারের গাড়ীতে উঠিতে হইবে।

অতি কষ্টে মেল হইতে শিশু ও স্ত্রীলোকদিগকে অবতরণ করাইয়া আমরা কুলি সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলাম। অত্যধিক লগেজ, তদুপরি শিশু ও স্ত্রীলোকের দল দেখিয়া এখানেও রেলওয়ে কুলিরা অত্যধিক দাবী করিয়া বসিল! ছলে, বলে ও কৌশলে কুলি সৈন্যের দলকে পরাস্ত করিয়া তাহাদের মস্তকে লগেজপত্র উঠাইয়া দিলাম।

হরিদ্বারের রেল লাইনটি ছোট, গাড়ীগুলিও ক্ষুদ্রাকার। ইচ্ছা ছিল লক্সর ষ্টেশনটী ভাল করিয়া দেখিয়া লইব, কিন্তু

ভীষণ শীতের প্রকোপে সে আশা ত্যাগ করিতে হইল! হরিদ্বারের পথে মাঘের শেষ রজনীর শীত! সে যে কি ভয়ঙ্কর, ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যে উপলব্ধি করিতে পারিবেন না! গাড়ীতে বসিয়া আমাদের হস্ত পদ অসাড় হইয়া গেল! শিশুদুটিকে গরম কাপড়ে উত্তমরূপে আবৃত করিয়া জড়াইয়া তাহাদের জননী বক্ষের মধ্যে রাখিয়া ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন "ভগবান! এ যাত্রা আমার শিশু দুটিকে রক্ষা কর! এমন বরফের দেশ জানিলে কখন এ পথে পা বাড়াইতাম না!" শীতে আমার অঙ্গও অবশ হইয়া গেল! কিন্তু নিজের প্রাণের মমতা তখন আমার ছিল না, প্রাণঘাতী শীতে মরণের তীরে দাঁড়াইয়া আমিও গৃহিনীর ন্যায় ভগবানের নিকট শিশুদুটির প্রাণ ভিক্ষা করিতে লাগিলাম।

রজনী তিনটা বাজিতে চলিল, তত্রাচ গাড়ী ছাড়িতেছে না, কন্‌কনে শীতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতে লাগিল! কিন্তু গাড়ী ছাড়িবার কোন লক্ষণই দেখিতে পাইলাম না! গাড়ী হইতে অবতরণ করিবারও তখন শক্তি ছিল না যে, বিলম্বের কারণানুসন্ধান করিব। ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়িয়া গাড়ীতেই বসিয়া রহিলাম! আজ কোন দিকেই শুভলক্ষণ দেখিতে পাইলাম না। শুভ কার্য্যের গোড়া হইতেই অনেক সুমঙ্গল ও সুবিধা আসিয়া দেখা দেয়, কিন্তু যে কার্য্যে কষ্ট ও

অসুবিধা ঘটিবে, সেই কার্য্যের প্রারম্ভেই অনেক বাধা বিপত্তি ও অসুবিধা আসিয়া উঁকি মারে! সাংসারিক নানা বিড়ম্বনায় পড়িয়া এই কথাটা এখন আমার স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। তবে প্রারম্ভে অসুবিধা ও কষ্ট দেখিয়া গন্তব্য পথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করা দুর্ব্বল বাঙ্গালীর লক্ষণ বলিয়া আমি মনে করি! যাহা করিতেই হইবে, যথায় পৌঁছিবার জন্য গন্তব্য পথে অগ্রসর হইয়াছি, বিপদের ভ্রুকুটী দেখিয়া স্রোতের কুটার মত পুনরায় ফিরিয়া আসা সজীবতার লক্ষণ নহে।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শিশু দুটিকে লইয়া বরফের মধ্যে বসিয়া সাহসে বুক বাঁধিলাম! ভগবানের ইচ্ছা বা তাঁহার অজ্ঞাতসারে জগতে যখন কোন কার্য্যই ঘটিতে পারে না, তখন আমাদের এই বিপদ কি তাঁহার অজ্ঞাতসারে ঘটিতেছে? আমাদের সাধ্য কি যে রজনীর এ প্রচণ্ড শীতে এখানে আসিতে পারি! তাঁহার ইচ্ছাতেই আসিয়াছি, তাঁহার ইচ্ছাতেই বিপদের সম্মুখীন হইয়াছি, আবার তাঁহার ইচ্ছাতেই যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিবে! সুতরাং তাঁহারই নাম লইয়া নীরবে বসিয়া রহিলাম।

চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ! চতুর্দ্দিকে বরফ পড়িতেছে। পশুপক্ষী স্থাবর জঙ্গম সবই সে ভয়ঙ্কর শীতে স্তব্ধভাব ধারণ করিয়াছে। প্রকৃতির এই বিরাট নৈশসৌন্দর্য্য যথার্থ উপভোগ করিবার

জিনিষ। মেল চলিয়া যাইবার পর লক্সার ষ্টেশনটি শীতের নীরব রজনীর মধ্যে যেন একবারে ডুবিয়া গেল! বাস্তবিকই ব্রাঞ্চলাইনটি একবারে জনমানব শূন্য! আমাদের গাড়ীতে যে দুইচারি জন প্যাসেঞ্জার ছিল, তাহারা জীবিত কি মৃত বুঝিবার উপায় ছিল না! দুর্দ্দান্ত শীত তাহাদের বাক্-শক্তিকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল

আমাদেরও তদবস্থা! বাকৃশক্তি দূরের কথা—মাতুলের স্পন্দনশক্তি পর্য্যন্ত ছিল না! মাতুলের স্পন্দনবিহীন শীতল দেহখানিকে শব বলিয়া ভ্রম হইতেছিল। আমাদের তখন কার অবস্থা বর্ণনা করিয়া পাঠকদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইব না। ক্ষুদ্র গাড়ীখানির মধ্যে মৃত্যুর ক্রোড়ে জীবনকে উৎসর্গ করিবার জন্যই বাকৃশক্তিহীন স্পন্দন রহিত অবস্থায় পড়িয় রহিলাম। আমরা সকলেই তখন উঠিয়া বসিবার সামর্থ্যটুক পর্য্যন্ত হারাইয়াছিলাম। সুতরাং শিশুদুটির কি অবস্থ হইয়াছিল তাহা অবর্ণনীয়।

প্রায় সার্দ্ধ দুই ঘণ্টা পরে বংশীধ্বনি করিয়া গাড়ীখানি ধীর মন্থর গতিতে হরিদ্বারের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। এই সময়ে মাতুল একটু নড়িয়া উঠিয়া বিকট চীৎকার করিয়া উঠিলেন! চীৎকারের কারণানুসন্ধান করিবার সত্যই তখন আমার শক্তি ছিল না! অতি কষ্টে মুখের লেপ উন্মোচন

করিয়া একবার মাতুলের দিকে চাহিলাম, কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার মত শক্তি সংগ্রহ করিতে পারিলাম না! প্রচণ্ড শীতে তখন আমার বুক দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিতেছিল!

হরিদ্বারের পথে গাড়ী যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, প্রবল শীতে ততই আমাদিগকে মৃতবৎ করিয়া ফেলিতে লাগিল! শিশু দুটির চিন্তায় আমার হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল। গাড়ীর জানালা, দরজা, খড়্খড়ি সমস্তই বন্ধ। তাহার উপর গাড়ীখানির চারিদিক কম্বল ও পরিধেয় বস্ত্রে আবৃত করিয়া রাখিয়াছি, তত্রাচ এত শীত কোথা হইতে আসিতেছে!

গাড়ী ষ্টেশনের পর ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু কোন্ ষ্টেশন অতিক্রম করিলাম, কোন্ ষ্টেশনেই বা আসিয়া পৌঁছিলাম বুঝা কঠিন হইয়া উঠিল! সকল ষ্টেশনেই অন্ধকার। কোন ষ্টেশনেই লোক উঠিল না বা নামিল না। এত শীতে কে বা উঠিবে? বুঝিলাম এদেশে রজনীযোগে কেহ কোথাও যাতায়াত করে না। "বিপদ একা আসে না" একথার যথার্থ্যতা আজ বেশ হৃদয়ঙ্গম করিলাম। একটা ষ্টেশনে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল, চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলাম "এটা কোন্ ষ্টেশন?" কাহারও উত্তর পাইলাম না! কে বা উত্তর দিবে?

ষ্টেশনে যে দুই একটি রেলকর্ম্মচারী এই প্রচণ্ড শীতে নাইট ডিউটিতে আছে, তাহারা দরজা জানালা বন্ধ করিয়া প্রজ্জ্বলিত অগ্নির নিকটে কেহ মুদ্রিত নেত্রে বসিয়া আছে, কেহ বা আবার গঞ্জিকা সেবন করিয়া নিদ্রা-দেবীর আরাধনা করিতেছে। তাহারা জানে রজনীতে কোন প্যাসেঞ্জারই নামা উঠা করে না। একটি খালাসী পর্য্যন্ত ষ্টেশনে নাই, ষ্টেশনগুলি বিকট অন্ধকারে যেন শ্মশান-ভূমির ন্যায় পড়িয়া আছে।

আবার একটী ষ্টেশনে গাড়ী থামিল, এ ষ্টেশনটি অন্ধকারে আরও ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। অনোন্যপায় হইয়া এঞ্জিন চালকের উদ্দেশে চীৎকার আরম্ভ করিলাম। ড্রাই-ভার প্রভু কেবল একবার বাঁশী বাজাইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল, আমাদের কাতর চীৎকার তাহার কর্ণবিবরে প্রবেশ করিল না! আবার একটী ষ্টেশনে গাড়ী আসিল,—সেই একই অন্ধ-কার, সেই একইপ্রকার জনমানব শূন্য শ্মশান দৃশ্য আমাদের চীৎকারের বিরাম নাই, ড্রাইভার প্রভুরও তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি কেবল প্রতি ষ্টেশনে একবার গাড়ী থামাইয়া জোরে একবার বাঁশীটা বাজাইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিতেছেন।

এইরূপে আমরা আরও চারিটী ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া আসিলাম। তারপর আর একটী ষ্টেশনে গাড়ী আসিল।

এই ষ্টেশনটির নাম কি তাহা জানিবার উপায় ছিল না! কারণ ষ্টেশনটি নিবীড় অন্ধকারে আবৃত। অনেক চীৎকার করিবার পর এবার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল, গার্ডসাহেব আমাদের কাতর চীৎকারের উত্তরে বলিলেন আমরা হরিদ্বারের পর আরও দুইটী ষ্টেশন পার হইয়া আসিয়াছি।

হায় ভগবান! একি করিলে প্রভু! বিপদের উপর বিপদ ঘনীভূত হইয়া আসিল। বুঝিলাম আজ অদৃষ্টে অনেক কষ্ট আছে। আমরা অবতরণ করিব হরিদ্বার ষ্টেশনে—আসিলাম হরিদ্বার পার হইয়া এক সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে। এই দারুণ শীতে গভীর নীশিথে সকলকে লইয়া কোথায় দাঁড়াইব?

হরিদ্বারের পর আরও দুইটা ষ্টেশন পার হইয়া আসিয়াছি শুনিয়া গৃহিনীর রুদ্ধ অশ্রুধারা প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। শিশুদুটিকে বুকে চাপিয়া সহস্র যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করিয়া গৃহিনী আশায় বুক বাঁধিয়া মনে করিয়াছিলেন, হরিদ্বার ষ্টেশনে পৌছিতে পারিলে তাঁহার শিশুদুটিকে বাঁচাইতে পারিবেন! কিন্তু হায়! সে আশায় ছাই পড়িল! গৃহিনী পাগলিনীর ন্যায় আমার পদতলে পতিত হইয়া "আমার ছেলেদুটি কি উপায়ে রক্ষা পায় গো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল! হৃদয়ের এতটা দৈন্য গৃহিনী আমার কাছে আর কখন দেখান্ নাই! গৃহিনীর সেই বেদনা পূরিত

মুখখানি ও প্রবল অশ্রুধারায় আমাকে বিচলিত করিয়া তুলিল! আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলাম! গৃহিনীকে সান্ত্বনা কবিতে গিয়া দেখি তাঁহার সুকোমল হস্ত দুইখানি দুইখণ্ড শীতল বরফের ন্যায়। হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল! তবে কি হরিদ্বাবেব পথে জীবনসঙ্গিনী ও প্রাণাধিক শিশু-দুটিকে বিসর্জ্জন দিয়া যাইতে হইবে! সেই বিপদ সমুদ্রে ভগবানের করুণাকণা ব্যতীত উদ্ধারেব আব উপায় কি? প্রাণপণে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলাম, "প্রভু হে! বরফও তুমি, জীবনও তুমি, মৃত্যুও তুমি, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক নাথ! কাঙ্গাল করিবার জন্যই কি আজ আমাদিগকে পথে বাহির করিয়াছিলে?" কথা কহিবার শক্তি নাই, ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে অশ্রুধারায় বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল! নিস্তব্ধ রজনী, নিস্তব্ধ প্রকৃতি, জনমানবের সাড়া শব্দ নাই, আমরা নিস্তব্ধতাপূর্ণ গাড়ীখানিতে অদূরে মৃত্যুর ছায়া দেখিয়া কেবল ভগবানকে ডাকিতে লাগিলাম। গৃহিনী ব্যাকুল হইয়া বার বার জড়িত কণ্ঠে কি একটা কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কিন্তু সে কথাটা বুঝিয়া উত্তর দিবার আমার শক্তি ছিল না!

একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া স্থির করিলাম, বাষ্পজান চলিয়া যাক্! যেখানে তাহার গন্তব্য স্থান সেই স্থানে উপনীত

হউক। তারপর যথাকর্ত্তব্য স্থির করা যাইবে। এতক্ষণ আমরা বাষ্পযানের উপর মৃত্যুর অপেক্ষায় পড়িয়া থাকি।

গাড়ী ছুটিয়া চলিল! অর্দ্ধঘণ্টা পরে শ্মশানভূমির মত একটা অন্ধকার ষ্টেশনে আসিয়া একবার দাঁড়াইল। বাঁশীটা বাজাইয়া আবার ছুটিতে লাগিল, আবার একটা ষ্টেশনে দাঁড়াইল, আবার ছুটিতে লাগিল, একটা লোকও উঠিল না বা নামিল না! একটা মানুষেব কণ্ঠস্বরও একবার কর্ণ বিবরে প্রবেশ করিল না উঃ কি সে প্রাণঘাতী যাতনা! কি ভীষণ মৃত্যুর বিভীষিকা! প্রিয়জনদের অমঙ্গলাশঙ্কায় কি সে ব্যাকুলতা! তখনকার কথা, তখনকার সেই উদ্বেগ, আশঙ্কা, চিন্তা, ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি, এমন ভাষা এখনও মানব সমাজে প্রচলিত হয় নাই! এ হৃদয়ের ভাষা হৃদয়বান পাঠকের অনুভব যোগ্য!

যতই রজনী অতীত হইতে লাগিল, শীতের প্রাদুর্ভাব ততই বৃদ্ধি হইতে লাগিল! নিজের মৃত্যু হয় হউক, কিন্তু চক্ষের উপর প্রিয়জনদের মৃত্যু কি করিয়া দেখিব! হৃদয় শিহরিয়া উঠিল! পড়িয়া থাকিতে পারিলাম না! অতি কষ্টে কাঁপিতে কাঁপিতে লেপ ও কম্বলের ভিতর হইতে দেহ-টাকে বাহির করিয়া গৃহিণীর শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করি-লাম। কি মাতৃস্নেহ! জানি না করুণাময় ভগবান কতখানি

করুণা দিয়া মাতৃহৃদয় গঠিত করিয়াছেন। ক্ষুদ্র মাতৃহৃদয়ে এমন সমুদ্র প্রমাণ স্নেহ মমতার কি করিয়া স্থান পাইয়াছে? ধন্য জননীহৃদয়! ধন্য সৃষ্টিকর্ত্তার এই অপূর্ব্ব মাতৃহৃদয়ের সৃষ্টি।

দেখিলাম গৃহিনী নিজ বক্ষের উপর দুইটি শিশুকে রক্ষা করিয়া দুই হস্তে দুইটী শিশুর অঙ্গ ঘর্ষণ করিতেছেন! সমস্ত গরম বস্ত্রগুলি দ্বাবা শিশু দুইটীকে বেষ্টিত করিয়া ফেলিয়াছেন! পাছে বায়ু চলাচল বন্ধ হইয়া শিশুদুটীর অমঙ্গল ঘটে, এই জন্য নিজ মস্তক হইতে গলদেশ পর্য্যন্ত অনাবৃত বাখিয়াছেন! নিজের জীবনের চিন্তা সে মাতৃ-হৃদয়ে কিছুমাত্র নাই! হস্ত দ্বারা দেখিলাম, গৃহিনীর মস্তক, গলদেশ, নাসিকা, কর্ণ যেন বরফ স্তূপে ঢাকা! শরীরে উত্তাপ বা রক্ত প্রবাহের লক্ষণ কিছু মাত্র নাই! গৃহিনীব অবস্থা দেখিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম! প্রবল-বেগে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল! চীৎকার করিয়া বলিলাম "তুমি এ কি করিয়াছ? নিজের জীবনটা কি এতই তুচ্ছ?" গৃহিনী কেবল একবার আমার মুখের দিকে সকরুণ দৃষ্টিপাত করিলেন! বুঝিলাম গৃহিনীর কথা কহিবার শক্তি নাই!

হে ভগবান! এ কি করিলে? তাড়াতাড়ি এক-খানি বস্ত্র জ্বালাইয়া গৃহিনীকে তাপ দিতে লাগিলাম! আবার একখানি বস্ত্র ধরাইলাম, সেখানিও নিঃশেষ হইয়া

গেল। আবার একখানি বস্ত্র জ্বালাইলাম, সম্মুখে বস্ত্র আর পাইলাম না, সমস্তই ট্রঙ্কে আবদ্ধ। সঙ্গে কাগজপত্র যাহা ছিল তাহাই দেশালাই দিয়া জ্বালাইতে লাগিলাম।

কতক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল জানি না! অবশেষে গাড়ী একটা ষ্টেশনে আসিয়া থামিল, আর বাঁশী বাজাইয়া ছুটিল না। গাড়ীখানা নীর্জ্জিব নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দুই একটা মানুষের কণ্ঠস্বরও শুনিতে পাইলাম। মানুষের কণ্ঠস্বরে হৃদয়ে একটু বল আসিল! ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিলাম পাঁচটা বাজিয়া দশ মিনিট হইয়াছে। প্রভাতের বিলম্ব নাই জানিয়া আনন্দে লাফাইয়া উঠিয়া গাড়ীর জানালা খুলিবার চেষ্টা করিলাম। হাত দুইখানা বরফের মত অসাড় ও নিস্পন্দ। গাড়ীর জানালা খুলিবার মত শক্তি সে হস্তে ছিল না।

প্রায় দশ মিনিটের পর হাতে রক্ত চলাচল আরম্ভ হইল; বহু কষ্টে জানালাটা খুলিতে সক্ষম হইলাম। দেখিলাম ষ্টেশনে আলো জ্বলিতেছে। দুই একজন শ্বেতাঙ্গ আপাদ মস্তক গরম বস্ত্রে আবৃত করিয়া বিচরণ করিতেছেন; তখনও চারিদিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার। অতি কষ্টে দূর হইতে ক্ষীণালোকে পড়িতে সক্ষম হইলাম, ষ্টেশনে লেখা আছে "ডেরাড়ুন।"

আনন্দ বিষাদে হৃদয় অধীর হইয়া উঠিল। এ কোথায় আসিলাম? যে ডেরাডুনে আসিবার কল্পনা জীবনে কখন করি নাই, সেই ডেরাডুনে অনিচ্ছায় বিনা চেষ্টায় কে যেন জোর করিয়া মৃত্যুর মধ্য দিয়া টানিয়া আনিয়া ফেলিল। বুঝিলাম ক্ষুদ্র বৃহৎ কোন কার্য্যেই মানুষের হাত নাই; কি একটা অলক্ষিত শক্তিতে আমরা ঘুরিতেছি; যেটা নিশ্চয় হইবার কথা সেটা অনেক সময়েই হয় না। আবার যেটা করিবার কখন কল্পনা পর্য্যন্ত করি নাই, বাধ্য হইয়া মানুষকে সেইটাই করিতে হয়। যেখানে যাইবার জন্য উদ্যোগ আয়োজন করিয়া পথের বাহির হইয়াছি, অলক্ষিত শক্তি আসিয়া সে পথে বাধা দিল, যেখানে যাইবার তিলমাত্র চেষ্টা বা উদ্যোগ নাই, সেইখানে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গেল। মানুষ যখন অলক্ষিত শক্তির মুষ্টির মধ্যে আবদ্ধ, তখন আর মানুষের স্বাধীনতা কোথায়? যাঁহারা বলেন অনেক কার্য্যেই মানুষের স্বাধীনতা আছে, তাঁহারা যদি নিজ নিজ জীবনের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনাগুলি স্থির চিত্তে অনুধাবন করিয়া দেখেন, তবে বুঝিতে পারিবেন কোন কার্য্যেই তাঁহাদের স্বাধীনতা নাই। স্বয়ং ভগবান অনেক স্থলে একথা আমাদিগকে শুনাইয়া ও দেখাইয়া গিয়াছেন। রজনী প্রভাতেই রামচন্দ্র রাজসিংহাসনে বসিবেন, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে বনগমনের

আয়োজন করিতে হইয়াছিল। মানব জীবনে স্বাধীনতা নাই এবং আমরা একটী অলক্ষিত শক্তি দ্বারা চালিত হইতেছি ইহার প্রমাণ ভূরি ভূরি প্রদর্শন করা যাইতে পারে। এই শক্তি যে কি তাহা হয় ত আমরা বুঝিতে পারি না এবং তজ্জন্যই কেহ কর্ম্মফল, কেহ অদৃষ্ট, কেহ দৈব, কেহ বা ভগবৎ ইচ্ছা বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন এ সবই মিথ্যা। মানুষ চেষ্টা বা পুরুষকার দ্বারা সবই করিতে পারে। এই দুইটীর অভাবে বা উপযুক্তভাবে প্রয়োগ করিতে না পারিলে অভীষ্ট লাভ ঘটে না। একথা কতটুকু সত্য তাহা জীবনে অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

জানালার ফাঁক হইতে ষ্টেশনে বড় বড় অক্ষরে Dehradun (ডেরাডুন) লেখা দেখিয়া আমার হৃদয় শিহরিয়া উঠিল! বিপদ কি আর আমাদিগকে ত্যাগ করিবে না? অজানা দেশে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় কোথায় আসিয়া পড়িলাম। ডেরাডুন আমার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব শূন্য সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থান। পুস্তকে দুই একবার ডেরাডুনের কথা পড়িয়াছি, ইহা ব্যতীত ডেরাডুনের সঙ্গে আমার কোনও পরিচয় নাই!

মস্তকে হাত দিয়া ভাবিতে ভাবিতে চারিদিক ফর্সা হইয়া আসিল। গৃহিণী ও শিশু দুইটীর অবস্থা দেখিয়া

কৃতজ্ঞচিত্তে ভগবানকে বার বার প্রণাম করিতে লাগিলাম। এ যাত্রা তিনি সকলকেই জীবনদান করিয়াছেন। সঙ্গীদের কাহারও অবস্থা সঙ্কটজনক বলিয়া বোধ হইল না। তবে বরফের সঙ্গে সকলেই জমাট বাঁধিয়া আছে, কাহারও উত্থান শক্তি নাই। এক জন সাহেব আসিয়া বলিল সার্দ্ধ ছয় ঘটিকার সময় এই গাড়ী লক্ষ্ণৌ যাইবে, সুতরাং আমাদের নামিয়া পড়া কর্ত্তব্য। তাড়াতাড়ি গাড়ির দরজা খুলিয়া দেখিলাম তখনও প্রভাত হইতে বিলম্ব আছে।

আর বিলম্ব করা অকর্ত্তব্য মনে করিয়া সকলকে উঠাইয়া বসাইলাম। মাতুল ফুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। গাড়ির জানালা বন্ধ করিতে গিয়া তাঁহার হাতটী থেঁতলাইয়া গিয়াছে। রজনীযোগে শীতের তাড়নায় তিনি অতিকষ্টে যম-রাজের গৃহ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তাঁহার পিতা-মাতার অল্প পুণ্য হইলে কখনই তিনি প্রত্যাগমন করিতে সক্ষম হইতেন না। বিপদ, দুঃখ, যাতনা ও মৃত্যুর কাছে দাঁড়াইয়াও মাতুলের বাচালতা শক্তি অক্ষুণ্ণ আছে দেখিয়া সত্যই একটু আনন্দ হইল।

কাঁপিতে কাঁপিতে অতি কষ্টে ষ্টেশনে আসিয়া দেখিলাম ষ্টেশন মাষ্টারের অফিস, বুকিং অফিস, লগেজ ও টেলিগ্রাফ অফিসের জানালা দরজা সমস্তই বন্ধ। ভিতরে ধূ ধূ করিয়া

অগ্নি জ্বলিতেছে। সেই আগুনের কাছে বসিয়া কোন ঘরে একজন,কোন ঘরে দুইজন রেলকর্ম্মচারী আপাদ মস্তক গরম বস্ত্রে আবৃত করিয়া কার্য্য করিতেছেন। ষ্টেশনের বাহিরেও চুল্লিতে চুল্লিতে অগ্নি প্রজ্জলিত। একবার অগ্নির কাছে বরফখণ্ডের মত হাত দুইখানা উত্তপ্ত করিতে গমন করিলাম, পরক্ষণে মনে হইল, আমার প্রিয়জনেরা 'গাড়ির মধ্যে মৃতকল্প হইয়া রহিয়াছে, আর আমি স্বার্থপরের ন্যায় এই ক্ষণিক সুখের জন্য লালায়িত হইতেছি। চুল্লির নিকট হইতে সাত হাত দূরে পিছাইয়া আসিলাম।

অনেক চেষ্টার পর দুইজন রেলওয়ে খালাসিকে অত্যধিক পারিশ্রমিক স্বীকার করিয়া আমাদের লগেজগুলি দেখাইয়া দিলাম। তাহারা আমাদের জিনিষ পত্র ওয়েটিংরূমে বহন করিতে লাগিল।

অতিকষ্টে সকলকে লইয়া আসিয়া ওয়েটিংরূমে বসাইলাম। ওয়েটিংরূমে অগ্নির তাপ লইয়া ক্রমে ক্রমে সকলেই একটু সুস্থ হইল।

তখনও পূর্ব্বদিক ফর্সা হয় নাই। কোথায় যাইব, কোথায় থাকিব, হরিদ্বারের গাড়িই বা কখন পাওয়া যাইবে, জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ওয়েটিংরূম হইতে বাহির হইয়া ষ্টেশন মাষ্টারের ঘরের দিকে যাইতেছি, এমন সময়

দেখিলাম একজন সাহেব আমাদেরই অনুসন্ধানে আসিতে-ছেন। মধ্যপথে সাহেবের সঙ্গে আমাব সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাকে দেখিয়াই বলিলেন :—"বাবু টিকিট ?"

তখন আমি অকুলপাথাবে ভাসিতেছি। স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া যে একটা নিরাপদ স্থানে বসাইব, তাহারও বন্দোবস্ত করিতে পারি নাই। তদ্রুপ স্থান এখানে আছে কিনা তাহাও জানা ছিল না। মনে ভাবিলাম এই সাহেবের কাছে একটা নিরাপদ স্থানের সন্ধান লইলে হয় না ?

সাহেব আমাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া কর্কশ কণ্ঠে আবার বলিল :—"বাবু টিকিট ?"

আমি সাহেবের কথায় কোন উত্তর না দিয়া বলিলাম :—

"সাহেব! দয়া করিয়া আমাকে একটা বিশ্রামস্থানের সন্ধান বলিতে পার ? আমার সঙ্গে স্ত্রীলোক ও ছোট ছোট ছেলে আছে, তাহারা শীতে বড়ই কষ্ট পাইতেছে।"

সাহেব আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিল :— "আপনার কাছে কি টিকিট নাই ?"

আমি।—নিশ্চয়ই আছে।

সাহেব।—তবে দেখাইতেছেন না কেন ?

আমি বলিলাম—"আমার কাছে ডেরাডুনের টিকিট নাই,

তবে হরিদ্বারের টিকিট আছে। গ্রহের ফেরে হরিদ্বারে না নামিয়া ডেরাডুনে আসিয়া পড়িয়াছি।”

সাহেব কটা চক্ষু দুটি আমার মুখের উপর ন্যস্ত করিল। সে দৃষ্টি সন্দেহ মাখান। সাহেবের সন্দেহপূর্ণ চক্ষু-দুটি আমার মুখের উপর ন্যস্ত দেখিয়া সত্যই আমার বড় রাগ হইল। তবে কি সাহেব ভাবিতেছে আমরা বিনা টিকিটে আসিয়াছি।

আমি বিরক্তিপূর্ণস্বরে সাহেবকে বলিলাম :—“সাহেব ভুলিয়া যাইও না যে, তুমি একজন ভদ্রলোকের সহিত কথা কহিতেছ।”

সাহেবও বেশ একটু গরম হইয়া উঠিল। হরিদ্বার হইতে ডেরাডুনের অতিরিক্ত ভাড়া দিতে হইবে এই লইয়া তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হইল।

প্রায় দশ মিনিট ধরিয়া বাক্‌যুদ্ধের পর আমি বলিলাম :—“সাহেব রেলকর্ম্মচারিদের স্বভাব আমার ভালরূপই জানা আছে; তোমরা কারণে অকারণে প্যাসেঞ্জারের নিকট হইতে জুলুম করিয়া অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করিয়া থাকে, কিন্তু গাড়ী ছাড়িবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অতিরিক্ত ভাড়ার রসিদের জন্য চীৎকার করিতে হয়। শেষে বাঁশি বাজাইয়া গাড়ি যখন ছাড়িয়া দেয়,

তোমরাও নিশ্চিন্ত হও এবং টাকাগুলিও তোমাদেব পকেটে গিয়া নির্ব্বিঘ্নে আশ্রয় গ্রহণ করে।

কথাটা সাহেবের অন্তরে গিয়া আঘাত করিল। শীতক্লিষ্ট মুখখানি আরক্তিম করিয়া বলিল—"রেলকর্ম্মচারি মাত্র-কেই আপনি চোর বলিতেছেন কেন? এই ভুল ধারণা আপনাব ন্যায় ভদ্রলোকের হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকা উচিত নহে।"

অনেকক্ষণ ধরিয়া সাহেবের সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডা চলিতেছে। এদিকে ওয়েটিংরূমে প্রিয়জনেরা অসহনীয় কষ্ট ভোগ করিতেছে। আর অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে মনে করিয়া সাহেবকে বলিলাম:—"আমার সঙ্গীরা অর্দ্ধমৃত অবস্থায় ওয়েটিংরূমে বসিয়া আছে; আমি আর অপেক্ষা করিতে পারিব না, অতিরিক্ত ভাড়া কত দিতে হইবে বল।" এই বলিয়া হরিদ্বারের টিকিটগুলি ও একখানি নোট সাহে-বের হস্তে অর্পণ করিলাম। সাহেব হিসাব করিয়া ভাড়া লইয়া রসিদ লিখিতে বসিলেন। "রসিদের আর প্রয়ো-জন নাই" বলিয়া আমি চলিয়া আসিলাম।

সাহেব তাড়াতড়ি রসিদ লিখিয়া আমার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিয়া বলিল:—

"এই লিন্ বাবু রসিদ।"

আমি বিরক্তি ও উপহাসের স্বরে বলিলাম—"এতটা কষ্টের কোন প্রয়োজন ছিল না!"

সাহেব বলিল—"আমার এটা কর্ত্তব্য কার্য্য বাবু।"

রসিদটা না দেখিয়াই তাচ্ছিল্যভাবে পকেটে পুরিলাম এবং সাহেবকে আর কোন কথা বলিলাম না।

সাহেব দুইপদ অগ্রসর হইয়া বলিল:—"বাবু আপনি বলিতেছিলেন সঙ্গে স্ত্রীলোক ও ছোট ছেলে আছে, আমাকে কি করিতে হইবে বলুন?"

সাহেবের স্বর সহানুভূতি ও করুণাতে পূর্ণ। আমি বিস্মিত হইয়া কয়েক মুহূর্ত্ত সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

আমাকে মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া সাহেব করুণকণ্ঠে বলিল—"আমার দ্বারা যদি আপনাদের কিছু উপকার হয়, সানন্দে তাহা করিব বাবু! আমারও স্ত্রী পুত্র আছে।"

সাহেবের কথায় সত্যই আমার বড় আনন্দ হইল। আমাদের কষ্টের কাহিনী সাহেবকে সংক্ষেপে শুনাইলাম। সহানুভূতি ও করুণায় সাহেবের চক্ষু দুটি অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসিল।

সাহেব ছুটাছুটি করিয়া আমাদের জন্ত গরম চা প্রস্তুত

করাইল। স্ত্রীলোক ও শিশু দুটিকেও গরম চা পান কবাইবার জন্য বার বার অনুবোধ করিল। শীতের হস্ত হইতে যাহাতে সকলে পরিত্রাণ পায়, তাহাব সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা কবিয়া সুব্যবস্থা কবিয়া দিল। সাহেবের সে দিনকার উপকাব জীবনে বিস্মৃত হইবাব নয়।

সাহেব তাঁহার কামবায় আমাকে ও আমার শিশু পুত্রটিকে লইয়া গিয়া বসিতে অনুবোধ করিল। সাহেবেব সঙ্গে সে দিন অনেক বিষয়ের অনেক কথাই হইল। বুঝিলাম সাহেবের হৃদয় অতি উচ্চ ও অতি মহৎ।

সাহেবের নাম মিঃ এডওয়ার্ড (Mr. Edward)। সাহেব নিজ হস্তে আমাব নোটবুকে তাঁহার নামটি লিখিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাব স্মৃতিচিহ্ন রূপেই আমি ইহা লিখাইয়া লইয়াছিলাম। মিঃ এডওয়ার্ডের সহৃদয়তা, ভদ্রতা ও অমায়িকতা ইহজীবনে ভুলিবাব নয়।

মিঃ এডওয়ার্ড বলিলেন "বাবু আমি তেরবৎসর কাল একাধিক্রমে এই ষ্টেশনে আছি। অন্যান্য ষ্টেশনেও প্রায় পাঁচ বৎসর কার্য্য করিয়াছি। এখানে ষ্টেশনমাষ্টারের সহকারী-রূপে আমাকে সকল কার্য্যই করিতে হয়। আমার দুইটি সন্তান। বড় ছেলেটির বয়স তেরবৎসর। এই ডেরাডুনেই তাহার জন্মস্থান। যে বৎসর বদলি হইয়া এখানে আসি,

সেই বৎসরই বড় ছেলেটি ভূমিষ্ঠ হয়। সে ছেলেটি আমার অতি প্রিয়। সেটি এখন মুসৌরিতে আছে, এবং তথায় লেখাপড়া করিতেছে। আমার স্ত্রী ও ছোট ছেলেটি এইখানেই আছে। আমি যাহা বেতন পাই, তাহাতে কষ্টে স্বষ্টে সংসার 'চালাইতে হয়। যদিও আমাদের সাংসারিক অসচ্ছলতা আছে—তবুও আমার স্ত্রী কোন দিন দুঃখিত হন না। তবে ছেলেটির পড়ার খরচ যোগাইতে এখন আমাদের পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু কষ্ট হইতেছে।"

"রেল কর্ম্মচারিরা চোর এ অপবাদ সর্ব্বত্রই আছে। কিন্তু বাবু! আমি যতদিন রেলে ঢুকিয়াছি, ইহার মধ্যে এক পয়সাও কখন ঘুষ লই নাই, অথবা কোম্পানীর চুরি করি নাই। তাহা যদি করিতাম, আজ আমি বড়লোক হইতে পারিতাম, এবং কোম্পানীর কাগজের সুদে আমাদের সংসার চলিত। আজ ছেলেটির পড়িবার খরচের জন্য আমাকে আকাশ পাতাল ভাবিতে হইত না। কিন্তু এই অভাব দুঃখের মধ্যেও আমরা স্ত্রীপুরুষে বেশ সুখে আছি! জগতে আসিয়া প্রলোভনের বশে অসদ্ উপায়ে অর্জ্জিত অর্থ যে আমাদের গৃহে প্রবেশ করে না, ইহাতেই আমরা বেশ শান্তি উপভোগ করি। যে কোম্পানীর কার্য্যে আমি নিযুক্ত, তাহার কর্ত্তব্যটুকু ষোলআনা বজায় রাখিবার জন্য সর্ব্বক্ষণই চেষ্টা করি। জীবনটা এই

ভাবে কাটিয়া গেলেও ভগবানকে ধন্যবাদ দিব। জীবনে পুণ্যও কিছু করিতে পারি নাই, তবে পাপ কার্য্যগুলা করিতে না হয় এই কথাটাই মনে সর্ব্বদা জাগাইয়া রাখিয়াছি।”

মিঃ এডওয়ার্ডের সহিত কথা কহিতে কহিতে হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠিল। স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, রেল-কর্ম্মচারিদের মধ্যে এমন সাধু সজ্জন ব্যক্তি থাকিতে পারে ইহা পূর্ব্বে কখনও মনে করি নাই। ধন্য মিঃ এডওয়ার্ড। তোমার সহিত আলাপ করিয়া আজ হৃদয় পবিত্র হইল।

কথা কহিতে কহিতে এডওয়ার্ড চমকাইয়া উঠিয়া ঘড়ি দেখিল সাতটা বাজিয়া কুড়ি মিনিট হইয়াছে। আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—“সাতটা পঁচিশ মিনিটে হরিদ্বারের গাড়ি ছাড়িবে। আর পাঁচ মিনিট মাত্র সময় আছে। আজ আপনাদের হরিদ্বারে যাওয়াই সুবিধা। ফিরিবার সময় ডেরাডুন ও মুসৌরি দেখিয়া যাইবেন। আমি আপনাদের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া রাখিব।”

সাহেবের ঈঙ্গিত মাত্র খালাসীরা আমাদের জিনিষ পত্র গাড়িতে তুলিয়া দিল। বারবার জেদ করিয়াও খালাসিদিগকে পুরস্কার গ্রহণ করাইতে পারিলাম না। আমি অন্তরের সহিত সাহেবকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া ও কৃতজ্ঞতা জানাইয়া হরিদ্বারের পথে যাত্রা করিলাম। আজও সাহেবের সেই

সৌম্য মূর্ত্তিখানি ভুলিতে পারি নাই। সাহেব কোম্পানীর কর্ত্তব্য কার্য্যে অতি কঠোর, কিন্তু সততা ও ন্যায়পরতায় সে হৃদয় অতীব কমনীয়। মিঃ এডওয়ার্ড সত্যই মনুষ্য নামের যোগ্য। জানি না ইংরাজজাতির মধ্যে এরূপ এডওয়ার্ড কয়জন আছেন। প্রলোভনহীন হইয়া স্বেচ্ছায় অভাব ও দারিদ্রতাকে আলিঙ্গন করিয়া শান্তিভোগ করিতে পারে, এরূপ মানুষ জগতে কয়জন আছেন জানি না! যদি থাকেন যথার্থই তাঁহারা মানব নামের সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রাতে ৭টা ২৫ মিনিটের সময় গাড়ী ছাড়িল। আমরা ডেরাডুন হইতে হরিদ্বারের পথে যাত্রা করিলাম। চারি-দিকে পাহাড়ের দৃশ্য অতি সুন্দর; এরূপ সুদৃশ্য পর্ব্বতমালা জীবনে আর কথনও দেখি নাই। গাড়ী হইতে মুসৌরির পাহাড় ও বাঙ্গালাগুলি দেখা যাইতে লাগিল। প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোহর। আনন্দে হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। গত রজনীর প্রাণঘাতী দুঃসহ যন্ত্রণার কথা ভুলিয়া গেলাম। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ডেরাডুনের পাহাড়গুলিকে

অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া প্রাণ গলিয়া গেল। সত্যই আমরা আত্মহারা হইয়া পড়িলাম। সূর্য্যোদয়ে ডেরাডুনকে এই প্রথম দেখিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনই ডেরাডুনকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইতেছে; মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম যতই অসুবিধা ঘটুক, হরিদ্বার হইতে ফিরিবার সময় ডেরাডুন না দেখিয়া গৃহে ফিরিব না।

ডেবাডুনের পাহাড়ে সূর্য্যোদয়ের যে শোভা দেখিলাম, তাহা জীবনে কখন বিস্মৃত হইতে পারিব না। সূর্য্য ধীরে ধীরে যতই উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল, পাহাড়ের উপর কে যেন হীরকখণ্ড বিছাইয়া যাইতে লাগিল। চারিদিকে উঁচু নীঁচু অগণিত পাগাড়,পাহাড়ের উপর শ্বেতবর্ণের ধপধপে বাঙ্গালা, সূর্য্যের আভায় সে গুলি নানা রঙ্গে চিত্রিত বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

আমরা যতই হরিদ্বারের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, পর্ব্বতমালায় আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া ফেলিতে লাগিল। রেলপথের দুইপার্শ্বেই পাহাড়; পাহাড়ের কোন কোন স্থান উঁচু, কোন স্থান নীঁচু। সমতল ক্ষেত্র দৃষ্টিপথে পতিত হইল না। গাড়ী যতই ছুটিতেছে, দুইদিকের পাহাড়গুলিও শ্বেতবর্ণের অগণিত বাঙ্গালাগুলি মাথায় করিয়া দুইদিকে সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া চলিয়াছে, পাহাড়ের বিরাম নাই। মাঝে

মাঝে কোন কোন পাহাড়গুলির উপর গাছপালা নাই, যেন মরুভূমির মত ধূ ধূ করিতেছে।

বহুক্ষণ গাড়ী পবনবেগে ছুটিবার পর (Harawala) হারাওয়ালা ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই ষ্টেশনটি পাহাড়ের নিম্নে অবস্থিত এবং দেখিতে বড়ই নয়নাভিরাম, শ্যামল অরণ্যবাজি বেষ্টিত হইয়া ষ্টেশনটি তাপসালয়ের মত দেখাইতেছিল।

এই ষ্টেশন পার হইয়া দুই মাইল যাইবার পর ঘন নিবীড় বনশ্রেণী দৃষ্টিগোচর হইল। এখানকার শ্যামল বনবাজি বেষ্টিত পাহাড়গুলি হইতে নয়ন ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না; মনে হইতে লাগিল প্রকৃতি মাতার এই পবিত্র রূপ অহরহঃ প্রাণ ভরিয়া দেখি। সে রূপের শোভা চক্ষে না দেখিলে ভাষায় বুঝাইতে পারা যায় না। আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর পাহাড়ের ক্রোড়ে শ্যামল শস্যক্ষেত্র দেখিতে পাইলাম। মটর ভুট্টা প্রভৃতি সবুজবর্ণের শস্য ক্ষেত্রের উপর শিশিব বিন্দু কে যেন মুক্তার মালার ন্যায় পরাইয়া দিয়াছে। এই মুক্তার মালার উপর রৌদ্রের আভা পড়িয়া শ্যামল শস্যক্ষেত্রগুলি অপরূপ সাজে সাজিয়াছে। এ সাজের উপমা বিরল। নির্জ্জন পাহাড়ের কোলে শ্যামল শস্যক্ষেত্র, চারা চারা গাছগুলির শীর্ষদেশে মুক্তার মালা দুলিতেছে, তদুপরি রৌদ্রের আভা

পড়িয়া ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে ; সেই শিশিরস্নাতা অরণ্যানী যেন এই পৃথিবী হইতে বিভিন্ন।

এইবার আমাদের গাড়ী পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। শ্যামল শস্যক্ষেত্রের শোভা দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে আমাদের গাড়ী পাহাড়ের কোল দিয়া ছুটিতে লাগিল। ক্রমে নিকটে, অতি নিকটে আসিয়া গাড়ী একবারে পাহাড়ের গা ঘেঁসিয়া ছুটিতে লাগিল, সেই সময় আমার এতই আনন্দ হইল যে, আমি বালকের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিলাম।

এই পাহাড়ের কোলে কতরকম পার্ব্বত্য জাতি দৃষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল। এই পাহাড়েই ইহাদের বাসভূমি, পর্ব্বতারণ্যই ইহাদের জন্মস্থান। উচ্চ পাহাড়ের গা বহিয়া কাষ্ঠবিড়ালের ন্যায় দ্রুতপদে ইহারা অগ্রসর হইতেছে। আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলাম পৃষ্ঠে বড় বড় মোট বাঁধিয়া স্তূপাকার কাষ্ঠের বোঝা পৃষ্ঠে চাপাইয়া অসমসাহসিক ভাবে পাহাড়ের গা বহিয়া চলিয়াছে ; দেখিলে ত্রাসে বক্ষের রক্ত শুষ্ক হইয়া যায়। একবার পদস্খলন হইলেই পর্ব্বতনিম্নে পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।

ইহারা কোন্ জাতি দূর হইতে ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। কতকটা ঠিক নাগা বা মিকির জাতির মত। গাড়ী

হু হু শব্দে ছুটিতেছে, দুইদিকের পর্ব্বতমালাও গাড়ীর সঙ্গে হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। এইবার ছুটিতে ছুটিতে পাহাড়গুলি একটু দূরে পিছাইয়া পড়িল। মাঝে মাঝে শ্যামল শস্যক্ষেত্র দেখা দিল, আবার শস্যক্ষেত্র লুকাইয়া পড়িল। পাহাড়গুলি রেল লাইনের নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। এইবার আমরা পর্ব্বতমালার ভিতর দিয়া (Doiwala)ডইয়লা ষ্টেশনে আসিয়া উপনীত হইলাম।এই ষ্টেশনটি দুইদিকে পাহাড়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত, এই ক্ষুদ্র ষ্টেশনটি ব্যতীত এইস্থানে জনমানবের চিহ্ন নাই। এই ষ্টেশন হইতে প্রায় তিন মাইল অগ্রসর হইয়া একটি সুন্দর দৃশ্য দেখিলাম। পাহাড় হইতে ঝরণা নামিয়া আসিয়াছে, সেই ঝরণাকে বাঁধিয়া ক্ষেত্রের উপর দিয়া টানিয়া আনিয়াছে। দূরে, বহুদূর পর্য্যন্ত কে যেন চাঁদি রূপার পাত বিছাইয়া দিয়া গিয়াছে, গাড়ীর ভিতর হইতে ঝরণার এই সুন্দর দৃশ্যটি বড়ই নয়নাভিরাম। শুনিলাম এই ঝরণার জল অতি উপাদেয় ও স্বাস্থ্যকর। ডিস্‌পেপসিয়া, অম্ল, অজীর্ণাদি ব্যাধি এই ঝরণার জলের ত্রিসীমানায় কখন আসিতে পারে না।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর দেখিলাম স্তূপীকৃত নুড়ি পাথর পড়িয়া আছে। মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া

প্রাণ মোহিত হইয়া গেল। বেলা প্রায় ৯টার সময় আমরা কানশ্রাও (Kansrao) ষ্টেশনে আসিলাম। সব ষ্টেশনগুলিই ক্ষুদ্র, কোন ষ্টেশনেই দুইখানির অধিক ঘর ও দুই জনের বেশী রেলকর্ম্মচারী দেখিলাম না। এই সব ষ্টেশনের উপব দিয়া গত রজনীতে গিয়াছি, কেবল ইঞ্জিনের শব্দ ব্যতীত কোন শব্দই পাই নাই। রজনী প্রভাতে এখন আগুন ছাড়িয়া দুই একজন ঘরের বাহিরে আসিয়াছেন।

এই ষ্টেশন পার হইয়া দেখিলাম, অগণিত উটের পাল পৃষ্ঠদেশে বোঝা লইয়া সারি গাঁথিয়া চলিয়াছে। একত্রে এত উট্ আর কখন কোথাও দেখি নাই, সকলেই চমকিত নয়নে উটের পালেব দিকে চাহিয়া রহিল। গাড়ী একটা শিমুল বনের মধ্যে আসিয়া পড়িল। ক্রোশের পর ক্রোশ কেবলই দীর্ঘাকার শিমুল গাছের বন।

ক্রমশঃ আমরা হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিলাম। আনন্দে হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। হরিদ্বারের যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, হৃদয়মনবিমুগ্ধকারী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ততই মোহিত হইতে লাগিলাম! দেখিলাম পাহাড়ের কোল হইতে লম্বা লম্বা বৃক্ষ শ্রেণী আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। এরূপ বৃক্ষপ্রাচীর বেষ্টিত সুন্দর অরণ্য জীবনে কখন দেখি নাই সুতরাং বড়ই আনন্দ হইতে লাগিল। কত

রকমের বৃক্ষ, লতা, ফল, ফুল, কত রকমের বিহগ বিহগী জীব, জন্তু, হরিণ ও ময়ূরগুলি ছুটিয়া খেলা করিয়া বেড়াইতেছে; মনে হইতে লাগিল ছুটিয়া গিয়া কচি কচি মৃগশাবকগুলিকে বুকে করিয়া তুলিয়া আনি, আবার অরণ্যে ছাড়িয়া দিয়া তাহাদের সহিত ছুটিয়া ছুটিয়া খেলা করি। ময়ূরগুলি নৃত্য করিতেছে, কখন বা কেকারবে বনস্থলী কম্পিত করিয়া তুলিতেছে। লাল, সবুজ পাখিগুলি গান গাহিয়া মনের আনন্দে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উড়িয়া বসিতেছে; যে দিক দেখি সেই দিক্‌ই সুন্দর, যাহার পানে চাহি সেই আমার চক্ষে নূতন ও মনোরম; চতুর্দ্দিকেই প্রকৃতি দেবী নানা সাজে সজ্জিত হইয়া বসিয়া আছেন। ভগবানকে কৃতজ্ঞ অন্তরে বার বার প্রণাম করিয়া বলিলাম:—ভগবান; আরও দুইটী চক্ষু দাও, তোমার বিশ্বের অপরূপ রূপ সম্ভার প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লই।

বিশ্বের অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে গাড়ী অন্ধকারময় পাহাড়ের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভয়ে আমাদের সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। কুলমহিলারা চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কি জমাট অন্ধকার! গাড়ীর মধ্যে কেহ কাহাকেও আমরা দেখিতে পাইলাম না। পাহাড় কাটিয়া পাহাড়ের মধ্যদেশ দিয়া রেল চলিয়াছে। সহস্র অমাবস্যার

নীবিড় অন্ধকার এই পাহাড়ের মধ্যে যেন জমাট বাঁধিয়া বসিয়া আছে। বহুদূর এই অন্ধকারের মধ্য দিয়া রেল ছুটিল। একবার নয়, দুইবার এইরূপ পাহাড়ের মধ্যে সহস্র অমাবস্যা রজনীর জমাট অন্ধকার ভেদ করিয়া গাড়ি ছুটিয়া গেল। বহুক্ষণ পরে অন্ধকার হইতে আলোকে অসিয়া আমরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

আবার আমরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে হরিদ্বার ষ্টেশনাভিমুখে আসিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই গাড়ির গতি মন্দীভূত হইয়া আসিল। গাড়ি থামিবার পূর্ব্বেই উচ্চকণ্ঠে ধ্বনিত হইতে লাগিল "হরিদ্বার।"

আমরা গাড়ি হইতে হরিদ্বার ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম। বহুদিনের আশা ফলবতী হওয়ায় আনন্দে হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। পূর্ব্বদিনের সমস্ত কষ্ট, অসহনীয় যাতনা আমরা বিস্মৃত হইলাম। এতক্ষণ পরে গৃহিনীর মুখে হাসি দেখা দিল। আমরা দুইখানি গাড়ি ভাড়া করিয়া হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ডাভিমুখে চলিলাম।

কয়েক দল পাণ্ডা আসিয়া সকলেই আমাদের উপর অধিকার সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আমরা কুম্ভকরণ পাণ্ডাকে বাছিয়া লইয়া ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে তাহার ত্রিতল বাটিতে গিয়া উঠিলাম।

আহা কি সুন্দর দৃশ্য! কলকলনাদিনী জাহ্নবীর অপরূপ শোভা দেখিয়া আমরা ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া গেলাম। মা জাহ্নবীর এমন রূপ জীবনে আর কখন দেখি নাই। আজ হৃদয় মন পবিত্র ও ধন্য হইল। ত্রিতলের ছাদ হইতে বহুক্ষণ ধরিয়া নির্নিমেষ নয়নে গঙ্গার শোভা দেখিয়া বাসার বাহির হইয়া পড়িলাম।

একা ঘুরিতে ঘুরিতে একবারে ভৈরব ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ভৈরবঘাটের উপর একটী নেংটা সাধু বসিয়া আছেন। তিন চারিজন সাধু ভৈরব ঘাটে স্নান করিতেছেন। পতিতপাবনী জাহ্নবী কলকল শব্দে বাহিয়া যাইতেছেন। এরূপ কাকচক্ষুর ন্যায় জল জীবনে কখন দেখি নাই। জাহ্নবীর রূপের ছটা দেখিয়া প্রাণ পুলকিত ও জীবন ধন্য হইল। কলকলশব্দে মা যেন সত্য,ত্রেতা ও দ্বাপরের কত কথাই শুনাইয়া যাইতেছেন। গঙ্গার পরপারে অরণ্য, তাহার পরেই সু-উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী। ভৈরবঘাটের পরপারে এক পর্ব্বতের উপর দুইটি মন্দির। একটি মহাদেবের অন্যটি চণ্ডিকার। এমন প্রাকৃতিক দৃশ্য, গঙ্গার পরপারে এমন মনোলোভা শোভা আর কোথাও কখন দেখি নাই। ভগবানের এই চিরসুন্দর দেশে আসিয়া পুলকিত অন্তরে বার বার তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। স্বচ্ছ ফিল্টার ওয়াটার দেখিয়াছি, কিন্তু

হরিদ্বারের গঙ্গার জলের ফিল্টার ওয়াটারের সহিত তুলনা হয় না।

ভৈরব ঘাটে কতক্ষণ বিভোর হইয়া বসিয়াছিলাম মনে নাই। যখন বাসায় সঙ্গীদের কথা মনে হইল, তখন আমার চমক ভাঙ্গিল। দেখিলাম দিবা অবসান হইয়া আসিয়াছে। পথ চিনিতে না পারায় অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া অপরাহ্ন সময়ে বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মাতুলের উদ্যোগে সকলেরই আহারাদি শেষ হইয়া গিয়াছে, কেবল গৃহিণী অভুক্তা রহিয়াছেন। অপরাহ্নে আহারাদি করিয়া দেহটা আর বাসার বাহির হইতে চাহিল না, নিষেধ না শুনিয়া শয্যায় ঢলিয়া পড়িল। হরিদ্বারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কথা ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম।

মাঘের শেষে হরিদ্বারের শীতের কথাটা বলা হয় নাই। সন্ধ্যাগমনের পূর্ব্ব হইতেই আমাদের বাসার মধ্যে কে যেন রাশি রাশি বরফ ঢালিয়া দিতে লাগিল। কম্পিত হস্তে,—অসাড় দেহে তখন আবার শুষ্ক কাষ্ঠ রাশি সজ্জিত করিয়া পৃথক পৃথক তিনটি অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলাম। পূর্ব্বদিন রাত্রে কাহারও নিদ্রা হয় নাই, সুতরাং প্রচণ্ড শীতের আক্রমণ স্বত্বেও নিদ্রাদেবীর করুণা হইতে আমরা বঞ্চিত হইলাম না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

১৩২০ সালের ২০শে মাঘ সোমবারের প্রভাত। জীবনে অনেক বৎসরের অনেক মাসের অনেক রজনী অবসানের অনেক প্রভাত দেখিয়াছি—জীবনে এই প্রভাত বহুবার সু ও কুরূপে আমার নয়ন সমক্ষে প্রতিভাত হইয়াছে। কোন প্রভাতে শোকের তীব্র দাহনে দগ্ধ হইয়া চীৎকার করিয়াছি,—কোনও প্রভাত হৃদয়ের কোমল অংশে শেলাঘাত করিয়াছে,—কোন প্রভাতে আনন্দে আত্মহারা হইয়া হাঁসিয়াছি, কোনও প্রভাতে আত্মীয়জন বিরহে বক্ষে করাঘাত করিয়া কাঁদিয়াছি—আবার কত প্রভাতে সাধুজন দর্শনে হৃদয় পুলকিত হইয়াছে—মন পবিত্র হইয়াছে। কিন্তু এমন সুপ্রভাত কোন কালে কোন দিন আমার অদৃষ্টে দর্শন লাভ ঘটে নাই। অনেক প্রভাতে হাঁসিয়াছি কাঁদিয়াছি বটে, কিন্তু আজিকার মত কোনও প্রভাতে হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হাঁসিয়া উঠে নাই।

প্রভাতে নিদ্রা ভঙ্গ হইবামাত্র হরিদ্বারের পবিত্র ব্রহ্মকুণ্ড দৃষ্টিগোচর হইল। প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া চক্ষু মেলিবামাত্র এমন স্বর্গের ছায়া কোন দিন আমার কলুষিত দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। চক্ষু জুড়াইয়া গেল, শরীর পবিত্র হইল।

জাহ্নবীর পবিত্র স্বচ্ছবারি কল কল রবে বহিয়া যাইতেছে,সে অপরূপ রূপচ্ছটা বর্ণনা করিবার সাধ্য নাই। ভীষণ কন্‌কনে শীত, লেপ পরিত্যাগ করিয়া শয্যা হইতে উঠিতে ইচ্ছা করে না। যাহা হউক অতি কষ্টে শয্যা ত্যাগ করিয়া উন্মুক্তছাদে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দাঁড়াইবামাত্র বরফে সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হইয়া গেল। কিন্তু যাহা কখন দেখি নাই, দেখিলেও যাহা বিশ্বাস করা যায় না, তাহাই আজ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। সেই প্রচণ্ড শীতে বরফপূর্ণ ব্রহ্মকুণ্ডে অগণিত সাধু সন্ন্যাসী স্নান করিতেছেন। তখনও সূর্য্যোদয় হইতে অনেক বিলম্ব আছে, কিন্তু ইতিমধ্যেই সহস্র সহস্র সাধুর স্নানকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। যাঁহারা ভগবৎভক্ত তাঁহাদের যে কি অসাধারণ বল তাহা আজ স্বচক্ষে দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম। দেখিতে দেখিতে সাধু সন্ন্যাসীগণের স্তোত্রগানে জাহ্নবা তীর মুখরিত হইয়া উঠিল। ওঁকার ধ্বনি ও বেদগানে হরিদ্বারকে আজ ভূস্বর্গ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। স্বর্গ কি ও কেমন তাহা জানি না, স্বর্গের দৃশ্য কেবল কল্পনার চক্ষেই- নিদ্রাঘোরে স্বপ্নের মত কখন কখন দেখিয়া পুলকে রোমাঞ্চিত হই। কিন্তু এমন জীবন্ত স্বর্গের দৃশ্য যে দেখিতে পাইব, কোন দিন কল্পনাও করি নাই।

ক্রমে পূর্ব্বদিক লোহিতাভায় ধীরে ধীরে রঞ্জিত হইতে লাগিল, দলে দলে ভক্তপ্রাণ নরনারীগণ ব্রহ্মমুহূর্ত্তে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানার্থে আগমন করিতে লাগিলেন। তখন সাধু সন্ন্যাসীদের স্নান কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহারা কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন, আর তাঁহাদিগকে দেখা যায় না। বোধ হয় এতক্ষণ তাঁহারা নির্জ্জন পর্ব্বতগুহায় স্ব স্ব আশ্রমে উপনীত হইয়াছেন। অসংখ্য ভক্তপ্রাণ নরনারী,—অগণিত যাত্রীদল স্নানার্থে ব্রহ্মকুণ্ডে অবতরণ করিতেছে। ব্রহ্মকুণ্ডতীরে ভিক্ষুক সন্ন্যাসীগণ দলে দলে যাত্রীদের নিকট কিঞ্চিৎ প্রাপ্তির আশায় বিচরণ করিতেছে। দেবালয়ে দেবালয়ে আরতির শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি, ধূপ ধুনা গুগগুলের কমনীয় গন্ধে জাহ্নবী তীর স্বর্গের বার্ত্তা আনিয়া দিতেছে। সে কি অপরূপ দৃশ্য! তাই বলিতেছিলাম এমন সুপ্রভাত জীবনে আর কোন দিন ঘটে নাই।

আমি আর ছাদে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না। ত্রিতলের ছাদ হইতে ছুটিয়া আসিয়া কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই ব্রহ্মকুণ্ডের বাঁধা ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম ব্রহ্মকুণ্ডের বাঁধাঘাটে শত শত শুভ্র কেশ বৃদ্ধ বসিয়া স্নানান্তে জগৎ জননী জাহ্নবীর স্তব ও স্তোত্র পাঠ করিতেছেন। সাধু সন্ন্যাসীদিগকে এখন আর জাহ্নবী তীরে দেখিতে

পাইলাম না। এখন কেবল তীর্থযাত্রীদের স্নানের কোলাহল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লোহিত বর্ণের রোহিত মৎস্য ব্রহ্মকুণ্ডে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সে দৃশ্য যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই মোহিত ও স্তম্ভিত হইয়াছেন। মাছগুলি মানুষের হাত হইতে খাবার খাইতেছে, তীর্থ-যাত্রীরা কেহ আমোদেব জন্য—কেহ পুণ্যের আশায় খাদ্য সামগ্রী আনিয়া মৎস্যগুলিকে খাওয়াইতেছে। বৃহদাকার মৎস্যগুলি মানু-ষেব হস্ত হইতে আনন্দের সহিত খাদ্য গ্রহণ করিতেছে। সে কি অপরূপ দৃশ্য! যাহারা খাদ্য পাইতেছে না, তাহারা বিষাদ অন্তরে মানুষের মুখের পানে চাহিয়া খাদ্য প্রার্থনা করিতেছে। মৎস্যগুলির ভয় নাই, প্রাণের আশঙ্কা নাই, মানু-ষেব কাছে কাছে সর্ব্বক্ষণ স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতেছে। উহাদের এই স্বাধীন ভাব দেখিয়া হৃদয় পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠিল। ব্রহ্মকুণ্ডের বৃহদাকার লোহিত বর্ণের রোহিৎ মৎস্যগুলি বুঝি বুঝিতে পারে যে, তাহাদের হিংসা করিবাব কাহারও অধিকার নাই। তাহারা মুক্ত ও স্বাধীন জীব। মৎস্যকুলের এই স্বাধীন বিচরণ হরিদ্বারে প্রথম দেখিলাম। জাহ্নবীর চারিদিকেই এইরূপ মৎস্যকুল ভাসিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু ব্রহ্মকুণ্ডে খাদ্যলোভে দলবদ্ধ হইয়া অগণিত মৎস্য ভাসিয়া বেড়াইতেছে। যাত্রীদের গায়ে ধাক্কা মারিয়া, আশে

পাশে ঘুরিয়া কেবল খাদ্য চাহিতেছে। তাহাদের মুখভঙ্গি দেখিয়া সত্যই বোধ হয় যেন তাহারা বলিতেছে "হে তীর্থ-যাত্রীগণ তোমবা পুণ্য কবিতে আসিয়াছ, আমাদিগকেও আহার দিয়া পুণ্য সঞ্চয় কর।" এখানে জীবহিংসা নাই বলিয়া জীবেব এই প্রকাব স্বাধীন ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। মাছগুলিও পুণ্যস্থান হরিদ্বার ত্যাগ করিয়া কোথাও যাইতে চাহে না। বুঝিলাম মাছগুলি ব্রহ্মকুণ্ড পুরুষ পরম্পবায় ভোগ দখল করিয়া আসিতেছে। স্ত্রালোকেবা স্নান করিতেছে, বড় বড় রুইমাছ ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাদের মাথায় চাপিয়া বসিতেছে। প্রাতে ব্রহ্মকুণ্ডেব এই অপরূপ দৃশ্য, মৎস্যেব লীলা দেখিয়া প্রাণ মোহিত হইল। ব্রহ্মকুণ্ডেব মাছগুলি যেন মানুষের মত যাত্রীদের সঙ্গী। যাত্রীগণ স্নান করিতে লাগিল, বড় বড় মাছগুলি তাহাদেব কাছে আসিয়া ঘুরিতে লাগিল। "খাবাব দাও" "খাবার দাও" রবে তাহাদের নিকট ছুটিয়া আসিতে লাগিল। হয় ত খাবার পাইল না, বিষন্ন মনে অপবের কাছে গেল। আবার আসিল, আবার গেল, খাবার পাইল, কৃতজ্ঞতা জানাইয়া মানুষের চারি ধারে ঘুরিতে লাগিল। প্রভাতে আমার মনে হইতে লাগিল, সমস্ত দিন বসিয়া মাছের এই অপূর্ব্ব খেলা দেখিয়া

নয়ন মন তৃপ্তি করি। যতই দেখি মাছের নব নব ক্রীড়া নব নব ভাব দেখিবার ইচ্ছা আরো বলবতী হয়।

চারিদিকে গগনভেদী রবে কাঁসর ও শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, উচ্চ হইতে উচ্চতর রবে প্রাণ মন নাচিয়া উঠিল! গঙ্গার ধারে ধারে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। দেখিলাম প্রতি দেবালয়ে দ্বিতীয় আরতি আরম্ভ হইয়াছে। হিন্দুর চক্ষে সে দৃশ্য যে কি অনুপম, হিন্দুর প্রাণে সে দৃশ্যে যে কি স্বর্গীয় ভাব আনিয়া দেয়, ভাষায় তাহা কিরূপে বুঝাইব? মনে হইতে লাগিল কি ছার সংসার! সংসারের বাহিরে যে কি সুখ, সংসারের গণ্ডী ডিঙ্গাইয়া বাহির হইতে পারিলে যে কি আনন্দ লাভ করিতে পারা যায়—যাঁহারা একবার বাহির হইয়াছেন, তাঁহারা ব্যতীত অন্যে তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। বেলা সাড়ে নয় ঘটিকার সময় আমরা দুইখানি গাড়ি ভাড়া করিয়া হরিদ্বারে অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান দেখিবার জন্য যাত্রা করিলাম। সুন্দর লাল পণ্ডিতজী আমাদিগকে সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থান দেখাইবার জন্য উপস্থিত হইলেন। পণ্ডিতজী জ্ঞানে পণ্ডিত, কি উপাধিতে পণ্ডিত, কিম্বা তাঁহার পিতা পিতামহ পণ্ডিত লোক ছিলেন সেই খেতাব তিনি আজ পর্য্যন্ত ভোগ দখল করিয়া আসিতেছেন,

পণ্ডিতজীর বাহ্যিক চেহারায় তাহা বুঝিবার কোন উপায় নাই।

লোকটির বয়ঃক্রম ৭০ বৎসর অতীত হইয়াছে, কিন্তু যৌবনের স্বাস্থ্য বল এখনও নষ্ট হয় নাই। পণ্ডিতজী খর্ব্ব-কায়, মস্তকের কেশগুলি শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে। এক গাছি যষ্ঠি অহরহঃ পণ্ডিতজীর হস্তে বিদ্যমান, লাঠিটির অগ্র-পশ্চাৎ রৌপ্যমণ্ডিত। পণ্ডিতজীর বেশভূষা বাঙ্গালি ধরণের। মস্তকে সুদীর্ঘ পাগ্‌ড়ি না থাকিলে পণ্ডিতজীকে বাঙ্গালী বলিয়াই ভ্রম হয়। সুন্দর লালের সঙ্গে আমার হরিদ্বারের ষ্টেশনে পারচয় হইয়াছিল। সেই পরিচয়েই ইনি আজ আমাদের সঙ্গী হইলেন। সুন্দর লাল পণ্ডিতজী উপস্থিত হইয়াই আরম্ভ করিলেন :—

হরিদ্বারে কোশাবর্ত্তে
বিল্বকে নীল পর্ব্বতে
স্নানতোয়া কঙ্খলে তীর্থে
পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।

"বাবু। স্নান না করিলে পুনর্জন্ম খণ্ডন হইবে না।" পণ্ডিতজীর উপদেশামৃত পান করিয়া বুঝিলাম সুন্দর লাল পণ্ডিত লোক।

সুন্দর লাল আবার বলিতে আরম্ভ করিল "বাবু

কঙ্খল কে এখানের পণ্ডিত লোক "কইখাল" বলে, অর্থাৎ এখানে স্নান করিলে পাপ থাকে না।"

দিবা দশ ঘটিকা উত্তীর্ণ হইতে যায় দেখিয়া আমি সুন্দর-লালকে বলিলাম "পণ্ডিতজী গাড়ীতে কথাবার্ত্তা হইবে, বিলম্ব করিলে ফিরিতে অপরাহ্ন হইয়া যাইবে।"

পণ্ডিতজী অনিচ্ছা স্বত্বেও গাড়িতে উঠিল। তাঁহার সাধা গলায় শ্লোক উচ্চারণ করিবার বলবতী ইচ্ছা অতি কষ্টে চাপিয়া রাখিলেন। আমরা হরিদ্বারের রাজঘাট অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

পণ্ডিতজী গাড়িতে উঠিয়া আবার শাস্ত্র ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। অনর্গল উচ্চারণে বাধা দিয়া আমি পণ্ডিতজীর ঘরের কথা সংসারের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। পণ্ডিতজী সজোরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "বাবু। আমার সংসারে স্ত্রী ব্যতীত আর কেহ নাই। শেষ জীবনে গঙ্গামায়ী যদি চরণে একটু স্থান দেন, সেই ভরসায় অহঃরহ তাঁহারই নাম জপমালা করিয়াছি।"

বৃদ্ধ পণ্ডিতজীর কণ্ঠ রুদ্ধ ও চক্ষু অশ্রু ভারাক্রান্ত হইয়া আসিল। কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম সুন্দর লাল পণ্ডি-তের বহুদর্শিতা আমাপেক্ষা শতগুণ অধিক। লোকটি সংসারের অনেক ঘাত প্রতিঘাত সহিয়াছে, ঠেকিয়া শিখিয়া

অনেক জ্ঞানলাভ করিয়াছে। লোকটি পরোপকারী, মিষ্টভাষী, কেবল পাণ্ডিত্যের অভিমান টুকু এই সত্তর বৎসরের পরেও সুন্দর লাল ত্যাগ করিতে পারে নাই। আমি সুন্দর লালকে জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনার সন্তান সন্ততি নাই, এই বৃদ্ধ বয়সে আপনার আর অর্থের প্রয়োজন কি? এখন গঙ্গাতীরে বসিয়া ভগবানের নাম গান করুন না।"

সুন্দর লাল অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে বলিল "বাবু, আসক্তি ছাড়িতে পারি কৈ? চিরদিন যাহা করিয়া আসিয়াছি, এই বৃদ্ধ বয়সেও তাহা না করিয়া থাকিতে পারি না।"

কথাবার্ত্তায় বুঝিতে পারিলাম সুন্দর লাল ধাম্মিক লোক। তাহার উপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশই দীনসেবায় ব্যয়িত হয়। অল্পদিন হইল সুন্দর লাল হরিদ্বারের চারি মাইল অন্তরে গরীব অধিবাসীদের উপকারার্থে তুইটি কুপ খনন করিয়া দিয়া ঋণগ্রস্থ হইয়াছেন। এখানকার লোকগুলি নিম্নশ্রেণীর এবং অত্যন্ত দরিদ্র। পর্ব্বতের সন্নিকটেই ইহাদের বাসভূমি। তৃষ্ণার জলের জন্য তুই মাইল দূরে গঙ্গায় ইহাদিগকে আসিতে হইত। গঙ্গা ব্যতীত সন্নিকটে বিন্দুমাত্র জল প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল না। বৃদ্ধ সুন্দর লাল সে অভাব পুরণ করিয়া দিয়া তৃষ্ণার্ত্ত দীন

নবনাবীব অশেষ উপকাব কবিয়াছেন। তৃষ্ণায আকণ্ঠ জল পান কবিয়া এখন তাহাবা সুন্দবলালেব জযগীতি গাহিয়া থাকে। মুসৌবিব পথে একদিন পণ্ডিতজী ছল ছল নেত্রে আমাকে বলিয়াছিল—"বাবু, গঙ্গামায়ীব কৃপায় শেষ জীবনে ঋণমুক্ত হইয়া মবিতে পাবিলেই বাঁচি। ঋণেব দাযে আমাব পৈত্রিক বাড়ীটুকু বাঁধা পড়িয়াছে।"

আমি জিজ্ঞাসা কবিলাম—"ঋণেব পবিমাণ কত পণ্ডিতজী?" ছল ছল নেত্রে সে বলিল—"পাচ শত টাকাব উপব হইবে বাবু। সুদেব দায়ে সে ঋণ দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।" সুন্দব লালের কথায় আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। মুগ্ধ হইয়া আমি বলিলাম—"পণ্ডিতজী! তুমিই ধন্য! তোমাব মত কযজন লোক দবিদ্র নবনাবীব তৃষ্ণায় জল যোগাইতে নিজ বাসভবন বন্ধক বাখিতে সক্ষম হয়? জানি না এমন দয়ার্দ্র হৃদয় উচ্চ অন্তঃকবণ আব কযজনেব আছে? অর্থশালী ধনকুবেবগণেব এমন হৃদয় ভগবান কেন দেন নাই পণ্ডিতজী?" পণ্ডিতজী নত মস্তকে কব-যোড়ে বাব বাব প্রণাম কবিয়া বলিল, "সকলই গঙ্গামায়ীব ইচ্ছা বাবু!

রাজঘাট অভিমুখে আসিতে আসিতে পণ্ডীতজীব সঙ্গে আলাপে সত্যই তাঁহার উচ্চ হৃদয়েব পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়া

পড়িলাম। ভাবিলাম হরিদ্বারের মত পবিত্র স্থানে আসিয়া এমন পবিত্র হৃদয় ব্যক্তির সঙ্গ ত্যাগ করা হইবে না। গাড়িতে বসিয়াই সুন্দর লালকে অনুরোধ করিয়া বলিলাম—"পণ্ডিতজী! আমরা যে কয়দিন থাকিব আপনি আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবেন না।" সুন্দর লাল আমার মুখের দিকে একটু চাহিয়া থাকিয়া বলিল "আচ্ছা বাবু!" সুন্দর লাল অনুরোধ রক্ষা করায় আমার খুব আনন্দ হইল। সুন্দর লালের সহিত কথা কহিতে কহিতে আসিতেছি। আমাদের গাড়ী কোন্‌দিক দিয়া কতক্ষণে কোথায় আসিয়া উপস্থিত হইল সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। অশ্বচালক গাড়ি থামাইয়া বলিল "বাবু! রাজঘাট।"

পণ্ডিতজী আমাদের সকলকে গাড়ী হইতে অবতরণ করাইয়া রাজঘাট লইয়া গেল। ঘাটটী বড়ই মনোরম। অদূরে নীল পর্ব্বত। এই স্থানেই নীলধারা আসিয়া মিলিত হইয়াছিল। গঙ্গার তীরবর্ত্তী এই নীল পর্ব্বত দেখিতে বড়ই মনোরম! হৃদয় আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। নীল পর্ব্বতের উপর চণ্ডীর সুউচ্চ মন্দির সূর্য্যের রশ্মিমালায় সুবর্ণমণ্ডিত বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল। অদূরে শ্মশান ঘাট, রাজঘাটের পার্শ্বেই সতীঘাট, তৎপার্শ্বে দক্ষঘাট। রাজঘাটের উপর রাধাকৃষ্ণের সুন্দর মন্দির। মন্দির মধ্যে

অপরূপ যুগল মূর্ত্তি! মন্দিরের অভ্যন্তরে বদরীনারায়ণ বিষ্ণু প্রভৃতির অপরাপর সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন।

রাজঘাট হইতে আমরা মতিরামজীর পঞ্চায়িতী বড়খাড়া দেখিতে গেলাম। প্রত্যহ ৬০।৭০ জন সন্ন্যাসী এখানে ভোজন করেন। কুম্ভমেলার জন্য এখন হইতে মোহন্তজী নানারূপ উদ্যোগ আয়োজন করিতেছেন। পৃথিবীর নানা-দেশ হইতে যে সমস্ত সাধু সন্ন্যাসী কুম্ভমেলায় স্নানার্থে হরিদ্বারে আগমন করিবেন, তাঁহাদেরই জন্য মোহন্তজীর এই আয়োজন। সাধু সন্ন্যাসীরা শীতে কষ্ট না পান, তজ্জন্য এখন হইতেই পর্ব্বত প্রমাণ কাষ্ঠখণ্ড স্তূপিকৃত করিয়া সাজাইয়া রাখিতেছেন। আগামী বর্ষে কুম্ভমেলা হইবে, কিন্তু এখন হইতেই আয়োজনের ধূম পড়িয়া গিয়াছে। একটি প্রদেশের একমাসের যে জ্বালানি কাষ্ঠের প্রয়োজন হয়, কুম্ভমেলায় দুই তিন দিনে প্রায় ততোধিক কাষ্ঠখণ্ড প্রজ্জ্বলিত হইয়া অঙ্গারে পরিণত হয়। মোহন্তজী হিসাব করিয়া দেখাইলেন, কুম্ভমেলায় হরিদ্বারে সাত লক্ষের উপর সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হয়! যে সমস্ত মহাযোগী নিভৃত পর্ব্বত-গুহা হইতে লোকালয়ে কখনও বাহির হন না, তাঁহারাও কুম্ভমেলায় স্নানার্থে আগমন করেন। তবে আমাদের ন্যায়

সাংসারিক জীব তাহাদিগকে দেখিতে বা চিনিতে পারে না। তাহারা সাধারণ লোকচক্ষুর সম্মুখে কখন আসেন, কখন গমন করেন জানিবার উপায় নাই। পূর্ব্বসুকৃতি না থাকিলে এরূপ সাধু মহাত্মাদের দর্শন লাভ অদৃষ্টে ঘটে না। বড়-খাড়ার মোহন্তজী পাঁচবারের পাঁচটি কুম্ভমেলা দেখিয়াছেন। ১৯২৪, ১৯৩৬, ১৯৪৮, ১৯৬০। ইঁনি ৫০ লক্ষের উপর কুম্ভমেলায় লোক সমাগম দেখিয়াছেন। হিমালয়ের অতি নিভৃত গুহা হইতে সাধু সন্ন্যাসীগণ কুম্ভমেলায় আসিয়া থাকেন। সে সময় চারি ক্রোশের মধ্যে তিলধারণের স্থান থাকে না। যত দূর দৃষ্টি যায়, কেবলই লোকসমুদ্র। পথে, মাঠে, ঘাটে, পর্ব্বতে, জঙ্গলে কেবলই সাধু সন্ন্যাসী। সে দৃশ্য কল্পনা করিলেও হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠে। সাধু সন্ন্যাসীগণের যাহাতে কোন কষ্ট বা অসুবিধা না হয়,—তাঁহারা প্রবল শীতে কষ্ট না পান, এইজন্য এখানকার মোহন্তেরা তিন বৎসর পূর্ব্ব হইতে আয়োজন করিয়া আসিতেছেন। এক একটী গুঁড়ি ত্রিশসের হইতে এক মণের অধিক ভারী হইবে। এরূপ লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী কাষ্ঠের গুঁড়ি এখন হইতে স্তুপাকারে সজ্জিত করিয়া রাখা হইতেছে। ইহা ব্যতীত আটা, ঘৃত, ময়দা ও ডাউলের আয়োজন করা হইতেছে। মোহন্তদিগকে

লক্ষ লক্ষ মণ আটা, ময়দা ও ঘৃতের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এরূপ রাজসূয় যজ্ঞ জগতের আর কোথাও হয় কি না জানি না।

এখান হইতে আমরা দক্ষবাড়ী,—যে স্থলে দক্ষযজ্ঞ হইয়াছিল, সেই পবিত্র স্থান দেখিবাব জন্য যাত্রা করিলাম। আমাদিগকে দেখিয়াই বানরের পাল সারি গাঁথিয়া নিমন্ত্রণ বক্ষা করিতে বসিল। সে এক অপরূপ দৃশ্য! আমরা রাশি রাশি ভর্জ্জিত কলাই ক্রয় করিয়া বানরের দলকে পরিবেশন করিতে লাগিলাম। এখানকার বানরগুলি বাঙ্গালার ফলারে বামুনের মত ছাঁদা বাঁধিতেও মজবুত। একহস্তে ভর্জ্জিত কলাই ভক্ষণ করিতেছে, অপর হস্তে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছে। বানরের দলকে ভোজন করাইয়া আমরা বেশ আনন্দ লাভ করিলাম।

দক্ষঘাট দেখিয়া আমবা দক্ষযজ্ঞের স্থান দেখিতে গমন কবিলাম। যে স্থানে সতী পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই স্থানটি দেখিয়া গত যুগের কত কথাই মনে হইতে লাগিল। গৃহিনীর অনুরোধে এস্থানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। এখান হইতে আমরা মন্দিরাভ্যন্তরে অবস্থিত দক্ষেশ্বর মহাদেবকে দেখিতে গেলাম। দক্ষেশ্বর মহাদেবের মন্দিরটি

নীচের দিকে গভীর। যে স্থলে দেবাদিদেব মহাদেব বিরাজ করিতেছেন, তাহার গভীরতা প্রায় এক মানুষের উপর হইবে। যাত্রীরা মন্দির নিম্নে অবতরণ করিয়া ফুল, বিল্বপত্র গঙ্গাজল, পয়সা ইত্যাদি ভক্তিভবে মহাদেবের মস্তকে অর্পণ করিতেছেন। মহাদেবের মস্তকোপরি এক বৃহৎ ঘণ্টা লম্বিত। সকলেই এক এক বার ঘণ্টাটিকে বাজাইয়া ভক্তি-ভরে প্রণাম করিতেছেন। ঘণ্টাধ্বনিতে স্থানটি অহরহঃ মুখরিত। অর্দ্ধ ক্রোশ হইতে এই ঘণ্টা নিনাদ শ্রুত হয়। বড় বড় অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষে গঙ্গাতীরস্থ এই স্থানটিকে প্রকৃতির লীলানিকেতন করিয়া রাখিয়াছে। অদূরে পতিতপাবনী জাহ্নবী কল কল স্বরে বহিয়া যাইতেছেন, পার্শ্বে দক্ষযজ্ঞের স্থান ও সতীকুণ্ড, মধ্যস্থলে দক্ষেশ্বর মহাদেবের মন্দির। দক্ষেশ্বরের মন্দিরটি বড় বড় অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষে ঘেরা। পাঠক! কল্পনানেত্রে চাহিয়া দেখুন স্থানটি কি মনোরম! আমরা অনেকক্ষণ এই মনোরম স্থানে অতিবাহিত করিয়া সত্য-নারায়ণজীর মন্দির দেখিতে গেলাম। এই সত্যনারায়ণজীর মন্দিরটি নিভৃত স্থানে অবস্থিত। দেখিলাম একজন সাধু তাঁহার তপ্তকাঞ্চনবৎ দেহ ভস্মাবৃত করিয়া ঐকান্তিক মনে ভগবত আরাধনায় রত আছেন। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া স্বাত্বিক-ভাবে হৃদয় ভরিয়া উঠিল। সন্ন্যাসীর সহিত কথা কহিবার

জন্য আমি মন্দিরাভ্যন্তরে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলাম। আমার সঙ্গীরা সতাকুণ্ড দেখিতে অগ্রসর হইলেন।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে সন্ন্যাসীর ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি আমার মুখের দিকে চাহিবামাত্র আমি প্রণাম করিলাম। সন্ন্যাসীর দৃষ্টি যেন অমিয়মাখা। তাঁহার পবিত্র তেজপুঞ্জ কলেবর, মুখমণ্ডলের অপার্থিব জ্যোতিঃ ও শান্ত সৌম্য-ভাব দেখিয়া কি বলিয়া কথারম্ভ করিব ভাবিয়া পাইলাম না। আমি যেন হতভম্ব হইয়া পড়িলাম, কয়েক মুহূর্ত্ত অতীত হইয়া গেল ; আমার মুখ হইতে বাক্য নিঃসৃত হইল না। আরও কয়েক মুহূর্ত্ত অতীত হইল, কথা কহিবার মত শক্তি বা সাহস সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। সাংসারিক মলিনতা মাখা হৃদয় পূত হৃদয়ের কাছে অগ্রসর হইতে বুঝি শঙ্কিত হইতেছিল। সন্ন্যাসী ভগবৎ প্রেমামৃত পান করিতেছিলেন,—তখনও তিনি সেই অমৃতের নেশায় টল টল করিতেছেন, সে মূর্ত্তির কাছে অগ্রসর হইবার শক্তি কৈ ? এ হৃদয় যে আসক্তির জালে ঘেরা, অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন, মলিনতা, কপটতার দুর্গন্ধে দুর্গন্ধযুক্ত, মিথ্যা কপটতার পঙ্কিলে কর্দ্দমিত। নিজের দুরবস্থা স্মরণ করিয়া চক্ষে জল আসিল। ভাবিলাম ধর্ম্মগুণে মানুষ দেবতা হয়, আবার কর্ম্মগুণে মানুষ পশুরও অধম হইয়া পড়ে।

সন্ন্যাসী বুঝি আমার হৃদয়ের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। দয়ার্দ্রকণ্ঠে স্নেহস্নিগ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "এখানে কবে আসিয়াছ বাবা ?"

পরিষ্কার বাঙ্গালা কথা এখানে আসিয়াবধি কোন সন্ন্যাসীর মুখে শুনিতে পাই নাই। তবে কি ইনি আমাদের বাঙ্গালী ?

বিনয় নম্রকণ্ঠে বলিলাম "তিন দিন হরিদ্বারে আসিয়াছি, আজ ভাগ্যগুণে আপনার দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইলাম।"

"সকলই ভগবৎ ইচ্ছা বাবা। তাঁহারই ইচ্ছায় সব ঘটিতেছে।"

"মানুষ ইচ্ছা করিলে কি কিছুই করিতে পারে না।"

"এইটাই মানুষের মহা ভ্রম।"

"শোক, দুঃখ, বিপদ, অমঙ্গল সবই কি তাঁহার ইচ্ছায় ঘটিতেছে ?"

"একথা অবিশ্বাস করিবারও কোন কারণ নাই।"

"মঙ্গলময় হইয়া তিনি তবে জগতে এত অমঙ্গলের সৃষ্টি করিলেন কেন ?"

সন্ন্যাসী বিস্ফারিত নেত্র আমার মুখের উপর ন্যস্ত করিয়া বলিলেন—"কি করিয়া বুঝিবে বাবা কোন্‌টা, অমঙ্গল ? যেটা আমরা অমঙ্গল বলিয়া মনে করি, তাহার

মধ্য দিয়াই যে আমাদের মঙ্গলের পথ পরিষ্কৃত হইতেছে না একথা কি বলিতে পার? শোক, দুঃখ, দারিদ্রতা, অশান্তি প্রভৃতিকে আমরা জীবের অমঙ্গলের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি, কিন্তু সেইগুলিই যে মানবের মঙ্গলের পথে লইয়া যাইবার সোপান একথা মহাজনেরা একবাক্যে স্বীকার করেন।"

আমি।—তবে কি শোক দুঃখই জগতে বাঞ্ছনীয়?

সন্ন্যাসী।—বাঞ্ছনীয় হইলেই কি মানুষ সব জিনিষ পায় বাবা? শোক, দুঃখ, সুখ, সম্পদ সকলেরই পশ্চাতে একটি অলক্ষিত শক্তি বিদ্যমান আছে। সেই শক্তিবশে মানুষ ঘটনাচক্রে নিষ্পেষিত হইতেছে। কখন সুখ সম্পদে আত্মহারা হইয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেছে, কখন শোক দুঃখের কষাঘাতে কাতর হইয়া চীৎকার করিতেছে। তবে শোক দুঃখ মানুষের বাঞ্ছনীয় না হইলেও সম্পদ অপেক্ষা দুঃখের তীব্র দাহন মানুষকে একদিন মঙ্গলের পথ দেখাইয়া দেয়।

আমি।—তবে কি সুখ সম্পদ ধনৈশ্বর্য্যে মানুষ ডুবিয়া থাকিলে মঙ্গলের পথ দেখিতে পায় না।

সন্ন্যাসী। পার্থিব সুখে ডুবিয়া থাকিলে অপার্থিবের সুখ কি করিয়া পাইবে বাবা? ন্যাক্কারজনক তীব্র দুর্গন্ধ অহরহঃ যাহার নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করিতেছে, কমনীয়

সুগন্ধ তাহার নাসিকারন্ধ্রে কি করিয়া প্রবেশ করিবে? বিষ্ঠার কীট বিষ্ঠার গন্ধই ভালবাসে, চন্দনের গন্ধ তাহার ভাল লাগে না।

আমি স্তম্ভিত নেত্রে সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম—"প্রভো। তবে কি সংসারটা এতই মন্দ? সংসারে থাকিয়া কি তাঁহার বিমল জ্যোতিঃ কেহই দেখিতে পায় না?"

সন্ন্যাসী।—কেন পাইবে না বাবা? সংসার সমুদ্রে যাহারা ভাসিয়া থাকিতে পারে তাহারাই মহাপুরুষ। তাহারাই ভগবানের বিমল জ্যোতিঃ দেখিতে পায়। আর একবারে ডুবিয়া থাকিলেই হাঙ্গরে খায়। হাঙ্গরের কবল হইতে উদ্ধার পাইবার কোন উপায় থাকে না। লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী লোক জানিয়া, শুনিয়া, নিজেকে হাঙ্গরের কবলে অর্পণ করিতেছে। আসক্তি ও অন্ধজ্ঞান হাঙ্গরের মূর্ত্তিতে মানুষকে গ্রাস করিতেছে। তাহারা মৃত্যুর অন্ধকার দ্বার দিয়া যাইতেছে আসিতেছে, বিমল জ্যোতিঃ তাহারা দেখিতে পাইতেছে না।

আমি।—আসক্তি না থাকিলে মানুষ সংসারে থাকিবে কেন? আমার বলিয়া মানুষ যদি কাহাকেও না ভাবিত, তবে স্ত্রী-পুত্র বা আত্মীয়দের জন্য মানুষ এত কষ্ট স্বীকার

করিবার কেন? তার তত্ত্বজ্ঞান কি সেটাও আমি ভাল বুঝিতে পারিলাম না। আমাকে দয়া করিয়া বুঝাইয়া দিন।

সন্ন্যাসী মৃদুমৃদু হাসিয়া অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমার আর কথা কহিবার সাহস হইল না। ক্ষণেক মুহুর্ত অনিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকিয়া সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন—

"বাবা! ভগবৎ জ্যোতিঃ দর্শন করিবার অনেকগুলি পথ আছে। তাহার মধ্যে সংসার একটি প্রধান পথ। এই পথে বিনাক্লেশে মনুষ্য ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। কিন্তু কর্ত্তব্যের প্রজ্বলিত অনলে আপনাকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। কর্ত্তব্য বলিয়াই সম্পদে, আত্মীয় পরিজনের সেবা যত্ন করিতে হইবে, কিন্তু যিনি তোমাকে এই সেবা যত্নের অধিকার দিয়াছেন,—যিনি নিয়োজিত করিয়াছেন, তাঁহাকে ভুলিলে চলিবে না। ইহাই তত্ত্বজ্ঞান। আপন পর এই অজ্ঞান হইতেই সমুৎপন্ন হয়। স্রষ্টার কাছে আপন পর ভেদ নাই।"

সন্ন্যাসী দয়া পরবশ হইয়া সংসার ও মানব জীবন সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনাইলেন। তাহার উপদেশামৃত পান করিতে করিতে আমার যেন জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইতে লাগিল। নিজের জীবন আজ ধন্য মনে হইল। ভাবিলাম

হায়! জগতে আসিয়া কি করিতেছি। আসক্তিতে মজিয়া সংসার সাগরের সুখগহ্বরে প্রবেশ করিতেছি। কর্ম্মফল অখণ্ডনীয়, তাই সে দিন সেই সাধু মহাত্মার সঙ্গ ছাড়িয়া আবার অন্ধকারময় ভীষণ সংসার কূপে প্রবেশ করিতে হইল।

এই সাধু মহাত্মা আমার হৃদয়ের ব্যাকুলতা দেখিয়া তাঁহার পূর্ব্ব জীবনের দুই একটি কথা আমাকে শুনাইয়াছিলেন। আমি বড় কষ্টে ও আয়াসে এবং অনেক সাধ্য সাধনার দ্বারা তাঁহার ফটো গ্রহণ করিয়াছিলাম। সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে যখন বেদনায় অস্থির হইয়া উঠি, তাহার সৌম্য মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া ক্ষত বিক্ষত হৃদয়কে শান্ত করি। কোথা হইতে যেন সর্ব্বসন্তাপহারী বায়ু আসিয়া হৃদয়ের শ্রান্তি বিষাদ দূর করিয়া দেয়। অমনি তাঁহার সেই উপদেশামৃত মনে আসিয়া দুর্ব্বল হৃদয়ে বলের সঞ্চয় করে। তখন ভাবি সবই একাকার! সকলই তাঁহার ইচ্ছায় ঘটিতেছে।

এই মহাত্মা একবিংশতি বর্ষ বয়সে সংসার ত্যাগ করেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুতেই তাঁহার বৈরাগ্য ভাবের উদয় হয়। তাঁহার পিতার তপ্তকাঞ্চন দেহ যখন শ্মশানে ভস্মীভূত হইতেছিল, তখনই তিনি ভাবিলেন দেহের পরি-

গাম যখন এই, তখন পরিণামের পথ এখন হইতেই খুঁজিতে হইবে! পিতাকে ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না—নিজেকেও চিরদিন সংসারে ধরিয়া রাখিতে পারিব না। যে পথে যাইতে হইবে, সেই পথটা এখন হইতে পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। ইনি আজ সত্তর বৎসর গুরুর নির্দ্দিষ্ট পথে বিচরণ করিতেছেন। আগামী কুম্ভমেলায় গুরুদর্শনের জন্য তিনি বহুদূর হইতে অল্পদিন মাত্র হরিদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁর বিদায় বাক্য অহরহঃ আমার প্রাণে জাগিতেছে। "তিনি যা করাচ্ছেন করে যাও বাবা! ভিন্ন পথ অবলম্বন করিলে তাঁর দয়া করার অপমান হবে।"

কি মর্ম্মভেদী উপদেশ! "যা করাচ্চেন করে যাও বাবা।" কপটতার আবরণে নিজেকে আবৃত করিয়া অর্থের জন্য— সংসার সুখের আশায় হা হা করিয়া ছুটিতেছি! যাহারা আমার নহে, তাহাদিগকে আমার মনে করিয়া আসক্তির বশে "আমার আমার" রবে চীৎকার করিতেছি। যেটা সত্যই সুখ নহে, তাহাকে সুখ মনে করিয়া তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে গলদঘর্ম্ম হইয়া ছুটিতেছি। দুই দিনের জীবনকে অজর অমর ভাবিয়া ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার করিতেছি না! জগতের একমাত্র সত্য ও সার বস্তু সেই সচ্চিদানন্দকে ভাবিবার মত ভাবি না! তাঁহাকে একবার বুঝিবারও চেষ্টা

করি না। সন্ন্যাসী বলিলেন এই সব “করার” অবসান তাঁহার দয়া ব্যতীত হইবে না, কি মর্ম্মভেদী বাণী।

সন্ন্যাসীর নিকট বিদায় লইয়া আসিয়া সঙ্গিদের ভয়ে সতীকুণ্ডে আসিয়া মিলিত হইলাম। আবার সেই “পুনর্মূষিক ভব।” এতক্ষণ সাধু সহবাসে মনের যে পবিত্র ভাবটুকু আসিয়াছিল সে ভাব,, সে দৈন্য, সে বৈরাগ্য নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া গেল। সন্ন্যাসীর উপদেশে আকাশের দিকে চাহিয়া করজোড়ে বলিলাম—“প্রভো। তোমার দয়া না হইলে “করার” অবসান হইবে না।”

সতীকুণ্ড একটি বহুকালের পুরাতন পুষ্করিণীর ন্যায় অবস্থিত। পান্নালাল কুন্থুকরণ এই সতীকুণ্ডের পার্শ্বে সতীর মুর্ত্তি ও মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। জনৈক সাধু এই মন্দিরের তত্ত্বাবধারক।

এখান হইতে আমরা কন্খলে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম দেখিতে গমন করিলাম। এই সেবাশ্রম দেখিয়া প্রাণে যে কি আনন্দ হইল তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারি না। আমাদের বাঙ্গালী—রামকৃষ্ণদেবের ভক্ত সন্ন্যাসীগণ এই সেবাশ্রমে দীন হীন আতুরের সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন। রোগের ঔষধ পথ্য দিয়া দীন হীনের জীবন রক্ষা করিতেছেন। কি স্বর্গীয় ভাব,, কি মহান্ দৃশ্য। এই সেবাশ্রমে ভিন্ন ভিন্ন অনেকগুলি

ওয়ার্ড আছে। সাধুদের ওয়ার্ডে আটটি সিট আছে। ইহা কেবল ব্রহ্মচারী সাধুদের জন্য। হরিদ্বারে সাধু সন্ন্যাসীগণ পীড়িত হইলে এই ওয়ার্ডে তাহারা সেবাশ্রমের ব্রহ্মচারীগণ কর্ত্তৃক সেবা শুশ্রূষা প্রাপ্ত হন। আমরা যখন গিয়াছিলাম, তখন সেবাশ্রমে তিনজন সেবক সন্ন্যাসী ও পাঁচ জন ব্রহ্মচারী ছিলেন। থাইসিস্ ওয়ার্ডে বারটী সিট আছে, কেবল থাইসিসের রোগীরাই এই ওয়ার্ডে চিকিৎসিত হ'ন।

ডিস্পেন্সারি রুমে অনেক মূল্যবান ঔষধ ও যন্ত্রাদি আছে। দুইজন সুচিকিৎসক যাঁহারা বর্ত্তমান জীবনে দীন-সেবার জন্য সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাই রোগী-দের চিকিৎসা করিয়া থাকেন। ইংরাজী ১৯০৫ সালে হরিদ্বারে এই সেবাশ্রম লাইব্রেরীতে বাঙ্গালা, ইংরাজী, সংস্কৃত অনেক রকমের ধর্ম্ম পুস্তক আছে দেখিলাম। হরি-দ্বারের রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম দেখিয়া আনন্দে হৃদয় পুলকিত হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

এখান হইতে বেলা সার্দ্ধ তিন ঘটিকার সময় আমরা হরিদ্বারের ঋষিকুল বিদ্যালয় দেখিতে গেলাম। ঋষিকুল বিদ্যালয়ে আমাদের সনাতন হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত প্রণালীতে একশত আটজন বালক অধ্যয়ন করিতেছে। ইহারা ব্রহ্মচারী। বালকগণের বেশভুষা দেখিয়া গত যুগের ছাত্রদের গুরুগৃহে বাস ও অধ্যয়নের কথা মনে পড়িল। অষ্টম হইতে দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক বালকের এই ঋষিকুলে প্রবেশ করিবার অধিকার আছে। বালকগণ এইস্থানেই ব্যায়ামক্রীড়া, ভোজন ও অধ্যয়ন করিয়া থাকে, অন্য কোথাও যাইবার নিয়ম নাই। সাত বৎসর হইল ঋষিকুল বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

বিদ্যালয়ের নিয়ম অতি সুন্দর। ঋষিকুল বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ভোর ৫টার সময় শয্যাত্যাগ করে। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা কোনকালেই এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না, তাহার পর প্রত্যুষেই স্নান। হরিদ্বারের মত বরফমণ্ডিত দেশে, শীতকালের ভীষণ শীতেও ছাত্রেরা এ নিয়মের ব্যতিক্রম করে না, স্নানান্তে হোম, সন্ধ্যা, পূজা তাহার পর অধ্যয়ন। কি সুন্দর ব্যবস্থা।

আমাদের দেশে যাঁহারা ছেলেদিগকে স্কুলে পাঠাইয়া ইংরাজী শিক্ষার প্রলোভনে ভাবী বংশধরগণের ধর্ম্ম, কর্ম্ম

স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করিতেছেন, তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখিবেন কি? বাস্তবিকই নানা কারণে আমাদের দেশেব ছেলেরা স্কুলে পড়িয়া কিম্ভূতকিমাকার জীব হইতেছে।

ঋষিকুল বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রত্যূষে স্নান, পূজা ও হোমক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়া পাঠাভ্যাস করিতে বসে। পাঠ সমাপনান্তে দুগ্ধ ও ফলাদি জলযোগ করে, তাহার পর কিঞ্চিৎ ব্যায়ামাদি করিয়া বিশ্রামান্তে ভোজন করিতে বসে। ভোজনের পব বিশ্রাম, তাহার পর আবার পাঠাভ্যাস। সন্ধ্যা ছয়টার সময় খেলা করে। তাহার পর জলযোগান্তে শিক্ষকদের নিকটে বসিয়া নানা বিষয়ে মৌখিক শিক্ষা লাভ করে। ছাত্র শিক্ষক সকলেই নিরামিষাহারী। একবেলা নিরামিষ ভোজন এবং রাত্রে রুটী, দুগ্ধ, ও ফলমূলাদি ভোজন করিতে পায়। রজনী সার্দ্ধ দশ ঘটিকার সময় ছাত্রদের শয্যা গ্রহণ করিবার নিয়ম। পাঞ্জাব ও রাজপুতনায় অনেক ছাত্র এখানে অধ্যয়ন করে। দুঃখেব বিষয় বাঙ্গালী ছাত্র একটিও দেখিলাম না। সারি সারি তক্তাপোষ, তাহার উপর একখানি করিয়া কম্বল ও মোটা চাদর বিস্তৃত রহিয়াছে—ইহাই ছাত্রদের শয্যা। বাল্যকাল হইতে শয়ন, ভোজন ও শিক্ষায় তাহারা যেরূপ সংযম অভ্যাস করিতেছে, ভবিষ্যত জীবনে

তাহারা কিরূপ সুখ সম্পদ লাভ করিবে তাহা সহজেই অনুমেয়। অস্মদ্দেশবাসীগণ! তোমরা তোমাদের সন্তান সন্ততিগণকে কিরূপভাবে শিক্ষা দিতেছ,—তাহাদিগকে বাল্যকাল হইতে কিরূপ বিলাসিতা শিক্ষা দিতেছ, একবার চিন্তা করিয়া দেখ।

আমরা ঋষিকুল বিদ্যালয়ের পাকশালা দেখিতে গেলাম। আমরা যখন উপস্থিত হইলাম, তখন ছাত্রদিগের রাত্রি ভোজনের নিমিত্ত আহার্য্য প্রস্তুত হইতেছে। রাত্রের আহারের ব্যবস্থা কেবলমাত্র রুটি ও ডাইল। এই রন্ধন ক্রিয়া এত পবিত্রতা ও শুদ্ধাচারে সম্পাদিত হয় যে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, আমাদের দেশের দেবদেবীর ভোগের জন্য যেন এই আহার্য্য প্রস্তুত হইতেছে। যে ব্রাহ্মণ আহার্য্য যোগাড় করিতেছে, সে সবেমাত্র স্নান করিয়া আসিয়াছে। শুদ্ধান্তকরণে পবিত্র কলেবরে সকলেই এই রন্ধনশালায় যোগদান করিয়াছে। পাচক ব্রাহ্মণদ্বয় সুমধুর কণ্ঠে স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে অতি প্রফুল্লিত-চিত্তে প্রজ্জ্বলিত চুল্লীর উপর বৃহৎ কটাহ বসাইতেছে। সে দৃশ্য দেখিলে বাস্তবিকই মনে হয় এরূপ পবিত্রতা ও বিশুদ্ধাচার বুঝি আমরা আবলম্বন করিতে পারি না।

ঋষিকুল বিদ্যালয় ঠিক গঙ্গার উপরেই অবস্থিত। উহার

বন্ধনশালাও গঙ্গার উপরেই নির্ম্মিত হইয়াছে। বন্ধনশালা হইতে গঙ্গা সৈকতে অবতরণ করিবার জন্য এক প্রশস্ত ঘাট প্রস্তুত হইতেছিল। আমরা যখন এইস্থানে আসিয়াছিলাম, তখন এই ঘাট নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল, এত দিবসে বোধ হয় উহা সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

গঙ্গাগর্ভে এই বন্ধনশালা স্থাপিত বলিয়া ছাত্রগণ যখন আহারে উপবিষ্ট হয়, তখন উন্মুক্ত বাতায়ন পথ হইতে গঙ্গা-গর্ভোত্থিত পবিত্র সান্ধ্য সমীরণ তাহাদিগকে ধীরে ধীরে ব্যজন করিতে থাকে। মানুষ যখন ভগবানে সম্পূর্ণ আত্ম-নির্ভর করে, তখন তিনিও তাহাদিগের প্রত্যেক বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন। তাহা না হইলে এই অপূর্ব্ব আশ্রমে এই প্রকার সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য পরিলক্ষিত হইবে কেন?

বালকগণ যখন ভোজনে উপবেশন করে, তখন প্রত্যেকে ভোজন করিবার অগ্রে আহারীয় সামগ্রী গঙ্গাদেবী ও শ্রীভগবানকে নিবেদন করিয়া পরে ভোজন করিতে আরম্ভ করে। আমাদের দেশের সহিত এই বালকদিগের কতদূর পার্থক্য। আমরা আমাদের বালকবালিকাদিগকে ভাল মন্দ দ্রব্য ভোজন করিতে প্রদান করি। কিন্তু কই একবার ও তাহাদিগকে ভগবানের নামে উৎসর্গ করিতে বলি না? উপনয়নকালে যে মন্ত্র বালকগণ পায়, অর্থাৎ পঞ্চাননকে

পঞ্চগ্রাস অন্ন নিবেদন করিয়া পরে ভোজন করিতে হয়—সেই মন্ত্র কয়জন ব্রাহ্মণবালক উচ্চারণ করিয়া থাকে। আমাদের শিক্ষা দীক্ষার দোষে এক্ষণে উহা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। বন্ধুবান্ধবের সহিত ভোজনকালে কেহ ভগবানকে এই প্রকারে নিবেদন করিলে—সে যে উপহাস্যাস্পদ হইবে তাহা সকলই জানেন। হায় হিন্দু! এখনও কি তোমাদের হিন্দু সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে না?

তারপর আমরা গো-শালা দেখিতে গমন করিলাম। গো-শালায় যাহা দেখিয়া আসিয়াছি তাহা ইহজীবনে কখনও বিস্মৃত হইব না। রামায়ণ মহাভারতে যে সকল গো-বৎসাদির পরিচয় আছে—বশিষ্ঠের সেই "নন্দিনী"—বিরাটের সেই "উত্তর গো-গৃহের পয়স্বিনী গাভী সকল।"—এই ঋষিকুলের গো-শালা দেখিয়া সেই সমুদয় স্মৃতিপথে উদিত হইতে লাগিল! এই প্রকার হৃষ্ট পুষ্ট সবল ও দীর্ঘাকার ধেনু জীবনে কখনও দেখি নাই। শুনিলাম প্রত্যেক গাভী ৫ সের হইতে ১০।১২ সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ প্রদান করিয়া থাকে। আমরা গো-দহন কার্য্য দেখিতে পাই নাই, কারণ সন্ধ্যার পর উহা হইয়া থাকে। এই দুগ্ধই বালকদিগকে রাত্র-ভোজনে দেওয়া হইয়া থাকে। তারপর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইতে ঘৃত প্রস্তুত হয়।

গো-বৃন্দের সেবা শুশ্রুষা দেখিলে মনে হয় না যে, উহা মানবের হস্তদ্বারা সাধিত হইতেছে। গো-গৃহগুলি এত পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন যে, আমাদিগের শয়নগৃহের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কোনও স্থানে একটু মাত্র পুরীষ কিম্বা মূত্রাদির চিহ্ন নাই। সর্ব্বত্র পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। শুষ্ক ও পরিষ্কার বিচালিগুলি গৃহকোণে অতি যত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

গাভীগুলিও অতিশয় নিরীহ। উহাদের গাত্র কি প্রকার পরিষ্কার, পরীক্ষা করিবার জন্য আমি একখানি ধোপদস্ত রুমাল লইয়া একটী গাভীর পৃষ্ঠদেশ উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই রুমালে সামান্যমাত্র ময়লাও পড়ে নাই। গাভীকে হিন্দু ভগবতীর ন্যায় সেবা শুশ্রুষা করিয়া থাকেন। এই দৃষ্টান্ত যদি দেখিতে হয়, তবে ঋষিকুলে গমন কর—তোমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবে।

সে দিবস সেক্রেটারী মহাশয় উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহার সুযোগ্য সহকারী মহাশয় আমাদিগের সমস্ত দেখিবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। বিদ্যালয় পরিদর্শনান্তে আমরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি অতিশয় সমাদরের সহিত আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার সহিত বিদ্যালয় সম্বন্ধে নানা কথাবার্ত্তা হইতে

লাগিল। তিনি বলিলেন যে, এই ঋষিকুল বিদ্যালয় পণ্ডিত দুর্গাদত্তের যত্নে ও চেষ্টায় প্রথম স্থাপিত হয়। প্রায় দুইশত বিঘা জমির উপর ইহা স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহাদের যে উদ্দেশ্য আছে, তাহা এক আনা মাত্র কার্য্যে পরিণত হইয়াছে, বক্রী পনের আনা বাকী। অর্থাভাবই ইহার প্রধান কারণ। গুরুকুল যে প্রকার অর্থ সাহায্য পাইয়াছে, ঋষিকুল তাহা পায় নাই। উদয়পুরের মহারাণা ইহার অট্টালিকা নিম্মাণ কার্য্যে পাঁচ হাজার এবং রিজার্ভ ফণ্ডে দশ হাজার এই মোট পনের হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন। ঋষিকুলের কোনও রিজার্ভ ফণ্ড এখনও নাই।

তাঁহার কথা শুনিয়া আমাব মনে হইল—এই যে ভারতে কোটী কোটী লোক বাস কবিতেছে ইহার ভিতর হিন্দুব সংখ্যাই বেশী। প্রত্যেকে যদি যৎকিঞ্চিৎ করিয়াও সাহায্য প্রদান করেন, তাহা হইলেও এই আদর্শ হিন্দু বিদ্যালয়” যথেষ্ট সাহায্য পাইতে পারে। যিনি হিন্দু বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরি যাহাতে এই বিদ্যালয়টী স্থায়ী হয়, তৎবিষয়ে বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করা উচিত।

এই বিদ্যালয়ে বর্ত্তমানে আটজন শিক্ষক আছেন। ইহারা সকলেই সুশিক্ষিত অমায়িক এবং আদর্শ চরিত্র। শিক্ষক-

দিগের ভিতর দুইজনের সহিত আমার আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহাদের মুখে শুনিলাম যে, দিবারাত্র ছাত্র-দিগের সহিত তাঁহাদিগকে বাস করিতে হয়। সন্তানের ন্যায় তাহাদের লালনপালন হইতে আরম্ভ করিয়া শিক্ষা-কার্য্য পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহারা করিয়া থাকেন। এক কথায় তাঁহারা ছেলেদের সর্ব্বস্ব। ক্রীড়ার সাথী হইতে আরম্ভ করিয়া ভগবৎ আরাধনা পর্য্যন্ত সকল বিষয়েই তাঁহারা ছাত্রদিগের সহিত মিশ্রিত।

বিদ্যালয় দেখিয়া বেলা ৫॥০ ঘটিকার পর আমরা ক্লান্ত-দেহে বহির্গত হইয়া গঙ্গার উপরে একখানি বেঞ্চে আসিয়া উপবেশন করিলাম। কলনাদিনী ভাগিরথী কুল-কুল স্বরে সম্মুখ দিয়া প্রবাহিত হইতেছেন। তাঁহার সেই সদ্যসন্তাপহারী সমীরণে আমার রোগক্লিষ্ট শরীরে ভ্রমণ-জনিত যে অবসাদ আসিয়াছিল তাহা দূর হইয়া গেল। আমি উদাসনয়নে ভাগিরথীর দিকে চাহিয়া রহিলাম। ভাগিরথীর অপর প্রান্তে দীর্ঘাকার পর্ব্বতশ্রেণী বিরাজ করিতেছে। এই সকল পর্ব্বতেও লোকালয় আছে, তাঁহা-দিগকে "পাহাড়ী" বলে। আমি দেখিলাম যে, দিবাবসানে "পাহাড়ীয়ারা" গৃহে ফিরিবার জন্য ভেলা ভাসাইয়া দলে দলে গঙ্গা অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। তখনও রজনীর অন্ধকার

গঙ্গাগর্ভকে তিমিরাবৃত করিতে পারে নাই। আমি দেখিতে লাগিলাম যে, তাহারা যেন সেই ভাগিরথীতে ভেলা ভাসাইয়া কোন অসীম অনন্তের উদ্দেশ্যে চলিয়াছে। কিন্তু পরক্ষণেই দেখিলাম যে, তাহাদের ছোট ছোট ভেলা আপন আপন গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়াছে। এই "পাহাড়ীয়ারা" এক অদ্ভুত জাতি। পাহাড়ই তাহাদের সর্ব্বস্ব। তাহারা যেন পাহাড় আশ্রয় করিয়াই আসিয়াছে, পাহাড়েই তাহারা চাষবাস করিয়া থাকে, যে শস্য উৎপন্ন হয়, তদ্দারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা বিক্রয় করে, এবং তদ্দারা আবশ্যকীয় অন্যান্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া থাকে।

এই "পাহাড়ীয়ারা" অদ্ভুত বলশালী। তিনমণ বোঝা পৃষ্ঠে লইয়া তাহারা অবলীলাক্রমে সেই দুরারোহ পর্ব্বতে কাষ্ঠ বিড়ালের ন্যায় উঠিয়া থাকে। আবার তাহাতে যে সকল শুষ্ক কাষ্ঠ পাওয়া যায় তাহাও পৃষ্ঠে বহন করিয়া আনিয়া লোকালয়ে বিক্রয় করে।

ইহাদের ভিতরও জাতিভেদ আছে। ব্রাহ্মণ, শূদ্র প্রভৃতি ইহাদের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্রমে ধীরে ধীরে সন্ধ্যা সুন্দরী আসরে অবতীর্ণ হইলেন। সন্ধ্যাকালে পশ্চিমাকাশ সম্পূর্ণ স্বর্ণবর্ণ ধারণ করে। সূর্য্যের শেষ রশ্মি পশ্চিম দিকচক্রবালে পড়িয়া যে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য

ধারণ করে, তাহা লেখনী মুখে বর্ণনা করিতে পারা যায় না। যাঁহারা এই অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সচক্ষে দর্শন করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার মধুরত্ব উপভোগ করিয়াছেন।

কি সুন্দর দৃশ্য! অবিরাম নিনাদি ভাগিরথী সম্মুখ দিয়া প্রবাহিতা হইতেছেন—দূরে অদূরে শৈলমালায় অস্তায়মান সূর্য্যের শেষ কিরণরাশি পড়িয়া চক্ চক্ করিতেছে, আর ভাগিরথী সলিলে সেই সকল বর্ণসমূহ প্রতিফলিত হইতেছে। আমি উদাসনয়নে একদৃষ্টে প্রকৃতির এই বিরাট লীলার প্রতি চাহিয়া রহিলাম। যতই দেখি ততই যেন দেখার আশা আরও বৃদ্ধি পায়। সন্ধ্যা হইল দেখিয়া আমরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ক্রমে আমরা ব্রহ্মকুণ্ডের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

তখন চতুর্দ্দিক হইতে শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর ইত্যাদির রব উত্থিত হইয়া সেই স্থান মুখরিত করিতেছিল। প্রত্যেক দেবালয়ে দেবালয়ে মঙ্গল আরতি হইতেছিল। প্রকৃতির এই বিরাট শোভা—বিশ্ববাসীর এই গম্ভীর বাদ্যরবে যেন আরও বিরাট আরও গম্ভীর আরও সুন্দর হইতেছিল।

ভাগিরথী সলিলে সহসা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম যেন গঙ্গাগর্ভে অগণিত তারকামালা ফুটিয়া উঠিল। প্রত্যেক তীর্থযাত্রী ও স্থানীয় অধিবাসীরা সন্ধ্যা সমাগমে ঘৃত প্রদীপ

প্রজ্জ্বলিত করিয়া সেই পবিত্র সলিলে ভাসাইয়া দিতেছে। এমন অপূর্ব্ব দৃশ্য আর দৃষ্টিগোচর হয় নাই। কেবলই যেন বোধ হইতে লাগিল—অগণিত তারকামালা আকাশ হইতে কক্ষচ্যুত হইয়া আসিয়া ভাগিরথীর চরণ বন্দনা করিতেছে।

চারিদিকেই গম্ভীরকণ্ঠে গঙ্গাস্তব পঠিত হইতেছে আমাদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া একজন সন্ন্যাসী বলিতেছেন ঃ—

মাতঃ শৈলসুতাসপত্নি বসুধাশৃঙ্গারহারাবলি স্বর্গারোহণ বৈজয়ন্তি ভবতীং ভাগীবথীং প্রার্থয়ে ত্বত্তীরে তরুকোটরান্ত-র্গতো গঙ্গে বিহঙ্গো বরং তন্নীরে নরকান্তকারিণি বরং মৎসোঽথবা কচ্ছপঃ। নৈবান্যত্র মদান্ধসিন্দুরঘটাসংঘট ঘণ্টাবণৎকার ত্রস্ত সমস্ত বৈরিবনিতালব্ধস্তুতির্ভূপতি ঃ॥ ২॥ কাকৈর্নিষ্কুষিতং শ্বভিঃ কবলিতং বীচিভিরান্দোলিতং স্রোতো-ভিশ্চলিতং তটান্তমিলিতং গোমায়ুভির্লুণ্ঠিতং। দিব্যস্ত্রীকর-চারুচামরমরুৎ সংবীজ্যমানং কদাদ্রক্ষেঽহং পরমেশ্বরী ত্রিপথগে ভাগীরথী স্বংবপুঃ॥ ৩॥ অভিনববিষবল্লী পাদ-পদ্মস্য বিষ্ণোমদনমথন মৌলেমালতী পুষ্পমালা। জয়তি জয়পতাকা কাপ্যসৌ মোক্ষলক্ষ্মী ক্ষয়িত কলিকলঙ্কা জাহ্নবী নঃ পুনাতু॥ ৪॥ যত্তত্তালতমালশালসরলব্যালোলবল্লীলতা-চ্ছন্নং সূর্য্যকর প্রতাপরহিতং শঙ্খেন্দুকুন্দোজ্জলং। গন্ধর্ব্বা-মরসিদ্ধাকিন্নরবধুত্তুঙ্গস্তনাস্ফালিতং স্নানার প্রতি বাসরং

ভবতু মে গাঙ্গং জলং নির্ম্মলং॥ ৫॥ গাঙ্গং বারি মনোহারি মুরারিচরণচ্যুতং। ত্রিপুরারি শিরশ্চারি পাপহারি পুনাতু মাং॥ ৬॥ পাপাপহারি দুরিতারি তরঙ্গধারি দূরপ্রচারি গিরিরাজ গুহাবিদারি! ঝঙ্কারকারী হরিপাদরজোবিহারী গাঙ্গং পুনাতু সততং শুভকারী বারি॥ ৭॥ বরমিহ গঙ্গা-তীরে শরটঃ কৃশঃ শুনিতনয়ো ন পুনর্দূরতরস্থঃ করীবর কোটিশ্বরো নৃপতিঃ॥ ৮॥ গঙ্গাষ্টকং পঠতিঃ যঃ প্রযতঃ প্রভাতে বাল্মীকিনা বিরচিতং শুভদং মনুষ্যঃ। প্রক্ষাল্য সোঽত্র কলিল্মষপঙ্কমাশু মোক্ষং লভেৎ পতিত নৈব পুনর্ভবাব্ধৌ॥

সন্ন্যাসী একবার দুইবার তিনবার এই পবিত্র গাথা পাঠ করিয়া নীরব হইলেন। আমি তন্ময় হইয়া তাঁহার মুখে এই পবিত্র স্তোত্রপাঠ শ্রবণ করিতেছিলাম। যখন তিনি থামিলেন—তখন হঠাৎ আমার চৈতন্যোদয় হইল। মধুর কণ্ঠে এই মধুর স্তব অনেককে আবৃত্তি করিতে দেখিয়াছি—কিন্তু সে দিনের সেই সন্ন্যাসীর মুখের আবৃত্তি এখনও আমার স্মৃতিপটে গাঁথা রহিয়াছে।

ব্রহ্মকুণ্ডের অগণিত মৎস্য সমূহ সন্ধ্যাকালে এই দীপমালা দেখিয়া আনন্দে চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল। সমস্ত দিবস যাত্রীপ্রদত্ত "ময়দার লাড্ডু" খাইয়া উদরপূর্ত্তি

করিয়াছে—এখনও তাহাদের বিশ্রাম করিবার সময় হয় নাই।

গঙ্গাব আরতি আবাব এক অপরূপ দৃশ্য। প্রায় অর্দ্ধ মাইল ব্যাপিয়া দেখিলাম স্থানে স্থানে ভক্তবৃন্দ দাঁড়াইয়া ঘৃত প্রদীপ হস্তে গঙ্গার আরতি করিতেছেন। গম্ভীর ঢক্কা নিনাদে ও সুমধুব স্তোত্র পাঠে সেই স্থান তখন যেন সত্য-যুগেব স্মৃতি মনে কবাইয়া দিতেছিল। তখনও লোকের স্নানেব বিবাম নাই। অহোরাত্রের ভিতর গঙ্গার ঘাট কখনও লোকশূন্য হয় না। প্রচণ্ড শীত, তবুও লোকের স্নানেব বিবাম নাই।

আবার এক অপরূপ দৃশ্য পরিলক্ষিত হইল। গঙ্গার ধাবে ধারে বসিয়া প্রাচীন ব্যক্তিরা সন্ধ্যা আরাধনা করিতে-ছেন। ইহাদের ভিতর হিন্দুস্থানী ও মান্দ্রাজীর সংখ্যাই বেশী। মুক্তকেশ দীর্ঘ শিখাধারী সেই সকল প্রাচীন ব্যক্তিদিগকে দেখিয়া মনে হইল যেন সারি সারি সেঁকালের ঋষি মহর্ষিরা বসিয়া সন্ধ্যা ও বেদপাঠ করিতেছেন।

বহুক্ষণ ধরিয়া এই সকল দৃশ্য দেখিলাম। দেখিতে দেখিতে রজনী উপস্থিত হইল। তখন আবার শ্রান্তদেহে বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সে রাত্রের শীত অতীব তীব্র বলিয়া বোধ হইল। দুইখানি লেপ গাত্রে দিয়া ও গৃহে অগ্নি জ্বালাইয়াও শীতের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই নাই।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

২১ শে মাঘ মঙ্গলবার ১৩২০ সাল ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯১৪ সালের রাত্রি প্রভাত হইল। মধুর "রাম র'ম" শব্দে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। প্রচণ্ড শীত। জানালা খুলিয়া প্রথম গঙ্গা সন্দর্শন করিলাম। এখনও সূর্য্যোদয় হইতে বহু বিলম্ব আছে। কিন্তু সেই ... শীতে রজনীর অন্ধকার থাকিতেও স্নানার্থীর বিরাম না... । ঘাটে দেখিলাম বহুলোক স্নানার্থে সমবেত হইয়াছে

মধুর স্বরে "রাম রাম" করিতে করিতে কে ঐ চলিয়া যাইতেছে? সেই অন্ধ ভিক্ষুক না? তাহারই কি এই মধুর কণ্ঠস্বর! বোধ হইল সেই অন্ধ ভিক্ষুকই যেন প্রথমে জাগরিত হইয়া "রাম রাম" শব্দে হরিদ্বারবাসীকে জাগাইয়া তুলিল।

এই অন্ধ ভিক্ষুক নিয়মিতরূপে প্রত্যহ উঠিয়া থাকে। তাহার নিকট ঘড়ি নাই, কাহাকে ঘড়ি বলে তাহাও হয়ত সে জানে না। কিন্তু সে বারমাস শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সকল ঋতুতেই সমানভাবে রাত্রি ৫টার সময় শয্যা ত্যাগ করিয়া আপনার জীর্ণ সূক্ষ্ম নামাবলী খানি দ্বারা দেহাবৃত করিয়া

ব্রহ্মকুণ্ড পানে চলিয়া থাকে। আমি তিনদিন ঘড়ির সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছি সে প্রত্যহ একই সময়ে উঠিয়া থাকে। তাহার মধুর কণ্ঠে রাম নাম শব্দ শুনিয়া দেবালয়বাসী ভৃত্যেরা উঠিয়া প্রাতে মন্দিরতল পরিমার্জ্জনা করিতে থাকে।

অন্ধের গৃহ নাই। কোনও নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই। প্রত্যুষে পাঁচটার সময় উঠিয়া রাম নাম শব্দ করিতে করিতে ব্রহ্মকুণ্ডে গমন করে। তথায় স্নান করিয়া ঘাটের উপর আসিয়া উপবেশন করে। সমস্ত দিন সে কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা কহে না—আপন মনে কেবল মাত্র "রাম নাম" শব্দ করিতে থাকে। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সে এই প্রকারে একভাবে উপবেশন করিয়া থাকে। কখনও কাহার নিকট কিছু ভিক্ষা করে না। কোনও দিকে তাহার লক্ষ্য থাকে না। চক্ষু নাই—সে অন্ধ—তাই বুঝি সে সমস্ত দিবস ঐ প্রকারে বসিয়া আপনার অভীষ্টদেবের ধ্যান ও গুণকীর্ত্তন করে।

অন্ধের আহার কি তবে হয় না? সে ত কোনও দিন কখনও আহারের জন্য বলে না—বা তাহার অপেক্ষায় থাকে না। সমস্ত দিবসের ভিতর যদি কেহ কিঞ্চিৎ দুগ্ধ বা শর্করা লইয়া তাহার নিকটে ধরিল—সে হয়ত তাহা হইতে কিঞ্চিৎ

লইয়া পান করিল। যে দিন তাহা জুটিল না—সে ধীরে ধীরে গঙ্গায় নামিয়া আসিয়া অঞ্জলিপূর্ণ করিয়া জল পান করিয়া চলিয়া গেল। আমরা যে কয়দিন ছিলাম একদিনও অন্ধকে উপবাসী থাকিতে দেখি নাই। যাত্রীরা কেহ কিছু না দিলেও স্থানীয় অধিবাসীরা সেই অন্ধকে খাওয়াইয়া আসিত। রাত্রে হয়ত অন্ধ একস্থানে শয়ন করিয়া আছে, কেহ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে বড় বড় কাষ্ঠের গুঁড়ি আনিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিল। অন্ধ হয়ত খানিক-পরে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, অন্য সন্ন্যাসী আসিয়া সেই স্থানে উপবেশন করিল। আমি একদিন এই প্রকার আগুনের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু অন্ধের কিছুতেই দৃকপাত নাই। তাহার কোনও কামনা নাই। সে একমনে দিবারাত্র আপন অভীষ্টদেব রামচন্দ্রকে ডাকিয়া যাইতেছে।

প্রাতে উঠিয়া গুরুকুল বিদ্যালয় দেখিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলাম। "হরিদ্বারে আসিব" "গুরুকুল" বিদ্যা-লয় দেখিব, এই দুইটী বাসনা অনেক দিবস হইতে হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। এত দিবস পরে সেই বাসনা পূর্ণ হইয়াছে ভাবিয়া মনে মনে ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিলাম।

যখন টম্‌টম্‌ আসিল তখন বেলা প্রায় ৯ টা। মাতুলকে লইয়া আমি গুরুকুল বিদ্যালয় দর্শন করিতে চলিলাম।

আসিতে আসিতে আমরা "সতীঘাটে" আসিয়া উপস্থিত হইলাম। "সতীঘাট" অর্থে "সতীদাহ ঘাট" বুঝিতে হইবে। পুরাকালে অর্থাৎ লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের পূর্ব্বে পর্য্যন্ত আমাদের দেশে স্ত্রীলোকেরা স্বামীর অনুগমন করিত। অর্থাৎ স্বামীর দেহান্তর ঘটিলে এক চিতায় সহমরণে যাইত। সে আজ বেশী দিনের কথা নহে। এখনও বোধ হয় বাঙ্গালায় অনেক প্রাচীনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে শুনিতে পাইবেন যে, তাঁহার অমূক অমূক বৃদ্ধা শ্বশ্রূঠাকুরাণী সহমৃতা হইয়াছিলেন। এই "সতীদাহ" প্রথা হিন্দুর হিন্দুস্থানেই প্রচলিত ছিল। পৃথিবীর আর কোনও স্থানে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না।

হিন্দুরমণী পতিকেই সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞান করিতেন। তাঁহারা যখন দেখিতেন যে, পতি ইহজগত হইতে বিদায় লইতেছেন, তখন তাঁহারাও হাঁসিতে হাঁসিতে তাঁহার অনুগমন করিতেন। পূর্ণযুবতী রূপলাবণ্যশালিনী সতী-সীমন্তিনীগণ স্বামীর দেহাবসানে আপনার সর্ব্বাঙ্গ ঘৃতনিষিক্ত করিয়া পদদ্বয় অলক্তকরাগরঞ্জিত করিয়া সীমন্তদেশে সিন্দুর বিন্দু আরও উজ্জ্বল করিয়া দিয়া বিচিত্র পট্ট-

বস্ত্রে ও নানালঙ্কারে শোভিতা হইয়া স্মিতমুখে লাজ ছড়া-রতে ছড়াইতে তাঁহারা চিতাপার্শ্ব প্রদক্ষিণ করিয়া অবশেষে জ্বলন্ত চিতায় তনুত্যাগ করিতেন। এই যে স্বামী ও স্ত্রীর জীবনে মরণে অনুরাগ আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় কি ?

ইতিহাসের পৃষ্ঠা মুছিয়া ফেলিবার নয়! ইতিহাস ঘাঁটিয়া দেখ, সতীর এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তিকাহিনী সমূহ স্বর্ণা-ক্ষরে লিখিত আছে। রাজপুতানার রমনীদের "জহর ব্রত"এক অদ্ভুত ব্যাপার ! মনস্বী কর্ণেল টড বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া অনেক কাহিনীই সহস্তে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

এই "সতীঘাটে" প্রায় সহস্র "বেদী" আছে। যে সমুদায় রমণীগণ স্বামীর অনুগমন করিয়াছেন—তাঁহা-দেরই স্মরণার্থে এই সকল বেদী নির্ম্মিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অর্থাভাবে আরও কত বেদী নির্ম্মিত হয় নাই—কে তাহার ইয়ত্বা করিতে পারে ?

স্থান দেখিয়া আমার হৃদয় কি যেন এক প্রকার ভাবে বিভোর হইয়া গেল। আমি একটী "সতীবেদীর" পাদমূলে বসিয়া পড়িলাম।

বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম আমরা এখন "সুসভ্য" হইয়াছি, অবশ্য এই "সতীদাহ প্রথা" যে অসভ্য বর্ব্বরোচিৎ

কার্য্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু যিনি হিন্দু—সতী রমণী কি যিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহার নিকট ইহা বিসদৃশ ঠেকিবে না! যুগযুগান্তর ধরিয়া সতী রমণীর যে শশ্মানস্মৃতি ভারত সযত্নে বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে—তাহা সহজে মুছিবার নহে।

এই সকল "সতীবেদী" অধিকাংশ পাঞ্জাব ও রাজ-পুতানাব রমণীবৃন্দেব। তাঁহারা হয় ত স্বামী সমভিব্যাহারে এই স্থানে আরোগ্য কামনায় আগমন করিতেন। তাবপর বিধির বিধানে স্বামীর দেহান্তব ঘটিলে, এই স্থানেই তাঁহারা সহমৃতা হইতেন।

আজ আমি ধন্য ও পবিত্র হইলাম। হিমালয়ের কঠিন বক্ষেব ভিতর আজ যাহা লুক্কাইত দেখিলাম, তাহাতে আমার হৃদয় আনন্দে গর্ব্বে ও উল্লাসে স্ফীত হইয়া উঠিল। সেই বেদীর পাদমূলে আমি মস্তক নত করিয়া বারংবার নমস্কার করিতে লাগিলাম।

সতীঘাট পার হইয়া তারপর গুরুকুলে যাইতে হয়। এই স্থানে আমাদের গাড়ী পুল পার হইয়া গঙ্গার অপর পারে উত্তীর্ণ হইল।

এই পুলটী একটী হাওড়া ব্রিজের "মিনিয়েচর এডিশন" (Miniature Edition)। পাঁচ সাতখানি নৌকা ভাসাইয়া

তাহার উপব বাঁশ ও কাঠ ও প্রস্তরাদি দিয়া এই পুলটী নির্ম্মিত হইয়াছে। সাধারণতঃ গুরুকুল বিদ্যালয়ের উদ্যোগে এই পুল নির্ম্মিত হইয়াছে। গঙ্গার পরপারে যাইবার সকলেরই আবশ্যক আছে, তবে ইহাদের আরও বেশী। ইহার উপর দিয়া সমস্ত গাড়ীও নিবাপদে গমনাগমন করিয়া থাকে। পুল অতিক্রম করিয়া চতুঃপার্শ্বস্থ প্রস্তরের নানাবিধ শোভা দেখিয়া আমি আর গাড়ীতে বসিতে পারিলাম না। বিকীর্ণ প্রস্তরেব নানাবিধ রং দেখিয়া আবাব হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কোনটী বা শ্বেত, কোনটী বা পীত, কাহাবও বর্ণ উজ্জ্বল হীরক-খণ্ডের ন্যায় তদুপরি সূর্য্যরশ্মি পড়িয়া চক্ চক্ কবিতেছে। আমি মনে করিলাম যে, এই সমস্ত উপলখণ্ড লইয়া আসিব, কিন্তু কত সংগ্রহ করিব, সবই যে এক প্রকার—সবই যে লোভনীয়—শোভনীয়—ত্যাগ করিবার কিছুই নাই।

গঙ্গার অপর পার্শ্বে সারি সারি উটের দল চলিয়াছে। এই সকল উটের উপর নানাবিধ পণ্য সম্ভার—ছালায় করিয়া তাহাদের পৃষ্ঠদেশে স্থাপিত হইয়াছে। "কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জ দেহ" এই সারি সারি উটের শ্রেণী বাস্তবিকই দেখিতে অতি সুন্দর। একদল অগ্রসর হইতেছে অপর একদল তৎক্ষণাৎ তাহাদের পশ্চাতে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে।

দূর হইতে দেখিলে বোধ হয় যেন পিপীলিকা শ্রেণীবৎ এই সকল উটের দল চলিয়াছে। নানা দেশ হইতে আগমন করিয়া বণিক সম্প্রদায় এই স্থানে বাণিজ্যাদি সমাপনান্তে আবার অন্য দেশে চলিয়া যায়। উটগুলি তাঁহাদেরই সম্পত্তি। বাঙ্গালার মাল পরিপূর্ণ গরুর গাড়ী সমতল ক্ষেত্রের উপর দিয়া গমন করিয়া থাকে। জন্মাবধি আমাদের চক্ষু তাহা দেখিয়াই অভ্যস্ত। হঠাৎ আজ এই উটের শ্রেণী দেখিয়া একটী নূতনত্বের সন্ধান পাইলাম। তাহাদের গলদেশে আবদ্ধ ঘণ্টার শব্দও দূর হইতে বেশ স্পষ্ট শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল।

পূর্ব্বে পাহাড়ীয়াদের সম্বন্ধে বলিয়াছি। এক্ষণে দেখিতে পাইলাম পাহাড়ীয়া স্ত্রীলোকেরা দলে দলে পাহাড় হইতে অবতরণ করিয়া আসিতেছে। ইহার ভিতর বৃদ্ধা, যুবতী ও বালিকা আছে। কাহারও পৃষ্ঠদেশে শুষ্ক কাষ্ঠের বোঝা, কাহারও পৃষ্ঠদেশে পর্ব্বতোৎপন্ন শস্যসম্ভার, আবার কাহারও বা মস্তকোপরি দুগ্ধের ভাণ্ড। সকলেই বেশ প্রফুল্লিত মনে চলিয়াছে। ইহাদের রূপলাবণ্য নাই বটে, কিন্তু তাহাদের বলিষ্ঠ দেহ, সবল মাংসপেশী সমন্বিত ভুজদ্বয়, দেখিলে বোধ হয় যে, বাঙ্গালী রমণী শত সহস্র চেষ্টা করিলেও ইহাদের ন্যায় অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য সম্পদ পাইবে না।

ইহাদের অবরোধ প্রথা নাই—মস্তকে অবগুণ্ঠন নাই, কিন্তু তবুও কেমন তাহাদের ভিতর একটী সলজ্জ ভাব দেখিতে পাওয়া গেল। হিমালয়ের কঠিন বক্ষে লালিতা পালিতা এই অপূর্ব্ব নগনন্দিনীদিগকে দেখিয়া আমার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম মাতৃস্বরূপিণী পাহাড়ী কুমারীরা কি হিমরাজ হিমালয়নন্দিনী আদ্যাশক্তি সতীর অংশ সম্ভূত !

এই স্থানে গঙ্গার জল আরও কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তারপর গঙ্গার গর্জ্জন যেন সমুদ্র গর্জ্জনবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। আমরা আসিয়া অবধি কোনও স্থানে গঙ্গার এই প্রকার ভীষণ গর্জ্জন শ্রবণ করি নাই। পুল বাঁধায় স্রোতের জল রুদ্ধ হওয়াতে কিংবা অন্য কোনও প্রকাণ্ড উপলখণ্ডে বাধা পাওয়াতে এই স্থানে গঙ্গার গর্জ্জন এই প্রকার ভয়ঙ্কর হইয়াছে। গঙ্গার এই সৈকত ভূমি প্রায় তিন চার মাইল ব্যাপী বিস্তৃত। চারিদিকে কেবল উপলখণ্ড ধূ ধূ করিতেছে। বালি নাই, মৃত্তিকা নাই কেবল মাত্র নানাবিধ প্রস্তরখণ্ড ইহার উপর বিস্তৃত। আমরা পদব্রজেই গমন করিতেছিলাম, টম্ টম্ আমাদের পশ্চাতে আসিতেছিল। গাড়ীখানি কখনও বা প্রস্তরে বাধা পাইয়া হেলিয়া পড়িতেছিল। আবার কখনও বা শূন্যে উঠিয়া

পড়িতেছিল। এইরূপে বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় গুরুকুল বিদ্যালয়ের সম্মুখস্থ প্রধান তোরণ দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখনও আমি দ্বারের ভিতর প্রবেশ করি নাই। ইহার সম্মুখে আসিয়াই আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িলাম। মনে ভাবিলাম বহু দিবস যাহাকে স্বচক্ষে দেখিব বাসনা করিয়াছিলাম ইহা কি সেই বিদ্যালয়। যেখানে ঋষিপ্রণোদিত পূর্ব্ব প্রথানুসারে বালকদিগকে শিক্ষা দীক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে ইহা কি সেই তপোবন? ইহার ভিতর কি দেখিতে পাইব? দীর্ঘদেহ জটাবল্কলধারী শুদ্ধান্তঃকরণ ঋষিসমূহ ঋষিবালকদিগকে সযত্নে পাঠ বলিয়া দিতেছেন—তাহাই দেখিতে পাইব কি? হিন্দুর সেই প্রাচীন শিক্ষা প্রণালী আবার কি আমার নয়ন সমক্ষে পতিত হইবে।

প্রাচীনকালে গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া যে আদর্শে বিদ্যার্থী গঠিত হইত, সেই আদর্শ লইয়া এই মহা বিদ্যালয়ের সূত্রপাত হয়। বেদ, বেদান্ত, দর্শন, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল ইত্যাদি ব্যতীত পাশ্চাত্য শিক্ষাও এখানে প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই মহা বিদ্যালযের সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানগৃহ আছে, তথায় তড়িৎ-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, প্রভৃতি বিষয়েও শিক্ষা দেওয়া হয়। এখন হিন্দুর সেই কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে। সর্ব্বত্র এক নূতন স্পন্দন অনুভূত হইতেছে।

সেই স্পন্দন সর্ব্বত্যাগী নিষ্কামী সন্ন্যাসীদিগের চিত্তেও শক্তি সঞ্চার করিয়াছে! তাঁহারা ভারতবাসীর দুরাবস্থা দেখিয়া আব নিশ্চেষ্ট নহেন। তাঁহারা এখন স্বদেশের উন্নতিকল্পে আত্মোৎসর্গ করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। সত্য কথা বলিতে কি, জ্ঞানী লোকে এ প্রদেশ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। আজ ইহাই দেখিব, দেখিয়া ধন্য হইব এই আনন্দে আমার হৃদয় অধীর হইয়া উঠিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কম্পিতপদে ব্যাকুলিত চিত্তে—আশা উদ্বেলিত হৃদয়ে ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া প্রথম তোরণদ্বার অতিক্রম করিলাম। তোরণদ্বার অতিক্রম করিয়াই এক বিস্তৃত ময়দান দৃষ্টিগোচর হইল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এই বিস্তৃত শ্যামল ময়দান দেখিয়া আমার বাঙ্গালাদেশের সেঁতে সেঁতে বনজঙ্গলাকীর্ণ মাঠের কথা মনে পড়িয়া গেল। এই প্রশস্ত ময়দানে গুরুকুল বিদ্যালয়ের বালকবৃন্দ ক্রীড়া করিয়া থাকে। ইহা তাহাদের ক্রীড়া ভূমি—কিন্তু আমার বোধ হয় ইহাই তাহাদের প্রকৃত কর্ম্মভূমি। ক্রীড়াচ্ছলে বালক একবার যাহা শিক্ষা লাভ করে, মৃত্যুর শেষ দিবস পর্য্যন্ত তাহা

তাহাব হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া থাকে। এই বিস্তৃত ময়দান অন্ততঃ তিন শত বিঘা বলিয়া প্রতীয়মান হইল।

ময়দান অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় তোবণদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তোবণগুলি পরস্পর ঋজুভাবে স্থাপিত। একটী তোরণ হইতে অপর তোবণটী সবলভাবে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এই দ্বিতীয় তোবণদ্বাব অতিক্রম করিয়া আমবা গুরুকুল বিদ্যালয়েব উত্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

এই অপূর্ব্ব উত্থানের বর্ণনা কবিতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম। মোটের উপর বলিতে পারি যে, গুরুকুল বিত্থালয়ের ছাত্র-দিগের দৈনিক আবশ্যকীয় ফলমূলাদি, শাক সবজী ও ফুল ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে হইলে অন্য কোনও স্থানে যাইবাব আবশ্যক হয় না। এই উত্থান হইতেই সমস্ত পাওয়া যায়।

বাগানেব প্রথমেই কদলী শ্রেণী। অগণিত কদলীবৃক্ষ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কোনটাতে বা অর্দ্ধ-পক্ক সুদীর্ঘ কাঁদি বিলম্বিত, কোনটাতে বা সবেমাত্র মোচা উদ্ভূত হইতেছে, আবার কোনটাতে বা ছোট ছোট কদলী-গুলি সবেমাত্র বহির্গত হইয়াছে। এই কদলীশ্রেণী দেখিয়া আমাদের অযত্ন রক্ষিত উত্থানের কথা মনে পড়িয়া গেল।

তারপর পেঁপিয়া শ্রেণী। দেখিলাম অগণিত পেঁপিয়া

বৃক্ষ সকল ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে। সমস্ত বৃক্ষেরই ফলগুলি বৃহদাকার ও সুডৌল।

পেঁপিয়া সারির পর—পেয়ারার নিবীড় শ্রেণী পরিলক্ষিত হইল। নীবিড় হইলেও তাহা এত শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে রোপিত যে, একটীর পরে আর একটী তার পর একটী বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। পেয়ারা বৃক্ষের পর ডালিম ও লেবুর গাছ সকল দেখিতে পাইলাম। প্রত্যেক গাছেই অপর্য্যাপ্ত ফল ধরিয়া রহিয়াছে। কোনও গাছ অনর্থক দাঁড়াইয়া নাই।

উদ্যান মধ্যে ফুলকপি, বাঁধাকপি ইত্যাদিও প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাইলাম।

মধ্যে মধ্যে যে স্থানে একটু ফাঁকা বলিয়া বোধ হইয়াছে, সেই স্থানেই করবী শ্রেণী রোপিত হইয়াছে। শ্বেত লোহিত প্রভৃতি নানাবর্ণের ফুলে শোভিত হইয়া সেই করবী বৃক্ষগুলি উদ্যান সৌন্দর্য্য যেন শতগুণ বৃদ্ধি করিতেছিল।

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য নানাবিধ ফুলের গাছও সেই উদ্যানে আছে। ভগবৎ অর্চ্চনায় যাহা কিছু আবশ্যক সেই সমস্তই এই খানে রোপিত হইয়াছে।

উদ্যান শোভা দেখিয়া বাস্তবিকই আমি মোহিত হইলাম। ভাবিলাম কোন মালি এই উদ্যান রচিত করিয়াছেন?

সার্থক তাঁহার জন্ম—সার্থক তাঁহার পরিশ্রম—সার্থক তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা! উদ্যানটী মোট বিশ বিঘা হইবে।

উদ্যান অতিক্রম করিয়া আমরা আর একটী তোরণ-দ্বারে আসিলাম। এই তোরণদ্বারের পরই বিদ্যালয়ের অফিস গৃহ। সেই স্থানে দেখিলাম কয়েকজন পঞ্চদেশবাসী বসিয়া অফিসের কার্য্যাদি সম্পন্ন করিতেছেন। সকলেরই সম্মুখে এক একটী বাক্স। ইহারা কেহ বা ধনাধ্যক্ষ—কেহ বা হিসাব পরীক্ষক—কেহ বা কেরাণী—কেহ বা অধ্যক্ষ। সকলেই নিবিষ্ট মনে আপন আপন কার্য্য করিতেছিলেন। আমরা অফিস গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র যে প্রকার সমাদরের সহিত তাঁহারা সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন, তাহাতে বাস্তবিকই আমরা মনে মনে একটু কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলাম। "বাঙ্গালী বাবু" "কলিকাতা হইতে আসিতেছি" এই পরিচয়ে তাঁহারা যেন কত পরিচিতের ন্যায় আমাদের সহিত বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই অমায়িকতা ও সৌজন্য জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না।

কথোপনান্তে আমরা বিদ্যালয় দেখিবার বাসনা প্রকাশ করিলাম। কিন্তু তাঁহারা সে কথা কর্ণেই তুলিলেন না। যখন শুনিলেন যে, আমরা এত বেলা পর্য্যন্ত অভুক্ত এবং

পরিদর্শন শেষ করিয়া বাসায় যাইয়া খাইবাব সঙ্কল্প করিয়াছি —তখন তাঁহারা একেবারে বাঁকিয়া বসিলেন। আমাদিগকে না খাওয়াইয়া তাঁহারা কিছুই কবিবেন না এই প্রকার মনোভাব প্রকাশ করিলেন। তাঁহাদের সেই আতিথেয়তার কথা ভাবিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম;

তখন আশ্রমের আহারাদি শেষ হইয়া গিয়াছে। পাচক ব্রাহ্মণ ও ভৃত্য সমূহ বিশ্রাম কবিতেছে। কিন্তু তখনই সেই স্থানে সংবাদ প্রেরিত হইল—এবং তৎক্ষণাৎ আমাদের আহার্য্য প্রস্তুত হইয়া গেল। মাতুল এতক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া আমার পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। যখন শুনিলেন যে, আমাদের আহার্য্য প্রস্তুত হইয়াছে, তখন তিনি আমাব কর্ণে চুপি চুপি বলিলেন—"দেখ বাবা! ইহাদের অতিথি সৎকার বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। আমাদেব কলিকাতায় ত কেহ কাহার জন্য এই প্রকার আগ্রহ প্রকাশ কবে না। আমার ইচ্ছা হয়, কলিকাতার লোকগুলাকে এখানে আনিয়া একবার দেখাইয়া লইয়া যাই। তাহারা ইহাদেব কাছে আসিয়া অতিথি সৎকার কাহাকে বলে শিক্ষা করিয়া যাক্। কি বল বাবা—ইহাদের ব্যবস্থা বড়ই সুন্দর নয় কি?

আমি মনে মনে ভাবিলাম মাতুলের জঠরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং এই প্রকার প্রস্তাব তাঁহার নিকট

যে এখন কতদূর মনোরম হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। আমি স্মিতমুখে বলিলাম—"হাঁ! ইহাদের ব্যবস্থা অতি চমৎকার। তুমি এখন একটু স্থির হও।"

এই কথায় বোধ হয় মাতুলের বক্তৃতা অনলে জল পড়িল—কেন না তিনি আর কোন কথা না বলিয়া একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিলেন।

তারপর আমরা ভোজনালয়ে আসিলাম। আহার্য্য অতি সামান্য—ঘৃতপক্ক ভাত, ডাল, সামান্য শাকভাজী ও একটা কপির তরকারি, তারপর একখানি রুটি ও কিঞ্চিৎ শর্করা এবং দুগ্ধ।

আহারে বসিয়া প্রথম গন্ধেই আমার প্রাণমন বিভোর হইয়া গেল। যখন ভাতের পাত্র হইতে হাতা করিয়া ভাত তুলিয়া আমাদের পাতে দিতেছিল—সেই সময় পাত্র হইতে উদ্গত ঘৃতের মধুর গন্ধে সেই স্থান আমোদিত করিয়া তুলিতেছিল। শুনিয়াছিলাম যে ঋষিপ্রদত্ত হবির গন্ধে দেবকুল ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন। আমরা দেবতা নহি, সামান্য মানব মাত্র। সুতরাং সে মধুর গন্ধে আমাদের কি ভাবান্তর উপস্থিত হইতে পারে পাঠক। তাহা অনুমান করিয়া লউন। এ প্রকার ঘৃতের মধুর গন্ধ আমি জীবনে কখনও আঘ্রাণ করি নাই। তারপর আতপ চাউল সেই ঘৃতে সুপক্ক হইয়া যেন অমৃতোপম হইয়াছে।

ডাউলের কথা আর কি বলিব। ডাউল খাইয়া বোধ হইল যেন মাখন খাইতেছি। এরূপ অপূর্ব্ব বন্ধন প্রণালী কখনও দেখি নাই। আমাব রুগ্ন শবীব, কিন্তু তবুও আমি অর্দ্ধেক ভাত, ডাল ও অর্দ্ধখানি রুটী খাইয়াছিলাম, কিন্তু মতুলেব দিকে চাইয়া দেখিলাম যে, তিনি চাবিটি অন্ন গণ্ডুষেব জন্য বাখিয়া সমস্ত উদবসাৎ কবিয়াছেন। হায ক্ষুধা। তুমি মানুষকে ক্রীতদাস কবিতে পাব সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আমি মাতুলেব মজা দেখিবাব জন্য জিজ্ঞাসা কবিলান "মাতুল! আব কিছু লইবে কি?

অতি কষ্টে তিনি বলিলেন—"আব কিছু না বাবা। এখন উঠিতে পারিলে বাঁচি। আমাব উদবে আব তিল ধাবণেব স্থান নাই।"

আমি মাতুলেব স্বভাব জানিতাম। যিনি ভোজনেব পবও দুইসেব খাবাব খাইয়া থাকেন—তাঁহাকে এই প্রকাব বলিতে দেখিয়া আমি তিলমাত্র বিস্মিত হইলাম না।

এই বিদ্যালয়ে কোনও আহারীয় দ্রব্য বাজাব হইতে ক্রয় কবা হয় না। ক্ষেত্রোৎপন্ন গোধুম, চাউল, ডাউল তবিতবকাবী, বিদ্যালয় সংলগ্ন গো-শালাব গাভীবৃন্দেব দুগ্ধ এবং উদ্বৃত্ত দুগ্ধ হইতে ঘৃত, মাখন ইত্যাদি ছাত্রদিগের জন্য কাপড়, জামা প্রভৃতি সমস্তই আশ্রমে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এই প্রকার স্বাবলম্বন কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। গুরুকুল বিদ্যালয় কোন বিষয়েই কাহারও মুখাপেক্ষী নহে। এই সমস্ত কথা শুনিয়া আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের স্বচ্ছন্দ বনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে" কথা মনে পড়িয়া গেল। তাঁহারা কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতেন না। নবদ্বীপের সেই বিখ্যাত নৈয়ায়িকের কথা মনে পড়িয়া গেল। কেবল মাত্র ভাত ও কুটীরসংলগ্ন তিন্তিড়ি বৃক্ষের পাতা সিদ্ধই তাঁহাদের স্বামী ও স্ত্রীর আহার্য্য ছিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যতবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আপনার কিছু অভাব আছে কি না, ততবারই ব্রাহ্মণ উত্তর করিয়াছিলেন যে, না তাঁহার কিছুরই অভাব নাই।

ভোজনান্তে আমরা কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের জন্য অফিস গৃহে আসিলাম। অফিস গৃহের সম্মুখে একটী প্রশস্ত অঙ্গন। সেই অঙ্গনের চতুর্দ্দিকে বাড়ী। ইহাতেই ছাত্রগণ বাস করিয়া থাকে। ইহাকে ছাত্রাবাস বলিতে হয় বল; হোষ্টেল বলিতে হয় বল কিন্তু আমি কিছুই বলিব না। কারণ ছাত্রাবাস বলিলে কথাটার অর্থ ঠিক পরিস্ফুট হইবে না। ছাত্রবাসে বিলাসিতার কোনও চিহ্ন নাই, প্রত্যেক গৃহে একটীমাত্র সামান্য শয্যা—অতি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নভাবে সজ্জিত রহিয়াছে। অন্য আসবাবপত্রাদি

কিছুই নাই। সুতরাং ছাত্রাবাস বলিলে ইহার অমার্য্যদা করা হয় এবং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ইহার একমাত্র আখ্যায়িকা।

ছাত্রাবাস দেখিয়া আমরা গুরুকুলের বিদ্যালয় সংলগ্ন আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় দেখিতে গমন করিলাম।

এই ঔষধালয়ে আসিয়া দেখিলাম একজন বাঙ্গালী কবিরাজ মহাশয় ইহার অধ্যক্ষ এবং পবিচয়ে জানিলাম তাহাব নাম শ্রীনিবাবণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। কবিরাজ মহাশয় অতি উপযুক্ত ব্যক্তি। তিনি শাস্ত্র সঙ্গত নানাবিধ ঔষধাদি প্রস্তুত করিয়া থাকেন। আমাদিগকে অতি যত্নেব সহিত তাঁহাব প্রস্তুত ঘৃত, অরিষ্ট, মোদক, অবলেহ, মকবধ্বজ ইত্যাদি দেখাইলেন। তাঁহার সহকারীবৃন্দ অন্য দেশীয় ব্যক্তি। কবিবাজ মহাশয় বঙ্গদেশবাসী দেখিয়া বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ, তাঁহাকে আমাদিগের পবিদর্শন করাইবার ভারার্পণ করিলেন। তিনিও সন্তুষ্ট চিত্তে আমাদিগকে লইয়া চতুর্দ্দিক ভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

তারপর আমরা ডাক্তাবখানা দেখিতে গমন করিলাম। এই স্থানে নানাপ্রকাব বিলাতী ঔষধাদি ও অস্ত্রশস্ত্র দেখিতে পাইলাম। বোধ হয় যে সমস্ত ব্যাধি কবিরাজীতে উপশম হয় না, তাহা এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় আনা হয়। ডাক্তারখানার বন্দোবস্ত অতি সুন্দর। ডাক্তারখানার পর হাঁস-

পাতাল, হাঁসপাতালটী বেশ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। আমরা দেখিলাম যে, হাঁসপাতালে পাঁচজন রোগী অবস্থিতি করিতেছে। তারপর "ষ্টোর" দেখিতে গমন করিলাম ষ্টোরে যাহা কিছু আবশ্যকীয় দ্রব্য সমস্তই সংরক্ষিত হইয়াছে। ষ্টোরের পরই দর্জ্জিবিভাগ। এই স্থানে বেতনভোগী দর্জ্জী আছে,তাহারা ষ্টোর হইতে কাপড় লইয়া বালক ও সন্ন্যাসীদিগের জন্য জামা তৈয়ারী করে।

অতঃপর আমরা ছাত্রদিগের ভোজনালয় দেখিতে গমন করিলাম। এই স্থানটী অতি বৃহৎ এবং দীর্ঘ। ইহা এত পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন যে, এক বিন্দু সিন্দুর পড়িয়া গেলেও তাহা অনায়াসে তুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। ভোজনের পরই গঙ্গাজলে ইহা ধৌত করা হইয়া থাকে।

পাকের নানাবিধ পাত্রাদি এক স্থানে পরিমার্জ্জিত হইয়া রহিয়াছে দেখিলাম। বড় বড় পিতলের হাণ্ডা সমুহ—এত সুন্দররূপে পরিষ্কার করা হইয়াছে যে, দুর হইতে দেখিলে হঠাৎ সুবর্ণের বলিয়া ভ্রম জন্মে। এরূপ পরিপাটী রূপে পাত্রাদি পরিষ্কার করা ইহজীবনে কখনও দেখি নাই। হাতা, বেড়ী, খুন্তি, কড়াই ইত্যাদি প্রত্যেক তৈজসটীই অতি সুন্দররূপে পরিমার্জ্জিত হইয়াছে। সবগুলিই চাকচিক্যে ঝক্ ঝক্ করিতেছে। আমি বিদ্যালয়ের ছোট ছোট বালক-

দিগকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। অল্পবয়স্ক এই প্রকার ঋষিসন্তানসদৃশ বালকবৃন্দ আব কোথাও দেখি নাই। তাহাবা সেই অল্প বয়সেই বিনয়ী—অমায়িক ও মধুব প্রকৃতি বিশিষ্ট হইয়াছে। আমি গণনা করিয়া দেখিলাম—তাহারা সংখ্যায় প্রায় ছত্রিশ জন হইবে।

আমরা যখন গুরুকুল বিদ্যালয়ে গমন করিয়াছিলাম, তখন ইহার ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩৫০ জন। ইহার ভিতর অধিকাংশই পঞ্চদেশ ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলবাসী। কেবল একজন মাত্র বাঙ্গালী ছাত্রকে দেখিয়াছিলাম। তিনশত পঞ্চাশের ভিতর একজন বাঙ্গালী ছাত্রকে দেখিয়া আমার মনে বড়ই ক্ষোভ হইয়াছিল। আমবা এতই অধঃপতিত হইয়াছি যে, এই প্রকার বিদ্যামন্দিরে আমাদিগেব বালক-বৃন্দকে প্রবেশ করিতে না দিয়া তাহাদিগকে কদাচার শিক্ষা করিতে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকি। বাঙ্গালীর এই ঘোর দুর্দ্দিনে নৈতিক শিক্ষাই প্রথম আবশ্যকীয় হইয়া পড়িয়াছে। অন্তঃসারশূন্য শিক্ষায় মনুষত্ব ফুটিয়া উঠে না—কেবলমাত্র ভারবাহী রাসভদলের সংখ্যা বৃদ্ধি করে মাত্র।

মহাত্মা মুন্সীরাম এই বিদ্যালয়ের স্থাপনকর্ত্তা। তাঁহারই উদ্যোগ যত্ন ও পরিশ্রমে ইহা স্থাপিত হইয়াছে। যে মহা-পুরুষ এই প্রকার প্রাণপাত করিয়া—ত্যাগ স্বীকার করিয়া,

এই চিরস্মরণার কীর্ত্তিমন্দির স্থাপিত করিয়াছেন তিনই ধন্য। প্রত্যহ প্রাতে এই মহাপুরুষের নামোচ্চারণ করিলে—দিন পবিত্র হয় এবং নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া যায়। তারপর লাইব্রেরী দেখিতে গমন করিলাম। নানাবিধ পুস্তকরাজি তথায় অতি যত্নের সহিত সংরক্ষিত আছে। বড় বড় সুদৃশ্য আলমারী সমূহে সেই কক্ষ সুশোভিত। যদিও তথায় বৈদ্যুতিক আলোক নাই—মেহগিণীর সেল্ফ নাই—আরামচেয়ার নাই—মেজেতে কার্পেট নাই—তত্রাচ সেই সুসজ্জিত গৃহ দেখিলে মনে হয় বিদ্যা মন্দিরের উপযুক্ত ইহাপেক্ষা সুন্দর লাইব্রেরী গৃহ আর হইতে পারে না।

লাইব্রেরী গৃহে আর্য্যসমাজের প্রবর্ত্তক স্বামী দয়ানন্দের একখানি তৈলচিত্র আছে। স্বামীজীর গুরু বিরজানন্দ প্রভৃতি অনেক মহাত্মার তৈল চিত্রও এই গৃহে সুসজ্জিত রহিয়াছে।

এই প্রশস্ত ভূমিখণ্ড যাহার উপর এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইযাছে—তাহা মুন্সী আমন সিং কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। এই প্রকার দানই স্বাত্ত্বিক দান। ধন্য এই মহাপুরুষ যিনি এই প্রকার আদর্শ ত্যাগ স্বীকার দেখাইয়াছেন।

তারপর আমরা কলেজ বোর্ডিং, স্কুল বোর্ডিং প্রভৃতি দর্শন করিয়া স্নানাগার অভিমুখে গমন করিলাম। স্নানাগার

সে এক বিরাট ব্যাপার। "ঘটি যন্ত্রে" কূপ হইতে জল উত্তোলন করা হয়। প্রত্যহ রাত্রি ৪ ঘটিকার সময় প্রত্যেক সন্ন্যাসী, শিক্ষক ছাত্র, ভৃত্য সকলকেই স্নান করিতে হয়। এই নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। অত ভোরে শীতের সময় বোধ হয় গঙ্গায় স্নান করা স্বাস্থ্যসঙ্গত নহে বলিয়াই এই ব্যবস্থা হইয়াছে।

স্নানের পর—পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে রক্ষিত শুষ্ক বস্ত্র সমুহ পরিধান করিয়া বেদ গান করিতে করিতে সকলেই যজ্ঞ-শালার অভিমুখে গমন করেন।

হরিদ্বাবে রাত্রি ৪ ঘটিকার সময় গুরুকুল বিদ্যালয়ের বালকবৃন্দ স্নান কবিয়া থাকে। তারপর ব্রহ্মমূহুর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহারা স্তোত্র পাঠ ও ভগবানের আরাধনা করে। আমা-দের দেশের শিক্ষিত সমাজ এই বিষয় কল্পনায়ও আনিতে পারিবেন না। তাহার কাবণ বাঙ্গালী এখন অধঃপতিত? বাঙ্গালী কতদুর অধঃপতিত হইয়াছে তাহা আর বিশদ করিয়া বলিব কি? বাঙ্গালী এখন প্রাতে ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত নিদ্রার সুকোমল ক্রোড়ে অঙ্গ ঢালিয়া থাকে। সমস্ত রাত্রি হয়ত অনিয়ম অত্যাচার করিয়া প্রত্যুষে শয্যা গ্রহণ করে। তারপর পরিজনবর্গ "চা হইয়াছে" বলিলে বাঙ্গালী ৮ ঘটিকার সময় শয্যা ত্যাগ করে। গঙ্গার ঘাটে অতি প্রত্যুষে গমন

কর, একজন বাঙ্গালী স্নানার্থী দেখিতে পাইবে না! বাঙ্গালী তখনও নিদ্রার সুকোমল ক্রোড়ে শায়িত। সুতরাং বাঙ্গালীর অকালমৃত্যু হইবে না'ত কোন জাতির হইবে?

বড়ই দুঃখের সহিত এই কথাগুলি বলিতে হইল, কিন্তু ইহা ধ্রুব সত্য। কয়জন বাঙ্গালী প্রত্যহ সূর্য্যোদয় দর্শন করিয়া থাকেন বলুন দেখি? এই অনিয়ম ও অত্যাচারে কি বাঙ্গালী দিন দিন অবনতির নিম্নস্তরে গমন করিতেছে না! প্রভাতের নির্ম্মল বায়ু সেবনে শরীর উন্নত হয়, স্বাস্থ্য অটুট থাকে। কিন্তু আমরা অনুকরণ করিতে গিয়া কেবল মন্দেরই অনুকরণ করিতেছি—ভালগুলি পরিত্যাগ করিতেছি। আদর্শ নাই—আদর্শ হারাইয়াই বাঙ্গালী আজ এই অধঃপতনের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

স্নানাগার দেখিয়া গুরুকুলের ধর্ম্মশালা দেখিতে গমন করিলাম। এই ধর্ম্মশালায় সমবেত অতিথিদিগকে ত্রিরাত্র অবস্থিতি করিতে দেওয়া হয়। স্থানীয় অধিবাসীরা অধিকাংশ দরিদ্র ব্যক্তি। ইহাদের অসুখ বিসুখ হইলে কে দেখিবে ইহা ভাবিয়া গুরুকুল এক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত করিয়াছেন। এই দাতব্য চিকিৎসালয়ের ব্যবস্থাও অতি সুন্দর এবং ইহার ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার মহাশয়

অতি অমায়িক ব্যক্তি। তিনি অতি যত্ন সহকারে সমাগত রোগীদিগকে দেখিয়া ব্যবস্থা প্রদান করিয়া থাকেন।

দাতব্য চিকিৎসালয় দর্শন করিয়া আমরা গো-শালা অভিমুখে গমন করিলাম। আমরা ঋষিকুলের গো-শালা সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তদপেক্ষা এখানকার বন্দোবস্ত আরো সুন্দর—আরো উৎকৃষ্ট। অনবরতঃ সেবকেরা গাভী-গুলির পরিচর্য্যা করিতেছে। পুরীষ ত্যাগ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা পরিষ্কার করিয়া দিতেছে, কিম্বা মূত্র ত্যাগ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা মুছিয়া দিতেছে। গাভীর স্থানগুলি এত পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন—দেখিলে মনে হয় যেন প্রত্যেক গাভী স্বর্ণ-সিংহাসনের উপর শয়ন করিয়া আছে। গাভীগুলি প্রত্যেকেই প্রচুর দুগ্ধবতী। আমরা গণনা করিয়াছিলাম তখন সেই স্থানে ৬৪টী গাভী ছিল। প্রত্যেক গাভীই ৪ সের হইতে ৮ সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ প্রদান করিয়া থাকে।

তারপর আমরা যজ্ঞশালা দেখিতে গমন করিলাম। এইস্থানে বালকগণ প্রাতে ও সন্ধ্যায় যজ্ঞাদি করিয়া থাকে। যজ্ঞশালার স্থানে স্থানে হোম করিবার জন্য গহ্বর রহিয়াছে। যজ্ঞশালাটীও অতি সুন্দর। আমি যখনই যজ্ঞশালায় উপস্থিত হইলাম—তখনই এক প্রকার কমনীয় গন্ধে মনঃ প্রাণ বিভোর হইয়া উঠিল। আমি সেই স্থানে

বসিয়া পড়িলাম। আমার আর অন্যস্থানে যাইবার সামর্থ্য হইল না।

ক্রমশঃ বেলা অবসান হইয়া আসিল। বাহিরে গাড়ী আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। আবার সুদীর্ঘ পথ ফিরিয়া যাইতে হইবে, এই ভাবনায় হৃদয় কাতর হইয়া উঠিল। আমার ইচ্ছা হইতেছিল না যে, সেই স্থান পরিত্যাগ করি। কিন্তু কি করিব উপায় নাই! যজ্ঞশালা সম্বন্ধে কত কথা ভাবিতে ভাবিতে গাড়ীতে গিয়া বসিলাম।

গাড়ীতে উঠিয়া প্রথমে বেশ আরামে গমন করিতেছিলাম। কিয়দ্দূর আসিয়া রাস্তার উপরিস্থিত প্রস্তরখণ্ডে বাধা পাইয়া ঘোড়া আর গাড়ী টানিতে সক্ষম হইল না। গাড়োয়ানের সহস্র কশাঘাতে ও গালাগালিতেও অশ্বিনীকুমার একপদ অগ্রসর হইতে পারিল না। তখন শকটচালক আমাদের বিরক্তির আশঙ্কা করিয়া সেই ঘোড়াশুদ্ধ গাড়ী টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। বেচারীর দুর্দ্দশা দেখিয়া আমাদের কষ্ট হইতে লাগিল, অগত্যা আমরা গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে চলিতে লাগিলাম।

তারপর প্রায় অপরাহ্নে আমরা ক্লান্ত দেহে বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গৃহিনী এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার আশাপথ পানে চাহিয়া ছিলেন, তাঁহার প্রশ্নের পর প্রশ্ন

জবাবদিহী করিয়া আমার শরীরে আরও ক্লান্তি বোধ হইতে লাগিল। যাহা হউক কথাবার্ত্তা শেষ হইবার পর আমি বলিলাম—"অত্য গুরুতর আহার হইয়াছে, আজ আর রজনীতে কিছু আহার করিবার অবশ্যকতা নাই। কি বল মাতুল! বাজার হইতে সামান্য জলখাবার আনিলেই চলিয়া যাইবে।"

আমার এই কথা শুনিয়া মাতুল একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। তাঁহার "মাটীকে" সম্বোধন করিয়া বলিলেন:—"জামাই অধিক আহার করিয়াছেন—অতএব তাঁহার রাত্রে কিছু না খাইলেও চলিবে। আমি যাহা আহার করিয়াছিলাম, রাস্তায় আসিতে আসিতে তাহা হজম হইয়া গিয়াছে। আমার পেটে এক্ষণে দাবানল জ্বলিতেছে, ঘরে কিছু এখন আছে কি মা?"

আমি তাহাকে আরও রাগাইবার জন্য বলিলাম, "দেখ মাতুল—পেটটা তোমার—আহারীয়টা না হয় অপরের, তাহার জন্য না হয় মায়া মমতা না হইতে পারে, কিন্তু নিজের উদরের দিকে একটু দেখিও। তুমি যাহা আহার করিয়া আসিয়াছ, তোমার এখন ত্রিরাত্র কিছুই আহার করা উচিত নহে। অক্ষুধায় উপর জোর করিয়া খাইও না, অসুখ হইবে। তারপর বিদেশে কি আমার

একটা বিপদে ফেলিবে? আজ আর রাত্রে কিছু ভোজন করিও না।" .

মাতুল তখন একেবারে হাল ছাড়িয়া বসিলেন। দেখিলেন আমি রহস্য করিতেছি না—গম্ভীরভাবে এই কথাগুলি বলিলাম। তখন তিনি কাতর দৃষ্টিতে গৃহিনীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, কথাবার্ত্তায় সন্ধ্যা হইল। রাত্রে একবার বাজার ভ্রমণ করিয়া আসিলাম। বাজারের বিষয় বিশেষ কিছু বলিবার নাই।

রাত্রে আসিয়া বাসায় শুইয়া শুইয়া রজনীর সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য রাশি দেখিতে লাগিলাম। সে দিন শুক্ল পক্ষের অষ্টমী। উপরে চন্দ্রদেব স্নিগ্ধ রজত কিরণ বর্ষণ করিতেছেন, আর সেই কিরণে গঙ্গার চতুপার্শ্বস্থ বালুকা রাশি সমুদ্রবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল, যদিও তাহাতে বীচিবিক্ষোভ নাই—তরঙ্গভঙ্গ নাই—ভীম জলগর্জ্জন নাই—কিন্তু সেই ধূ ধূ বালুকারাশি জোৎস্নায় মণ্ডিত হইয়া বিশাল সমুদ্রের ভাব মনে উদিত করিতেছিল।

আমি মুগ্ধ হইয়া গঙ্গার দিকে চাহিলাম। শত সহস্র প্রদীপ নক্ষত্রের ন্যায় গঙ্গাবক্ষে শোভা পাইতেছে। ঊর্দ্ধে অগণিত তারারাশি—গঙ্গাবক্ষে এই অপরূপ আলোকমালা হরিদ্বারের প্রাকৃতিক দৃশ্যকে আরও মহান

—আরও সুন্দর—আরও শোভনীয় করিয়া তুলিয়াছিল।

অদূরে সুদীর্ঘ পর্ব্বতশ্রেণী গর্ব্বে মস্তকোত্তলন করিয়া দণ্ডায়মান আছে। তাহাদের শীর্ষদেশেও অমল ধবল জ্যোৎস্নাকিরণ প্রতিভাত হইতেছে। মাঝে মাঝে নৈশ সমীরণ—গঙ্গার শিকর সম্পৃক্ত হইয়া সেই বৃক্ষরাজিকে মৃদু মৃদু আন্দোলিত করিতেছিল।

তখনও ব্রহ্মকুণ্ডে দলে দলে লোক স্নান করিতেছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি স্নানার্থীর বিরাম নাই। দিবারাত্র সমানভাবে লোকে গঙ্গাসলিলে অবগাহন স্নান করিয়া থাকে।

পাহাড়ীয়াদিগের কুটীর হইতে ক্ষীণ আলোকরশ্মি দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। দূরে বহু দূরে সেই কুটীরগুলি অবস্থিত। তত্রাপি এত দুর হইতেও তাহাদের কুটীরস্থিত আলোকরাশি দূরগগনে নক্ষত্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল।

তখনও দুই একটী পাহাড়ীয়া দেখা যাইতেছিল। যাহাদের পণ্যসম্ভার বিক্রীত হইতে বিলম্ব হইয়াছে, তাহারা এখন বাড়ী ফিরিতেছিল। সমস্ত দিবস অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে—পর্ণকুটীরে এতক্ষণ তাহার জন্য হয়ত তাহার স্ত্রী, পুত্রকলত্র আশাপথ পানে চাহিয়া বসিয়া আছে—তাই সে-চারী প্রায় দৌড়াইতে দৌড়াইতে পর্ব্বতের দিকে যাইতে-

ছিল। জ্যোৎস্নালোকে তাহাদিগের দ্রুতগমন ও একটা ব্যাকুলভাব বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। বহুক্ষণ ধরিয়া এই অপূর্ব্ব শোভারাশি নিরীক্ষণ করিয়া—আহারাদি সমাপনান্তে শয্যা গ্রহণ করিলাম।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ঠিক রাত্রি চারি ঘটিকার সময় সেই অন্ধের মধুর "রাম নাম" শব্দে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। জানালা খুলিয়া দেখি অন্ধ অনবরত "রাম রাম" শব্দ করিতে করিতে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিতে চলিয়াছে এবং তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অগণিত সাধু সন্ন্যাসী দলে দলে গমন করিতেছে। দেবালয়ে দেবালয়ে ভৃত্যেরা জাগরিত হইয়াছে। পুরোহিত ঘৃত প্রদীপ দ্বারা মাঙ্গলিক আরতি আরম্ভ করিয়াছেন। এক অন্ধের দ্বারা মুহূর্ত্তমধ্যে সেই হরিদ্বারের বিশাল জনসঙ্ঘ যেন জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে।

স্নানান্তে অন্ধ ঠিক নিরস্থানে আসিয়া উপবেশন করিল। সেই একই স্থানে সে প্রত্যহ উপবেশন করে—তাহার আর অন্য স্থান নাই। গঙ্গার উপর একটা সমতল স্থানই তাহার নির্দ্দিষ্ট আসন। অন্ধের এই মধুর "রাম নাম ধ্বনি" শুনিয়া

ও হরিদ্বারের এই "সুপ্তোত্থিত" ভাব দেখিয়া আমার মনে যে আনন্দ হইয়াছিল—তাহা বহুদিন উপভোগ করি নাই।

আমি এইরূপে অনেকক্ষণ অতিবাহিত করিয়া পরে প্রভাত হইলে গঙ্গায় আসিয়া মুখাদি প্রক্ষালন করিলাম। এই স্থানে একটী পরিচিত সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। এই সন্ন্যাসী—দেখিতে প্রকৃত সাধুর ন্যায়। মণ্ডিত মস্তক গেরুয়া বস্ত্রধারী—পদদ্বয় কাষ্ঠ পাদুকায় আবৃত—হস্তে দণ্ড এবং কমুণ্ডলু। সন্ন্যাসী কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করেন না। তাঁহার মুখে কোনও বাক্য নাই। লোক দেখিলেই কেবল কমুণ্ডলুটী হাত বাড়াইয়া ধরেন। আমি এই সন্ন্যাসীকে বহুবার দেখিয়াছিলাম।

হরিদ্বারে বহু সাধু সন্ন্যাসী আছেন। যাঁহারা আসল সাধু তাঁহারা সাধারণতঃ লোকের নিকট কিছুই প্রার্থনা করেন না। এমন কি লোকালয়ে তাঁহাদিগকে খুব অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। আর যাহারা "পেশাদারী সাধু" তাহারাই হরিদ্বারের সর্ব্বত্র ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। এই সন্ন্যাসী আমাদের বাসায় এক দিবস ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল। আমি তখন শুইয়াছিলাম। সে আসিয়া ক্রমাগত গৃহের ভিতর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সর্ব্বত্র দেখিতেছিল। আমি গৃহিনীকে ডাকিয়া বলিলাম যে "ইহাকে কিছু পয়সা ভিক্ষা

দাও।" গৃহিনী ভিক্ষা দিয়া আসিয়া বলিলেন—"দেখ লোকটার চাহনী কেমন ভয়ঙ্কর। সন্ন্যাসী কখনই প্রকৃত সাধু নয়।"

আমি বলিলাম—"তোমার এক কথা। হরিদ্বারে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আসিয়া বাস কবিতেছে। মুণ্ডিত মস্তক—পরিধানে গেরুয়া বস্ত্র—হস্তে দণ্ড কমুণ্ডলু—আর তুমি কিনা বলিলে লোকটা প্রকৃত সাধু নয়। এমন কথা মুখে আনিও না। ইহারা কি ভাবে লোকালয়ে আইসেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না। আমার ত সন্ন্যাসীকে দেখিয়া প্রকৃত ভক্তি হইয়াছে।"

সে দিবস আর ও সম্বন্ধে কোনও কথাবার্ত্তা হইল না। বকালে আমরা ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলাম। আসিবার সময় পথিমধ্যে আমাদিগের নিকট জন কয়েক সন্ন্যাসী ভিক্ষা প্রার্থনা করিল। আমরা সকলকেই কিছু কিছু ভিক্ষা প্রদান করিলাম। এক জনের মুখের দিকে চাহিয়া দেখি—সেই প্রাতের সন্ন্যাসী। তাহাকে একবার ভিক্ষা দিয়াছি, সুতরাং তখন আর তাহাকে কিছুই প্রদান করিলাম না।

ভিক্ষা প্রদান করিয়া কিয়দ্দূর চলিয়া আসিয়াছি, হঠাৎ পশ্চাতে কোলাহল শ্রবণ করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলাম।

দেখিলাম সেই সন্ন্যাসীদিগের ভিতর ঝগড়া হইতেছে। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য আমরা পুনরায় সেই দিকে অগ্রসর হইলাম।

দেখিলাম আমার সেই পরিচিত সন্ন্যাসীর সহিত অন্যান্য সন্ন্যাসীর বচসা হইতেছে। একজন সন্ন্যাসীকে ইহার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিতে সে বলিল—"বাবু! এই সাধু অতিশয় অসচ্চরিত্র—আপনার সে সব কথা শুনিবার আবশ্যক নাই।"

সন্ন্যাসীর মুখে এই কথা উচ্চারিত হইতে শুনিয়া সেই লোকটা একবার আমাদের দিকে চাহিল। তাহার দৃষ্টিতে আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। গৃহিনী আবার বলিলেন :—"দেখিলে—আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি—সাধু ভণ্ড সন্ন্যাসী এখন আমার কথায় বিশ্বাস হইল ত ?"

আমার মন তখনও সন্দেহদোলায় দুলিতেছিল, আমি কিছুই সদুত্তর না দিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

অন্ধ অন্ধের এই মধুর "রামনামে" জাগ্রত হইয়া তারপর নানাবিধ শোভা সম্পদ দেখিয়া প্রাণে বড়ই আনন্দ হইয়াছিল। হঠাৎ এই সন্ন্যাসীকে দেখিয়া আমার কেমন ভাবান্তর উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসী আমায় দেখিতে পায় নাই, আমি তাহাকে দ্রুত চলিতে দেখিয়া তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিলাম।

সন্ন্যাসী লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া চলিল। এইরূপে প্রায় দুই মাইল অতিক্রম করিয়া সে একটী পর্ব্বতমালার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি রাস্তায় যাইতে যাইতে হঠাৎ বেশ পরিবর্ত্তন করিয়াছিলাম। স্কন্ধের উত্তরীয়খানি দ্বারা মস্তকে এক প্রকাণ্ড পাগড়ী বাঁধিয়াছিলাম।

সেই সন্ন্যাসী হঠাৎ একবার পশ্চাতে দেখিয়া পর্ব্বতারোহণ আরম্ভ কবিল। আমিও ক্রমশঃ তাহাকে অনুসরণ করিতে লাগিলাম।

পর্ব্বতের উপব উঠিয়া দেখিলাম অদূবে একটী ছোট পল্লী। পাঁচ সাতখানি পর্ণ কুটীর পাহাড়ের বক্ষের উপর সারি সারি নির্ম্মিত হইয়াছে। কুটীরগুলি অতি ক্ষুদ্র, কায়ক্লেশে ইহার ভিতর বাস করিতে পারা যায়। হঠাৎ আমার মনে আশঙ্কার উদয় হইল। একবার ভাবিলাম যদি সন্ন্যাসী বুঝিতে পারে —আমি তাহার অনুসরণ করিতেছি, হয় ত এখুনি ফিরিয়া আসিয়া আমায় আক্রমণ করিবে। চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিলাম, কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। আমি অন্যমনে সন্ন্যাসীকে অনুসরণ করিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর গমন করিয়া হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, পর্ব্বতের অপর শৃঙ্গে দুইজন শ্বেতাঙ্গ ও একজন বাঙ্গালী উঠিয়াছেন। মনে ভাবিলাম—তবে আর কি—এই ত অন্য লোকও

রহিয়াছে। আমি যেস্থানে ছিলাম—সেখান হইতে তাঁহারা প্রায় দুইশত হস্ত দূরে ছিলেন। আমি দেখিলাম সন্ন্যাসী এই সকল কুটীরের ভিতর একখানিতে প্রবেশ করিল। আমিও অদূরে দাঁড়াইয়া তাহার কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিলাম।

সন্ন্যাসী কুটীরে প্রবেশ করিয়াই প্রথমে তাহার চূড়াধড়া পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিল। পরে একখানি মোটা বস্ত্র কটীদেশে জড়াইল, তারপর এক বাল্‌তী জল লইয়া স্নান আরম্ভ করিল।

আমি যেস্থানে দাঁড়াইয়াছিলাম—সেই স্থান হইতে সন্ন্যাসীর কুটীরের প্রত্যেক স্থান বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। স্নান সমাপনান্তে দেখি সন্ন্যাসীর পার্শ্বে একটী রমণী আসিয়া দাঁড়াইল।

স্ত্রীলোকটী পাহাড়ীয়া, তাহার বয়স আন্দাজ ত্রিশবৎসর হইবে, বেশ হৃষ্টপুষ্ট অঙ্গ সৌষ্ঠব; দেখিলেই মনে হয় এই রমণী অটুট স্বাস্থ্যধনের অধিকারিণী। স্ত্রীলোকটী আসিয়া কি বলিল—প্রথমে বুঝিতে পারিলাম না। তারপর তাহার হস্ত হইতে শুষ্ক বস্ত্র লইয়া সন্ন্যাসী আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ করিল, রমণী কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। ক্ষণিকপরে একখানি পাত্রে অন্নব্যঞ্জন আনিয়া সন্ন্যাসীর সম্মুখে

রক্ষা করিল, সন্ন্যাসী প্রীতিমনে ভোজনক্রিয়া সমাধা করিল।

তখন প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। আমি আর অপেক্ষা করিব কি না ভাবিতেছি—এমন সময়ে দেখি স্ত্রীলোকটী একটী হুঁকা আনিয়া সন্ন্যাসীর হস্তে দিল। হুঁকার নলটী প্রায় এক হস্ত পরিমিত দীর্ঘ। সন্ন্যাসী হুঁকায় মনোনিবেশ করিলে রমণী সেই পাত্রে ভোজন করিতে বসিল। তারপর দেখি সন্ন্যাসী দুই পদ সেই রমণীর পৃষ্ঠদেশে স্থাপিত করিয়া নীরবে ধূমপান করিতেছে। ব্যাপার বুঝিতে আর বাকী রহিল না। বুঝিলাম সন্ন্যাসী এইবার উদর ঠাণ্ডা করিয়া প্রিয়তমার সহিত রহস্যালাপে নিযুক্ত হইলেন। তখন হঠাৎ গৃহিণীর কথা মনে পড়িয়া গেল, ভাবিতে লাগিলাম গৃহিনী ঠিকই বলিয়াছিলেন।

পুরুষের কার্য্য কলাপ পুরুষে দেখিয়া কিছুই বুঝিতে পারে না—কে কোন্ প্রকৃতির লোক। কিন্তু স্ত্রীলোক একবার পুরুষের চাহনী দেখিলেই বুঝিতে পারে এবং তাহার অন্তঃস্থলে পর্য্যন্ত প্রবেশ করে। ভগবান যে এই বিষয়ে স্ত্রীলোকদিগকে বেশী পক্ষপাতিত্ব করিয়াছেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। হিমালয়ের বক্ষের উপর সন্ন্যাসীর

এই প্রকৃত চিত্র দেখিয়া আমার মনে দারুণ ঘৃণা উপস্থিত হইল। হিন্দু ধর্ম্ম বিশ্বাসী, তাই ধর্ম্মপথের পথিক সাধু সন্ন্যাসীদিগকে দেখিলে হিন্দু মস্তক নত করে—এবং যথাসাধ্য ভিক্ষা প্রদান করিয়া থাকে। ধর্ম্মের নাম লইয়া কত লক্ষ লক্ষ পাষণ্ড এই প্রকারে সাধারণের চক্ষে ধূলি দিয়া অসদাচরণ করিতেছে কে তাহার ইয়ত্তা করে। হায়! সন্ন্যাসী তোমরাই কি সেই সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের প্রহরী! এই প্রকার শিক্ষাই কি সাধারণের চক্ষের উপর তোমাদের স্থাপিত করা উচিত!

ভাবিতে ভাবিতে আমার মনে বিজাতীয় ঘৃণা আসিল। যাহাকে ভক্তি করিয়া আসিতেছিলাম—যাহার মনোরম বেশভূষা দেখিয়া প্রকৃতই সাধু বলিয়া বোধ হইয়াছিল—তাহারই এই প্রকার ঘৃণিত আচরণ!

তখন তাহার সেই চঞ্চল চাহনীর কথা মনে পড়িয়া গেল। সে আমাদের বাসায় কেন যে এই প্রকারে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছিল—তাহাও বেশ প্রতীয়মান হইল। আমাদিগকে সে হয় ত নিদ্রামগ্ন মনে করিয়াছিল—এবং সেই অবসরে কিছু অপহরণ করিবার তাহার অভিপ্রায় ছিল। তারপর আমাদের জাগ্রত অবস্থা দেখিয়া সে নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়াছিল। তীর্থস্থানে এই সকল সন্ন্যাসীর সংখ্যাই

বেশী। তীর্থযাত্রীগণ ইহাদের হস্তেই অধিক লাঞ্ছিত হইয়া থাকেন। রমণীদের অঙ্গ হইতে অলঙ্কার অপহরণ—কিম্বা শিশুদিগকে অলঙ্কারের লোভে হত্যা করাই ইহাদের উপ-জীবিকা। সন্ন্যাসী দেখিলেই বিশ্বাস করিতে নাই, অনেকের মস্তকে হয় ত বৃহৎ জটা দেখিতে পাইবেন, কিন্তু তাহার বয়সোপযুক্ত সে জটা হইতে পারে না; তাহা হইলে এই সুদীর্ঘ জটাভার কোথা হইতে আসিল? নিশ্চয়ই পরচুল অব-লম্বনে এই জটা বিন্যাস করিয়াছে। এখন ভক্ত সন্ন্যাসী আর নাই। ভাক্ত সন্ন্যাসী, গৈরিকধারী নানাশ্রেণীর লোক তীর্থ-স্থানে যাত্রীদিগের নিকট হইতে অর্থ আদায় করিয়া থাকে। প্রকৃত সন্ন্যাসী কখনও কখন আসেন এবং অল্পদিন থাকিয়াই চলিয়া যান।

আমাদের ন্যায় পাপতাপদগ্ধ নারকীদের সহিত পাছে সাক্ষাৎ হয় বোধ হয় সেই আশঙ্কায় দেবোপম ঋষি সকল এক্ষণে আমরা যে সকল স্থানে অনায়াসে আসিতে পারি—সেই সকল স্থান ত্যাগ করিয়াছেন। ভক্তের লীলাক্ষেত্র এক্ষণে ভাক্তের তাণ্ডব ভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

আমি সন্ন্যাসীর উপর বিরক্ত হইয়া সেই স্থান পরি-ত্যাগ করিলাম। কিন্তু সন্ন্যাসীর সহিত পাহাড়ে যে পথে আরোহণ করিয়াছিলাম সেই সোজা পথ আমি বহু চেষ্টা-

তেও খুঁজিয়া পাইলাম না। আমি পথভ্রষ্ট হইয়া জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিতে লাগিলাম।

বহুক্ষণ এই প্রকারে ঘুরিয়াও আমি বাহিরে যাইবার কোনও পথ দেখিতে পাইলাম না। কেবলই অরণ্য কেবলই পাহাড়! আমার পদদ্বয় ক্রমে অসাড় হইল—আমি ক্লান্ত হইয়া একটী উপলখণ্ডের উপর আসিয়া উপবেশন করিলাম। বহুক্ষণ বিশ্রামে আমার অনেকটা শ্রান্তি দুর হইল বটে, কিন্তু তখন পিপাসায় আমার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, বোধ হয় এককলসী জল পাইলে আমি তখন পান করিতে পারিতাম।

পাহাড় হইতে অবতরণ করিবার মানসে আবার আমি উঠিলাম। বহুক্ষণ ঘুরিতে ঘুরিতে এক স্থানে আসিয়া দেখিলাম যে, উহা বিদীর্ণ করিয়া রেলপথ চলিয়া গিয়াছে! সেই স্থানটী অন্ধকারময়। হরিদ্বারে আসিবার সময় এই স্থান অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। মনে একটু সাহসের সঞ্চার হইল। অদূরে চাহিয়া হরিদ্বারের গঙ্গা দেখিতে পাইলাম। তারপর হরিদ্বারের প্রত্যেক অট্টালিকা সমূহ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। কিন্তু সেই স্থান হইতে নগরীর প্রত্যেক অট্টালিকা ছোট ছোট মন্দিরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। গঙ্গার ধারে চাহিয়া দেখিলাম অগণিত উষ্ট্রশ্রেণী চলিয়াছে—কিন্তু তাহারা যেন মেষপালের ন্যায় ক্ষুদ্র। বড়

বড় বৃক্ষরাজিও অতি ক্ষুদ্রাকার দেখিতে পাইলাম। আমার দেহ তখন অবসন্ন—শ্রান্ত ও ক্লান্ত। কিন্তু এই অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া আমার হৃদয়ে আবার নববলের সঞ্চার হইল। প্রাণে যেন একটা নূতন শক্তি পাইলাম। কলিকাতায় অক্টরলোনী মনুমেণ্টের উপর বোধ হয় অনেকেই উঠিয়া থাকিবেন। মনুমেণ্টের উপর উঠিলে কলিকাতা যেন একখানি সরার মত এবং বড় বড় প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকাগুলি অতি ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয়। আজ এই বহুদূরে হিমালয়ের উপরে দণ্ডায়মান হইয়া হরিদ্বারকে সেই প্রকার অবলোকন করিলাম।

শ্রান্তি বিদূরিত হইলে আমি তখন প্রাণপণ শক্তিতে সেই পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিবার নিমিত্ত অরণ্যানী ও উপলখণ্ড ভেদ করিয়া চলিলাম।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

পর্ব্বত হইতে নামিতে নামিতে দেখিলাম যে, একা গাড়ীগুলি যেন ছাগলে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। দীর্ঘাকার ব্যক্তিদিগকে অতি ক্ষুদ্র বামনের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তারপর গঙ্গার দিকে চাহিয়া দেখি কে যেন রৌপ্যের চাদর

দিয়া এক বিস্তৃত শয্যা পাতিয়া দিয়াছে। সেই শয্যা অমল-ধবল কান্তি এবং সুবৃহৎ। ক্রমে যতই অবতীর্ণ হইতে লাগিলাম—দেখিতে পাইলাম উহা ক্রমে ক্রমে ছোট হইয়া আসিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে আন্দোলিত হইতেছে। এই বিরাট সৌন্দর্য্য যাহা উপভোগ করিয়া আসিয়াছি—যাহা দেখিয়া ধন্য ও পবিত্র হইয়াছি তাহা লেখনী সাহায্যে প্রকাশ করা অসম্ভব।

প্রকৃতির লীলা নিকেতন হরিদ্বার। শান্তির চির আবাসভূমি হরিদ্বার। রোগ শোক জ্বালা যন্ত্রণা জুড়াইবার বুঝি এমন স্থান পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। না হইবে কেন? যে স্থান হইতে পুণ্যতোয়া ভাগিরথী উদ্ভূত হইয়াছেন—যে স্থানে বসিয়া ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ বেদবেদান্ত পুরাণ উপনিষদ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—সেই প্রাচীন ধর্ম্মক্ষেত্র হিন্দুর একমাত্র বরেণ্য হইতেই হইবে!

স্বর্গে যে সকল বর্ণনা পুরাণে ইতিহাসে কাব্যে গল্পে শুনা যায়, তৎসমস্তই হিমালয়ে দেখিতে পাওয়া যায়। দেবতাগণ স্বর্গে বাস করেন। স্বর্গ বলিতে যে হিমালয়কে বুঝায়, পুরাণাদি পাঠে ইহা বেশ উপলব্ধি হয়। এমন সুখের সৌন্দর্য্যের ঐশ্বর্য্যের স্থান হিমালয়ে, দেবতাগণ ভিন্ন কে আর বাস করিবে? তবে হিমালয়ের ঊর্দ্ধস্থানগুলি চিরতুষার-

মণ্ডিত; সুতরাং মনুষ্যের অগম্য; শীতের আতিশয্য-হেতু মনুষ্য সেখানে যাইতে অসমর্থ। যাঁহাদের নিকট শীত গ্রীষ্ম সমান, তেমন যোগীগণ—সেরূপ দেবতাপ্রতিম ঋষিগণ —অবশ্য সেখানে যাইতে পারেন। তাহা ছাড়া, মনুষ্যের তাহা অগম্য। বহু চেষ্টা করিয়া ইংরাজ পর্য্যটক দুই একজন নাকি ১৪০০০ ফীট উর্দ্ধস্থান পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা উর্দ্ধতম শিখরের অর্দ্ধ পথও নহে। দেবতাগণের তুষার-পরিখা-বেষ্টিত স্বর্গ যে ভয়ানক দুর্ভেদ্য দুর্গ, তাহার আর সংশয় মাত্র নাই। তাই তাঁহারা অসুর ভয়ে সেই হিমাচলের উর্দ্ধশিখরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চিরদিন বাস করিতেছেন। নিম্নতর স্থানসকল হইতে তাঁহারা অনেকবার বিতাড়িত হইয়াছেন। এখনও বোধ হয় সেখানে আর বাস করিতে পারিতেছেন না। তবে তাঁহারা অনেক সময় মর্ত্ত্যে আসিয়া বিচরণ করেন। তাঁহাদের সেই স্বর্গে যাইবার একটী বহু প্রাচীন দ্বার, এই হরিদ্বার। এই পথ ধরিয়া পূর্ব্বকালাবধি দেবকল্প ঋষিগণ হিমালয় গিরিগহ্বরে তপস্যা করিতে যাইতেন, দেবগণও আবশ্যকমত ধরাতলে বিচরণ করিতেন। এই স্থানের ব্রহ্মকুণ্ড, স্বয়ং লোকপিতামহের যজ্ঞকুণ্ড। কনখলে দক্ষ প্রজাপতি বাস করিতেন, এবং যজ্ঞ উপলক্ষ করিয়া সকল দেবতাই সেখানে উপস্থিত হইয়া-

ছিলেন, সকল দেবতাই সেখানে ঋষিগণের সহিত মানবগণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

হবিদ্বার, কর্ম্ম ও জ্ঞানেব সমরক্ষেত্র। আমার বোধ হয় এইটীই এখানকাব প্রধান লক্ষ্য করিবার জিনিষ। প্রজাপতি দক্ষ নিজ কর্ম্মসূত্রে ও ভক্তিমূলে সকল দেবতাকে বশীভুত করিয়াছিলেন। তবে তাঁহার প্রকৃত জ্ঞানের—ব্রম্মজ্ঞানের অভাব ছিল। সেই জন্যই তিনি সাক্ষাৎ জ্ঞানময় ব্রহ্মপুরুষদিগকে বর্জ্জন করিয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সকল দেবতার অধিষ্ঠান হইল; কিন্তু তিনি জ্ঞানহীন, সুতরাং তাঁহার যজ্ঞও শিববিহীন হইল। যে কর্ম্ম জ্ঞানবিহীন, তাহা পণ্ড; সুতরাং তাঁহার যজ্ঞও পণ্ড হইল। যিনি জ্ঞানবিরহিত হইয়া কোনও কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহার যে গতি হয়, দক্ষ প্রজাপতির তাহাই হইল। তিনি বিনষ্ট হইলেন। তাঁহার জ্ঞানহীন যজ্ঞ তাঁহাকে সদ্গতি দিতে পারিল না। শিবহীন দেবতাগণ তাঁহাকে মুক্তি দিতে পারিলেন না। শুধু তাহাই নহে; জ্ঞান, কর্ম্মকে পর্য্যন্ত নষ্ট করিলেন। শিব-প্রেরিত বীরভদ্র যজ্ঞ ধ্বংস করিলেন। জগদম্বার অন্তর্দ্ধান ঘটিল। যেখানে জ্ঞান নাই, কেবল কর্ম্মের আড়ম্বর; যেখানে শিব নাই, দেবতাগণের আবির্ভাব; সেখানে ব্রহ্মময়ীর অবস্থান অসম্ভব। কাজেই

জগন্মাতাও দক্ষকে ত্যাগ করিলেন। তবে জগন্মাতা দয়াময়ী; তিনি আবার দক্ষকে সে জ্ঞান দান করিলেন। শিবের দয়া হইল। দক্ষ উদ্ধার-লাভ করিলেন। এ সংসারে আমরা অনেক জ্ঞানহীন দক্ষের দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করি। এই মায়াক্ষেত্রে কর্ম্মফলে তাহারই অভিনয় হইয়াছিল মাত্র। সমরে শিবের জয় হইল; জ্ঞানের আধিপত্য স্থাপিত হইল; মুক্তির পথ প্রসারিত হইল। মনুষ্যকে এই উপদেশ দিয়া জীবের এই উপকার সাধন করিয়া, দয়াময়ী ব্রহ্মময়ী সতী এই লীলা দেখাইলেন।

হরিদ্বার পাপ-পুণ্যের সমরক্ষেত্র। হরিদ্বারের সুশীতল সুনির্ম্মল গঙ্গাজলে অবগাহন করিয়া মনে হয় না কি যে, সমস্ত জীবনের অসংখ্য পাপ বিধৌত হইয়া, পুণ্যময় নবকলেবর হইল? অসংখ্য যাত্রী—ভারতের দিগদিগন্ত হইতে সমবেত পুণ্য-প্রয়াসী ভক্তিমান্ আর্য্যসন্তান—'গঙ্গে হর হর হর হর' বলিয়া, ভগবতী ভাগীরথীর পুণ্যময় জলে স্নান করিয়া স্বর্গ-সুখ অনুভব করেন। এই সকল সুকৃতিবান্ পুণ্যাত্মাগণের সহিত একত্রিত হওয়াও একটা পুণ্যের লক্ষণ। সকলেই পবিত্র মনে বিশুদ্ধ চিত্তে ভাগীরথী দর্শন ও স্পর্শন করিতেছেন; সকলের হৃদয়েই যেন ভক্তি মূর্ত্তিমতী; সকলেরই বদনে যেন সরলতা ও পবিত্রতা দেদীপ্যমান্। এমন শান্তি-

ময় পবিত্র স্থান আর কোথায় হইতে পারে? এখানে গঙ্গা-স্নানে বিগত-পাপ হইয়া, মুক্তিলাভ করিয়া, মনুষ্য স্বর্গবাসের উপযুক্ত হয়। সেই জন্য বুঝি, হরিদ্বারের স্নানান্তে সকলেই উচ্চতর স্থানে যাইবার প্রয়াসী হয়; মনে হয়,—বদরিকাশ্রম গঙ্গোত্রী, কেদারনাথ, অমরনাথ প্রভৃতি পুণ্যক্ষেত্র দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করা শ্রেয়ঃ। তখন আর কলিকাতার গলি ঘুঁজি মনে পড়ে না, বঙ্গের পল্লীবাসীর ম্যালেরিয়া-প্রপীড়ন স্মরণ হয় না, আপনাদের বৈষয়িক কর্ম্মের কথা মনে হয় না; অনেক সময় পুত্র কন্যা প্রভৃতির প্রতিও যেন লক্ষ্য থাকে না। হৃদয় তখন যেন একটা উৎকট উৎসাহে উন্নত হয়। তবে আমাদের মত অসমর্থ পাপিষ্ঠ লোকের উৎসাহ, হৃদয়ে উত্থিত হইয়া ক্ষণকালেই লয় প্রাপ্ত হয়, কার্য্যে পরিণত হয় না।

এ দিকে পর্ব্বত হইতে অর্দ্ধেকপথ অবতরণ করিয়া আমার ভয়ঙ্কর কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। অতিদ্রুত নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হইতে লাগিল—পদদ্বয় থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল—এমন কি বক্ষেও দ্রুত স্পন্দন আরম্ভ হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার অতিশয় পিপাসা পাইয়াছিল, এক্ষণে সেই পিপাসা যেন আরো দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। জল অন্বেষণে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম, কিন্তু

কুত্রাপি জলের চিহ্নও দেখিতে পাইলাম না। দারুণ কষ্টে, প্রবল তৃষ্ণায়, আমার বোধ হইতে লাগিল, এইবার বুঝি বক্ষের স্পন্দন বন্ধ হইয়া যাইবে।

সহসা অদূরে দেখিতে পাইলাম একটী বালক জলপূর্ণ কলসী মস্তকে করিয়া ধীরে ধীরে পর্ব্বতারোহণ করিতেছে। তাহার কলসী দেখিয়া আমার মনে হইল বোধ হয় বালক নিম্নস্থ কূপ হইতে জল উত্তোলন করিয়া লইয়া যাইতেছে। তখন একটু আশান্বিত হইয়া আমি বালকের দিকে অগ্রসর হইলাম।

বালক আমার নিকটস্থ হইলে আমি তাহার নিকট তৃষ্ণার জল প্রার্থনা করিলাম। সে প্রথমে আমার কথা বুঝিতেই পারিল না। তারপর আমার বিচিত্র হিন্দি যখন সে বুঝিতে পারিল—সে অতি নম্রভাবে বলিল—"বাবুজী ইহা কূপজল নহে—গঙ্গাজল। পাহাড়ের উপর দেশে এক মহাদেব মুর্ত্তি স্থাপিত আছে। তাঁহার পূজার জন্য জল লইয়া যাইতেছি। আমি প্রত্যহ প্রাতে বহির্গত লইয়া সন্ধ্যা নাগাইত মন্দিরে উপস্থিত হই। এই জল ত আপনাকে দিতে পারিব না বাবু।"

আমি বালকের নম্রভাব দেখিয়া ও তাহার মধুর বচনে পরম প্রীতিলাভ করিলাম। আমার ইচ্ছা হইয়াছিল

একবার বালকের সঙ্গে যাইয়া এই মহাদেবকে দেখিয়া আসি, কিন্তু শরীর অতিশয় ক্লান্ত বলিয়া এবং তাদৃশ সময়ও তখন ছিল না, এই সমস্ত ভাবিয়া আমার আর বালকের সহিত ইচ্ছা সত্বেও যাওয়া হইল না।

পরে অনুসন্ধানে জানিয়াছিলাম এই মহাদেব অতি প্রাচীন। প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে জনৈক সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী ইহার স্থাপনা করেন। তারপর তাঁহার দেহান্তে শিষ্যদিগের দ্বারা ইনি পূজিত হইয়া আসিতেছেন। পূজা করিবার জন্য স্বতন্ত্র পুরোহিত আছেন। তিনি ইহার দৈনিক পূজা ও আরত্রিকাদি করিয়া থাকেন। যাত্রীরাও সময়ে সময়ে উপস্থিত হইয়া মহাদেবকে পূজা ও দক্ষিণাদি প্রদান করিয়া থাকেন। তাহাতেও পুরোহিত মহাশয়ের কিঞ্চিৎ লাভ হইয়া থাকে।

যে বালক জল বহিয়া লইয়া যায়—তাহারা পুরুষানুক্রমে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত আছে। তাহারা চিরদিন বাস করিবার জন্য বিনামূল্যে ভূমি পাইয়াছে, এবং তাহার বৃদ্ধ প্রপিতামহ হইতে এই কার্য্য করিয়া আসিতেছে।

আমি বাসায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম তথায় হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। অদ্য হরিদ্বারে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধকার্য্য হইবে এই প্রকার পূর্ব্বদিবস ব্যবস্থা হইয়াছিল। আমি

প্রাতে ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলাম, গৃহিনী মনে করিয়াছিলেন এখুনি ফিরিয়া আসিব। তিনিও সেই মত শ্রাদ্ধাদির আয়োজন করিয়াছিলেন। ভোজ্য, নৈবেদ্য ইত্যাদি কিছুবই আয়োজন পরিত্যক্ত্য হয় নাই। ক্রমে বেলা হইতে লাগিল তাঁহারাও "এই আসে" "এই আসে" করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। পাণ্ডাঠাকুব প্রত্যেক কোয়াটারে কোয়াটারে "বাবু আসিয়াছেন কিনা"—সংবাদ লইয়া যাইতেছেন। সকলেই ব্যস্ত, সকলেই আশাপথ পানে চাহিয়া আছে।

তারপব যখন 'বেলা দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেল অথচ আমি ফিরিয়া আসিলাম না, তখন গৃহিনী আমার বিপদাশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি মাতুলকে চারিদিকে আমার অন্বেষণে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কোথায় আমার দর্শন পাইবেন? আমি যে স্থানে গোয়েন্দাগিরি করিতে গিয়াছিলাম, তাঁহার সাধ্য নাই সেই স্থানে উপস্থিত হইতে পারেন।

গৃহিনী আমায় দেখিয়া প্রথমে আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার তখনকার সেই চিন্তামাখান মুখখানি দেখিয়া আমারও বাস্তবিক কষ্ট হইয়াছিল।

গৃহিনী পরে তীব্রস্বরে বলিলেন—"বিদেশে এই প্রকারে

আমাদিগকে একাকী ফেলিয়া যাওয়া সুবুদ্ধির পরিচয় নহে। না বলিয়া সকালে বেড়াইতে বাহির হইলে আমি এখানে আয়োজন করিয়া বসিয়া আছি। এত বেলা হইল, এখন কি না তুমি ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে রৌদ্রদগ্ধ হইয়া আগমন করিলে। মুখখানি একবার আরসী দিয়া দেখ দেখি?"

আমি বলিলাম—"একটা কার্য্যে বহির্গত হইয়াছিলাম। তাঁহাতে আমার এতটা একাগ্রতা জন্মিয়াছিল যে, আমার আর কিছুই মনে ছিল না! যাহা হউক তোমার কোনও ভয় নাই—এখন পিপাসার একটু জল দাও।"

গৃহিনী ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন—"কি রকম কথাবার্ত্তা কহিতেছ। শ্রাদ্ধাদি করিবে, ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবে, তবে কোন আক্কেলে জলপান করিতে চাহিতেছ।"

সমস্ত দোষটাই আমার। তখন আর তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার আমার ইচ্ছা ছিল না। সুতরাং গৃহিনীর ক্রোধানলে আর আহুতি না দিয়া বলিলাম—"স্নান করিয়া আসিতে পারি ত? জল না হয় পান করিব না—কিন্তু স্নান কবিতে ত কোনও দোষ নাই।"

এই সময়ে পাণ্ডাঠাকুর আসিয়াছিলেন, তিনি আমায় স্নান করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। আমিও দ্রুতপদে বহির্গত হইয়া ব্রহ্মকুণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। অত শীতেও

আমার শরীর তখন পরিশ্রমে জ্বলিতেছিল। জাহ্নবীর ত্রিতাপনাশিনী সলিলে বার বার ডুব দিয়া আমার সেই জ্বালার নিবৃত্তি হইল। মনে মনে মাকে উদ্দেশ করিয়া বলি'লাম, "মাগো—এই জন্যই লোকে জ্বালা জুড়াইতে তোমার তীরে আসিয়া থাকে এবং তোমার সলিলে অবগাহন করিয়া পূত পবিত্র হয়। তোমার এত গুণ না থাকিলে শম্ভুর মস্তক হইতে কঠিন তপস্যা করিয়া ভগীরথ পৃথিবীতে আনিবে কেন? মা ঋষি কোপানলে সগর বংশ ভস্মীভূত হইয়াছিল, তুমি আসিয়াই তাহাদিগকে সেই বহুদিনের চিতাগ্নি মধ্য হইতে উদ্ধার করিয়াছ! তোমার শ্রীচরণে আমি বার বার নমস্কার করি। দেখিও মা! যেন শেষদিনে অধীনকে বিস্মৃত হইও না।

বাসার সকলেই একবার স্নান করিয়াছিলেন, আমাকে স্নান করিতে দেখিয়া তাঁহারাও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আবার সকলে স্নান করিল, স্নান সমাপনান্তে আমরা কুশাবর্ত্ত ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

এই কুশাবর্ত্ত ঘাটেই ভোজ্য উৎসর্গাদি যাবতীয় কার্য্য হইয়া থাকে। আমরা একে একে ভোজ্য উৎসর্গ করিতে লাগিলাম। হিন্দুস্থানী পাণ্ডা বিচিত্র সুরে—অঙ্গভঙ্গী করিয়া আমাদিগকে মন্ত্র পাঠ করাইতে লাগিল।

সকলেরই ভোজ্য উৎসর্গ হইয়া গেল, কেবলমাত্র বাকী রহিলেন মামা, অবশেষে তাঁহার কার্য্যও শেষ হইয়া গেল। ঘাটে পাণ্ডারা পয়সা আদায়ের জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। উহাদের পয়সা আদায় প্রণালী অতি সুন্দর। পুলিসের ভয়ে উহারা "জুলুম" করিতে পারে না বটে, কিন্তু মিষ্ট কথায় উহারা যাত্রীদের মাথায় হাত বুলাইয়া বেশ দুপয়সা রোজকার করে। আমাদিগের নিকটও এই প্রকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই।

আমি শ্রাদ্ধ সমাপনান্তে পাণ্ডাদের আদায় প্রণালী দেখিবার জন্য চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। অত বেলা হইয়াছে, কিন্তু তখনও দলে দলে লোকে শ্রাদ্ধ বা ভোজ্য উৎসর্গ করিতেছে। সারি সারি যাত্রীরা বসিয়া গিয়াছে এবং পুরোহিত পাণ্ডারা তাহাদিগকে ঘেরিয়া মন্ত্রপাঠ করাইতেছে। একটী যাত্রীর উপর দেখিলাম জুলুম আরম্ভ হইয়াছে। লোকটী পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে আসিয়াছে—এবং বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন। পাণ্ডারা ইহা বুঝিতে পারিয়াছে এবং সেই জন্য তাহারা মন্ত্র উচ্চারণ বন্ধ করিয়া মিষ্ট কথার অবতারণা করিয়াছে। লোকটীর হাতে তখন পিণ্ড ছিল।

পাণ্ডা বলিতেছে :—"বাবা! যাহা দিবে তোমার পিতাকে

দিবে—আমাকে ত দিতেছ না, তবে তুমি এত কার্পণ্য প্রকাশ করিতেছ কেন?

লোকটী বলিল :—"মহাশয়! আমার অবস্থা তাদৃশ স্বচ্ছল নয়—আপনি অত টাকা চাহিতেছেন, আমি কোথায় পাইব।"

পাণ্ডাজী বলিলেন—"কত টাকা চাহিতেছি মাত্র ৫০৲ টাকা বই ত নয়। টাকাটা ত আমায় দিতেছ না? তোমার পিতা এত টাকা রাখিয়া গিয়াছেন—আর তুমি তাঁহার শ্রাদ্ধে ৫০৲ টাকা দিতে পার না। পিণ্ড তুমি ত তোমার পিতাকে দিতেছ—টাকাটাও সেই সঙ্গে দাও। তোমার পিতার আত্মা পরিতৃপ্ত হইবেন।"

বহুক্ষণ এইরূপে তর্ক বিতর্ক চালতে লাগিল। অবশেষে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পবে নগৎ দশটাকা আর একখানি শীতবস্ত্র আদায় করিয়া পাণ্ডা মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিল। লোকটী এই অর্দ্ধঘণ্টা কাল পিণ্ড হাতে করিয়া বসিয়াছিল—এতক্ষণে সে নিস্তার পাইল।

পাণ্ডারা পুলিশের ভয়ে জলুম করে না। কড়া মেজা-জের যাত্রীদিগকে দেখিলেও সংযত হয়—কিন্তু নীরিহ এবং অনভিজ্ঞ যাত্রী পাইলেই তাহাদের আর আনন্দের সীমা থাকে না! কিসে দু'পয়সা আদায় করিতে পারিবে—

তখন সেই চেষ্টাই তাহাদের বলবতী হয়। তীর্থস্থানে পাণ্ডাদিগের হস্তে—এই প্রকারে কত শত যাত্রী নির্য্যাতিত হয় কে তাহার ইয়ত্তা করে।

তীর্থস্থানে পাণ্ডাদিগের এই প্রকার লোভ দেখিয়া আমার অত্যন্ত বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। আমি আর সেই স্থানে অপেক্ষা না করিয়া পরিবারবর্গকে লইয়া বাসায় ফিরিলাম। আহারাদি সম্পন্ন করিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আমরা ডেরাডুন যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলাম।

আমরা চলিয়া যাইব শুনিয়া দলে দলে লোক আসিয়া বিরক্ত করিতে লাগিল। পাণ্ডাজীর ঘর সংসারে যে যেখানে ছিল—সকলেই আসিয়া বলিল "বাবু বক্‌সিস্।" পাণ্ডাজীর পুরোহিত, মুহুরি, গোমস্তা, নায়েব, চাকর, চাকরাণী, ঝাড়ুদার, মেথর সকলেই আসিয়া সেলাম করিয়া বলিল—"বাবু বক্‌সিস্।"

তাহাদের উপর আমাদের বাসার ঝি, চাকর, বামুন আছে। ইহাদের বক্‌সিসের তাগাদায় উত্যক্ত হইয়া আমরা বাসা পরিত্যাগ করিলাম।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

গাড়ী ক্রমশঃ ডেরাডুনের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল এবং আমরা ডেরাডুনের অগ্রবর্ত্তী ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

সূর্য্যদেব ক্রমশঃ পশ্চিমাকাশে লুক্কায়িত হইতেছেন। পর্ব্বতের উপর শেষ সূর্য্যাস্ত শোভা যে প্রকার দেখিতে পাওয়া যায, সমতল ক্ষেত্রে সেরূপ দেখা যায় না। সমস্ত দিবস অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াও দিনকব পরিশ্রান্ত হ'ন নাই। কারণ তখনও তিনি পাহাড়ের প্রত্যেক শৃঙ্গে—বৃক্ষরাজির অতুচ্চ শীর্ষদেশে আপন স্বর্ণরশ্মি বিস্তার করিয়া ক্রীড়া করিতেছিলেন।

সহসা দেখিলে বোধ হয়, পাহাড়ের গাত্রে যেন অগ্নি জ্বলিতেছে। প্রচণ্ড দাবানল প্রজ্জলিত হইয়া যেন সেই পাষাণ বক্ষের উপর নৃত্য করিতেছে। চারিদিকে স্বর্ণরশ্মি—চারিদিকে অস্তায়মান সূর্য্যের নৃত্য লীলা দেখিয়া প্রাণ মন বিভোর হইয়া উঠিল।

পাহাড়ের উপত্যকায় সারি সারি চায়ের বাগান। চায়ের বাগান যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন ইহা কতদূর পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। প্রত্যেক গাছগুলি সযত্নে

কর্ত্তিত। প্রত্যেক গাছগুলি হইতে শ্যামলশোভা দীপ্তি পাইতেছে। অস্তায়মান সূর্য্যের শেষ রশ্মিগুলি এই চায়ের গাছগুলির উপব পড়িয়া বড় সুন্দব দেখাইতেছিল। বোধ হইতেছিল কে যেন হরিদ্রাভ গালিচার উপর মাঝে মাঝে স্বর্ণরেণু বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছে।

পাহাড়ের সূর্য্যাস্ত শোভা দেখিবার—দেখাইবার ও উপভোগ করাইবাব শ্রেষ্ঠ জিনিস। স্রষ্টার বিরাট সৃষ্টি কৌশল দেখিবাব এরূপ সুবর্ণ সুযোগ অতি অল্পই ঘটিয়া থাকে।

আমি মুগ্ধনেত্রে গাড়ি হইতে মুখ বাড়াইয়া চতুর্দ্দিকে এই অপূর্ব্ব অফুবন্ত শোভারাশি দর্শন করিতে লাগিলাম। যতই দেখি ততই যেন আমার দেখার আশা বর্দ্ধিত হয়।

দেখিতে দেখিতে গাড়ী ডেরাডুনে আসিয়া উপস্থিত হইল। কি ভয়ঙ্কর শীত! চারিদিকে বরফ পাত হইতেছে, এবং তজ্জন্য শীত যেন দ্বিগুণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। হস্ত পদ অসাড় হইয়া যাইতেছে। গাত্রে এত শীতবস্ত্র থাকিতেও বুকের ভিতর যেন কম্পিত হইতে লাগিল। বালকেরা প্রায় এক প্রকার অসাড় হইয়া গিয়াছিল। স্ত্রীলোকেরা ও তদ্রূপ। আমি ডেরাডুনে অবতরণ করিয়া দুইখানি গাড়ী স্থির করিলাম। ডেরাডুনে এই

প্রথম আসিয়াছি। পথ ঘাট জানি না—লোকালয় জানি না—কাহারও সহিত আলাপ পর্য্যন্ত নাই।

আমি যাইতে যাইতে শুনিলাম যে, এই সহবে একজন ধনী শ্রেষ্ঠী বাস করেন—এবং তাঁহাব বহু সংখ্যক বাড়ী আছে। আমি আশান্বিত হইয়া তাঁহার বাটীব দিকে চলিলাম।

শ্রেষ্ঠীভবন অতি বৃহৎ। আমি যাইয়া আমাব বক্তব্য জ্ঞাপন কবিলে তৎক্ষণাৎ শ্রেষ্ঠী বাজাবেব নিকট একখানি দ্বিতল অট্টালিকা স্থিব করিয়া দিলেন এবং ভৃত্যদিগকে যাইয়া আমাদিগকে ঐ বাটী দেখাইয়া দিতে বলিলেন। শ্রেষ্ঠী অতিশয় অমায়িক ব্যক্তি। তাঁহার ভদ্র ব্যবহারে আমি বড়ই প্রীতি লাভ করিলাম। বিদেশ—সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থান—এত রাত্রে স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে লইয়া কোথায় যাইব—কাহার আশ্রয়ে উঠিব এই ভাবনায় আমার অন্তব ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। এত সহজে এই প্রকারে আশ্রয় পাওয়াতে ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। শ্রেষ্ঠীর লোক আসিয়া বাড়ীর চাবি খুলিয়া দিল এবং আলো দিয়া গেল। আমরা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া তৎক্ষণাৎ কাষ্ঠাদির আয়োজন করিয়া অগ্নি প্রজ্জলিত করিলাম—অগ্নিতাপে বড়ই আরাম বোধ হইতে লাগিল এবং বালকগুলির অসাড় দেহেও স্পন্দন ফিরিয়া আসিল। সেই

রাত্রে আর পাকাদির বন্দোবস্ত হইল না। কারণ তখন বাজারে যাইয়া দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার শক্তি কাহারও ছিল না। আহার অপেক্ষা অগ্নি সেবনই তখন যেন মধুর বলিয়া বোধ হইতেছিল। সঙ্গে যাহা খাদ্যদ্রব্যাদি ছিল তাহাই ভক্ষণ করিয়া লেপ ও মোটা মোটা কম্বলে দেহ আবৃত করিয়া শয়ন করিলাম।

রজনী প্রভাত হইল। তখন বাসার কাহারও নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। আমি সর্ব্বাঙ্গ মোটা অলষ্টারে আবৃত করিয়া—মাথায় বৃহৎ পাগড়ী বাঁধিয়া ডেরাডুনের পথে আসিয়া পড়িলাম। অদূরে মুসৌরি পাহাড়। চারিদিকে বরফ পড়িয়া রহিয়াছে। রাস্তায়—পাহাড়ে—গাছের উপর চারিদিকেই বরফ। বৃদ্ধ হিমালয় সর্ব্বাঙ্গ বরফে আচ্ছাদিত করিয়া রাত্রে শয়ন করিয়াছিলেন, এখনও তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই। সেই অমল ধবল প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর। যতদূর দৃষ্টিগোচর হয়—কেবলই শ্বেতবর্ণ—সম্মুখে—পশ্চাতে—পার্শ্বে চারিদিকে অনন্ত অসীম তুষার রাশি। রজতগিরির এই অপূর্ব্ব মনোলোভা শোভা দেখিয়া আমার সেই অসাড় দেহেও যেন নবশক্তি জাগিয়া উঠিল। আমি এই অপূর্ব্ব শোভারাশি দেখিতে দেখিতে বরফস্তুপ মথিত করিয়া চলিতে লাগিলাম।

হিমালয়ের শীর্ষদেশে হর-পার্ব্বতী বাস করিয়া থাকেন। আমার বোধ হইতে লাগিল যেন চতুর্দ্দিকের এই ধবলকান্তি সেই শ্বেতশুভ্র কলেবর পিনাকধারীরই অপরূপ সৌন্দর্য্যের প্রতিচ্ছটা।

পাহাড় সমূহ একেবারে বরফে আচ্ছাদিত। মাঝে মাঝে আবার স্থানে স্থানে বরফ পাত হয় নাই—সেই স্থানটা বেশ পাহাড় বলিয়া বোধ হইতেছে। সুদূর বঙ্গদেশ হইতে আসিয়া হিমালয়ের এই অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া আমার অন্তরাত্মা অতিশয় পুলকিত হইয়া উঠিল। অত বরফ—অত শীত—তবুও তথায় পক্ষী কূজনের বিরাম নাই। চতুর্দ্দিকে বড় বড় পাহাড়ীয়া পাখীগুলি প্রভাতী সঙ্গীতে বিশ্বকর্ত্তার অপূর্ব্ব মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। আমি আর অধিক দূর অগ্রসর হইলাম না। পূর্ব্ব রাত্রে কিছুই আহার হয় নাই, প্রাতঃকালে বাজার হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনিলে তবে আহার্য্য প্রস্তুত হইবে, ইহা চিন্তা করিয়া আমি বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

মাতুলকে সঙ্গে লইয়া বাজারে চলিলাম। ডেরাডুনের বাজার অতি সুন্দর। এত তরিতরকারী ও ডাল কড়াই আমি কুত্রাপি দেখি নাই। মাতুল বাঁধাকপি, ফুলকপি, কড়াইসুটী, আলু প্রভৃতি দেখিয়া আনন্দে নৃত্য করিয়া

উঠিলেন। দুইটা কপি ওজন প্রায় দশ সের—আমরা দুই আনা মূল্যে খরিদ করিলাম। কলিকাতায় দুই টাকায় বাজার করিলেও ঝাঁকা পূর্ণ হয় না—কিন্তু ডেরাডুনে মাত্র এক টাকার দ্রব্যাদি কিনিতেই একটী প্রকাণ্ড বোঝা হইয়া গেল।

ডালের গোলায় থবে থবে বস্তাগুলিতে ডাল সাজান রহিয়াছে। গোলাগুলি দেখিতে অতি মনোহর। আটা, ময়দা, ঘৃত, দুগ্ধ সবই খরিদ করা হইল। সমস্ত জিনিষই অকৃত্রিম—ভেজাল দ্রব্য কিছুই নাই। গম জাঁতায় পিশিয়া তবে আটা তৈয়ারী হয়। ঘৃত অতি বিশুদ্ধ, কোনও ভেজাল ইহাতে নাই। মাতুলের বাঁধাকপি ও কড়াইসুটী দেখিয়া আর আনন্দ ধবে না।

তিনি বলিলেন—"বাবা! পাহাড়ে সবই অদ্ভুত। কেন যে এত বড় বড় সুন্দর জিনিস এখানে হয়, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আমাদের বাঙ্গালা দেশে হইলে, আমরা এই সকল "সুধা" বলিয়া খাইতাম।"

মাতুলের আনন্দে আমি আরো উৎসাহ দিতে লাগিলাম, তিনি নিজের মনোমত বাছা বাছা জিনিস পত্রাদি ক্রয় করিলেন।

গৃহিনী জিনিস পত্রাদি দেখিয়া অতিশয় বিরক্ত হইলেন।

বাস্তবিক আমরা কয়েকজন মাত্র লোক—যে বাজার হইয়াছিল তাহাতে পঁচিশজন লোক পরিপাটীরূপে দুইবেলা আহার করিতে পারে।"

একটী কপি রন্ধন করিতেই প্রায় এক হাঁড়ী হইয়া গেল।

আহার্য্য প্রস্তুত হইলে আমরা আহারে বসিলাম। সে দিবস যে প্রকার তৃপ্তির সহিত আহার করিয়াছিলাম—জীবনে তাহা কখনও উপভোগ করি নাই।

আহারাদির পব কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামান্তে আমরা গাড়ী করিয়া ভ্রমণে বহির্গত হইলাম।

আমরা প্রথমেই "ইম্পিরিয়াল ক্যাডেট" কোর দেখিতে গমন করিলাম। এই "ক্যাডেট কোর" ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড কর্জ্জনের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। ভারতের প্রধান প্রধান নৃপতিবৃন্দের রাজকুমারদিগকে লইয়া এই সৈন্যদল গঠিত হইয়াছে। কাশ্মীর, পাতিয়ালা, জয়পুর, যোধপুব, বিকানিয়াব, রটলাম, ভূপাল, ইন্দোর, গোয়ালিয়ব ইত্যাদি সমস্ত নৃপতিনন্দনই এই সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। যে বৎসর আমাদের মাননীয় সম্রাট প্রিন্স অফ ওয়েলস্ রূপে কলিকাতা ভ্রমণে আসিয়াছিলেন—সেই বৎসর এই সৈন্যদল তাঁহার সমভিব্যাহারে আসিয়াছিল। দীর্ঘাকার সুগঠিত—রূপবান

রাজকুমারদিগের এই অপূর্ব্ব সৈন্যদল দেখিবার জিনিষ। আমরা স্ত্রীলোকদিগকে গাড়ীতে রাখিয়া এই "সৈন্যবারিকে" প্রবেশ করিলাম। অতি বিস্তৃত প্রাঙ্গন, তাহার ভিতর নানা গৃহ প্রস্তুত হইয়াছে। কোনটা শিক্ষাগৃহ, কোনটা শয়নগৃহ, কোনটা বা অফিস। প্রত্যেক গৃহগুলি অতি সুন্দর ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একজন বাঙ্গালী কেরাণীর সহিত এই সময়ে আমাদের সাক্ষাৎ হইল। বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া এত দূরদেশে আসিয়াও কেরাণীগিরি করিতেছেন, ইহা দেখিয়া বড়ই কষ্ট হইয়াছিল।

যাহা হউক তিনি আমাদিগকে বিশেষ যত্নের সহিত সমস্ত দেখাইতে লাগিলেন। একস্থানে দেখিলাম যে, কাশ্মীর ও নাভার যুবরাজদ্বয় টেনিস ক্রীড়া করিতেছেন। আমরা আর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইহা দেখিতে পারিলাম না। কারণ স্ত্রীলোকদিগকে একাকী গাড়ীতে রাখিয়া আসিয়াছি, তাহাদের নিকট কেহই নাই। আমি আসিয়া আবার গাড়ীতে আরোহণ করিলাম।

কিয়দ্দূর আসিয়া দেখিলাম পর্ব্বতগাত্রে অপরূপ সৌন্দর্য্যশালিনী নানাপ্রকার পুষ্পরাজি প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। কোনটা শ্বেত, কোনটা পীত, কোনটা লোহিত, কোনটা ধূসর, কোনটা পাটল এবং কোনটাতে বা এক সঙ্গেই

নানাবিধ বর্ণ। আমরা এই অপরূপ পুষ্পশ্রীমণ্ডিত পাহাড়-শ্রেণী দেখিয়া মোহিত হইলাম। সকলেই গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া পুষ্প চয়নে নিযুক্ত হইলাম। সেই অপূর্ব্ব পুষ্পরাজি শোভিত—অরুণালোকোদ্ভাসিত—পাহাড় গাত্রে যে অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়াছিলাম তাহা বর্ণনা করিবার শক্তি আমার নাই। পথিমধ্যে গাড়ী রাখিয়া আমরা সকলেই হাঁটিয়া সেই স্থানে উপনীত হইয়াছিলাম। কতক্ষণে এই পুষ্পকুঞ্জে পৌছিব, এই প্রবল আগ্রহ সকলকেই অধীর করিয়া তুলিয়াছিল। ক্রমে আমার অঞ্জলি পূর্ণ হইয়া গেল, কাহাকে রাখিয়া কাহাকে তুলিব ঠিক করিতে পারিলাম না।

সকল পুষ্পগুলিতেই যে সুগন্ধ আছে তাহা নহে। কোনটী দেখিতে অতি সুন্দর, কিন্তু আদৌ গন্ধ নাই। কোনটা ঝুম্পাকাব, কোনটা বা গোল, আবার কোনটা বা দীর্ঘাকার।

দার্জ্জিলিং পাহাড়ে বিবিধ বর্ণের অনেক পুষ্প দেখিয়াছিলাম, এখানেও তাহা দেখিতে পাইলাম এবং তদ্ভিন্ন অন্যান্য বর্ণের পুষ্পও যথেষ্ট দেখিতে পাইলাম।

বাঙ্গালা দেশে এই প্রকার পুষ্প সম্ভার নাই। বাঙ্গালার যাতী, যুথী, বেলা, চম্পক, গন্ধরাজ, শেফালিকা, স্থলপদ্ম ইত্যাদির সহিত ইহাদের তুলনা হয় না।

শুনিলাম এই স্থান হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে "টপকেশ্বর" নামে এক মহাদেব আছেন। অনেক "চড়াই" "উৎরাই" অতিক্রম করিয়া এই স্থানে যাইতে হয় এবং পথ অতিশয় দুর্গম।

অগত্যা স্ত্রীলোকদিগকে বাসায় পাঠাইয়া দিয়া আমি দুইজন পথ প্রদর্শককে সঙ্গে লইয়া একাকী এই মহাদেব দেখিতে গমন কবিলাম।

পাহাড়ের পর পাহাড়। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে পাহাড় ভিন্ন আর অন্য কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রদর্শকদ্বয় আমাকে যাইতে যাইতে স্থানীয় দৃশ্যগুলি বুঝাইয়া দিতে লাগিল।

আমরা এক "চড়াই" অতিক্রম করিলাম। ক্রমাগতই পাহাড়ের উপর উঠিতেছি। পথ বাস্তবিকই বড় বন্ধুর ও দুর্গম। আমার পদদ্বয় ক্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িল। ক্রমশঃ পাহাড়ের উপর দেশে আসিয়া পড়িলাম। এই পাহাড়ের অপর পাশেই আর একটী পাহাড়—মধ্য দিয়া একটী ঝরণা প্রবাহিত হইতেছে। ঝরণার জল তাদৃশ বেশী নহে, কিন্তু বর্ষাকালে ইহা ঠিক পার্ব্বতীয় প্রবাহিনীর আকার ধারণ করে। ঝির ঝির করিয়া সেই ঝরণা প্রবাহিত হইতেছে। কি স্বচ্ছ—পরিষ্কার জল! বোধ হয় এক গেলাস পান

করিলে, এক গেলাস রক্ত শরীরে জন্মিয়া থাকে। আমি অঞ্জলিপূর্ণ করিয়া সেই জল পান করিলাম! দেখিলাম দলে দলে হরিণ আসিয়া সেইস্থানে জলপান করিতেছে। স্থানটী যেন হরিণে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। হরিণশিশু-গুলি পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিয়াছে, তাহাদের ভয় নাই, ভাবনা নাই, নির্ভয়ে সেই স্বচ্ছ পবিত্র প্রবাহিনীর জল পান করিতেছে। প্রস্রবণের জল পাহাড় গাত্র দিয়া বহিয়া যাইতেছে—পরে অন্য স্থান দিয়া নিম্নে গিয়া পতিত হইতেছে। জল এত স্বচ্ছ যে, পাহাড়ের যে স্থানের উপর দিয়া উহা প্রবাহিত হইতে-ছিল, তাহার বক্ষঃস্থল বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। আমরা আবার নিম্নে অবতরণ করিলাম। সামান্য দূর অগ্র-সর হইয়াই "টপকেশ্বরের" নিকট উপস্থিত হইলাম। কি দেখিলাম! সেই অপরূপ সৌন্দর্য্য কি প্রকারে বুঝাইব। দুইধারে পাহাড় মধ্যে একটী গুহা, সেই গুহার উপর আবার একটী পাহাড় কে আনিয়া বসাইয়া দিয়াছে। পাহাড়টী এইপ্রকার ঢালু যে, দেখিলে বোধ হয় মনুষ্য হস্ত দ্বারা মন্দিরের ছাতের জন্য ইহা প্রস্তুত হইয়াছে।

অতি মনোরম স্থান! মনুষ্য হস্তে এইপ্রকার সুন্দর মন্দির নির্ম্মিত হইতে পারে না। ভগবান ভূতনাথ আপনার আবাসস্থল আপনিই নির্ম্মাণ করিয়া লইয়াছেন। শ্মশানে

যাঁহার আলয়, চিতাভস্ম যাঁহার আসন, তাঁহার এই প্রকার আবাসানুরাগ দেখিলে বাস্তবিকই বিস্মিত হইতে হয়।

মন্দির মধ্যে ভক্তিভরে প্রবেশ করিলাম। লোক নাই, জন নাই—পূজার কোন আয়োজন নাই—অথচ ভবানীপতি সেই স্থানে বিরাজ করিতেছেন। উর্দ্ধদেশ হইতে ত্রিধারা হইয়া জল তাঁহার মস্তকে আসিয়া পতিত হইতেছে, পরে পার্শ্বদেশ দিয়া মন্দিরতল অতিক্রম করিয়া নিম্নে পড়িতেছে।

অনবরত ত্রিধারা দিয়া জল পড়িতেছে। বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই—দিবারাত্র নাই—টুপ টাপ করিয়া জল সদা সর্ব্বদা পড়িতেছে।

ত্রম্ব্যকের এই অপরূপ পূজা পদ্ধতি দেখিয়া হৃদয় ভক্তি-ভরে নত হইয়া আসিল। আমি বারংবার মস্তক অবনত করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলাম।

প্রদর্শকদ্বয়ের নিকট হইতে ইহাব উৎপত্তি সম্বন্ধে শুনিলাম যে, বহুকাল পূর্ব্বে একজন সিদ্ধ পুরুষ আসিয়া ইহাকে স্থাপিত করেন। তিনি প্রত্যহ স্বয়ং পূজা করিতেন। সেই বিজন পর্ব্বত কন্দরে পূজার উপযুক্ত দ্রব্যাদি তিনি কিছুই পাইতেন না। এক দিবস তিনি মহাদেবের আরাধনা করিয়া তাঁহাকে আপন অভিযোগের কথা জ্ঞাপন করিলেন। ভক্তবৎসল ভূতনাথও আপনার মস্তকে ত্রিধারা দিয়া

দুগ্ধ প্রবাহিত করিলেন। সন্ন্যাসী মিনতি করিয়া এই বর প্রার্থনা করিলেন যেন এই দুগ্ধ চিরদিনই সমানভাবে বহিতে থাকে।

সেই অবধি ত্রিধারা দিয়া দুগ্ধ পড়িত, অবশেষে সেই সিদ্ধপুরুষ অন্তর্হিত হইলে, দুগ্ধ বন্ধ হইয়া যায় এবং তৎ-পরিবর্ত্তে জল পড়িতে থাকে। টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়ে বলিয়া ইহার নাম "টপকেশ্বর" হইয়াছে।

আমি মুগ্ধনেত্রে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলাম গিরিতলস্থ বনভূমি, সে দিন যেন বসন্তের পূর্ণতা বিহ্বল বলিয়া প্রতীয়-মান হইতেছিল। সতেজ সরল শ্যামবর্ণ শাল, শল্মলী, পলাশ, মধুক প্রভৃতি বৃক্ষগুলি অপ্রান্ত নব নব পল্লব পুষ্পে ভূষিত, চ্যুত মুকুল মধুক ও বন পুষ্পের গন্ধে পবন সুরভিত। পাহা-ড়ের নানাবিধ বন্য বিহঙ্গমের কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীত যেন বন-দেবীদেরই শিবস্তোত্র পাঠের মত বলিয়া কর্ণের ভ্রম জন্মিতে-ছিল। বন্য মহিষ, চমরী গাভী, কোথাও বা হরিণদল নির্ভয়ে অধিকতর নির্ব্বিরোধভাবে যুগ্মে যুগ্মে চরিয়া বেড়াইতেছিল। আমি এই নিভৃত প্রদেশের এক প্রান্তে এই প্রকার বিরাট সৌন্দর্য্য দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলাম।

সেই মন্দিরের নিকটে দুই চারিজন সাধু বাস করিয়া

থাকেন। পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতে বিস্তর গুহা আছে এবং তথায় বহু সাধু সন্ন্যাসী বাস করেন। মধ্যে মধ্যে টপকেশ্বর দর্শনে আগমন করেন।

বৎসরের মধ্যে শিবচতুর্দ্দশীর দিন এইস্থানে এক বৃহৎ মেলা বসিয়া থাকে। নানাদেশ হইতে বহু যাত্রী তখন সমবেত হয়।

প্রকৃতির এই প্রকার লীলাক্ষেত্র কখনও দেখি নাই। এমন নির্জ্জন সাধনের স্থান বোধ হয় আর হয় না। আজ আমার ডেরাডুন আগমন সার্থক হইল।
স্থান পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। আমি নিকটস্থ একটী প্রস্তরের উপর বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। উদাস প্রাণে কত কি চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। সংসারের ভাবনা দূর হইয়া গেল—বিদেশে পরিজনবর্গকে একাকী রাখিয়া আসিয়াছি—এই চিন্তা কোথায় চলিয়া গেল।

টপকেশ্বরে আসিয়া যাহা দেখিলাম—জীবনে আর তাহা কখনও দেখিব না।

অনুসন্ধানে জানিয়াছিলাম—একজন সন্ন্যাসী উহার পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু মানুষের পূজাপেক্ষা প্রকৃতি প্রদত্ত পূজাই অতি সুন্দর। মস্তক দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া নির্ম্মল সলিল ধারা বহিতেছে—পবনদেব স্বয়ং চামর ব্যজন

করিতেছেন—বৃক্ষশাখা সকল দুলিতে দুলিতে ভক্তিবিহ্বল হইয়া অস্ফুট ভাষায় নানাবিধ স্তোত্র পাঠ করিতেছে—আর হিমালয় স্বয়ং বক্ষে করিয়া মহাদেবকে শোয়াইয়া রাখিয়াছেন। গুহাটী এরূপভাবে প্রকৃতিদেবী নির্ম্মিত করিয়াছেন যে, এক ফোঁটা বৃষ্টির জলও তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। ঝড়, বৃষ্টি, ঝঞ্ঝাবাত হইতে রক্ষা করিবার জন্যই সেই পাহাড়টীকে ঢালুভাবে ইহার উপর বক্ষা করা হইয়াছে। মানব কি ইহাপেক্ষা অধিকতর ভক্তি প্রদর্শন করিতে পারে?

এই জলধারা কোথা হইতে আসিতেছে এবং কোথায় যাই-তেছে ইহার জন্য বহু অনুসন্ধান হইয়াছিল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত উহার উৎপত্তি ও নিবৃত্তি কেহই স্থির করিতে পারেন নাই।

দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব আপনার পশ্চিমাসনে হেলিয়া পড়িলেন। প্রদর্শকদ্বয় বাসায় ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল আমিও আর কালবিলম্ব না করিয়া বাসার অভিমুখে ফিরিতে লাগিলাম।

বাসায় আসিতে প্রায় রাত্র ৯টা হইয়া গেল। আহা-রাদি সমাপনান্তে শয্যায় অঙ্গ ঢালিয়া সেই দিনকার দারুণ ক্লান্তি ও পরিশ্রম দূর করিলাম।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

তৎপর দিবস আমরা গুরখা পল্টনের আড্ডা দেখিতে গমন করিলাম। আড্ডাটী পাহাড়ের উপর স্থাপিত। ইহার গমন পথও অতিশয় দুর্গম। পাহাড় বক্ষঃ ভেদ করিয়া এই পথ প্রস্তুত হইয়াছে। আমাদেব একাগাড়ী অতি কষ্টে সেই পথে চলিতে লাগিল। পদে পদে বিপদ। কোন রকমে ঘোড়া পড়িয়া গেলে গাড়ী শুদ্ধ আরোহী একেবারে নিম্নে পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। প্রত্যেক দশ হাত অন্তর "সাবধানে গাড়ী চালাও" কথা সমূহ প্রস্তরে লিখিত আছে।

কলিকাতায় হাজার টাকা দামের ঘোড়াও এই চড়াইয়ে উঠিতে পারে না। একার ঘোড়াগুলি পাহাড়ীয়া এবং তাহারা এই পথে অভ্যস্ত বলিয়া অতি কষ্টে এই পথে গাড়ী টানিয়া লইয়া যায়। গুর্খা পল্টন দেখিয়া আমরা পাহাড়ের এক অন্যতম প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই স্থানটী অতি নির্জ্জন এবং সাধারণে ইহা অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারে না। আমাদের সঙ্গে যে দুইজন পাহাড়ীয়া পথ প্রদর্শক ছিল—তাহারাই আমাদিগকে এইস্থানে লইয়া আসিল।

পাহাড় গাত্র দিয়া এক নির্ঝরিণী প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। সেই জলে ছোট বড় নানা প্রকার সর্প ভাসিয়া যাইতেছে। এইরূপ ভীষণ স্থানে আসিয়া আমার বাস্তবিকই আশঙ্কা হইতে লাগিল। হঠাৎ সম্মুখস্থ বনে যেন একটী বৃহৎ পশু ছুটিয়া চলিয়া গেল বলিয়া বোধ হইল। আশঙ্কায় আমার হৃদয় আবো দুরু দুরু করিতে লাগিল।

প্রদর্শক বলিল যে, বনে ব্যাঘ্র ত আছেই তদ্ভিন্ন গণ্ডাব ভল্লুক প্রভৃতি অন্যান্য হিংস্র জন্তুও আছে।

এই স্থানটী বাস্তবিকই প্রকৃতির লীলাকানন। কত প্রকার কত জাতীয় বিহঙ্গম দেখিলাম তাহার ইয়ত্বা নাই। একটী পাখীর অপূর্ব্ব লেজ দেখিয়াছিলাম। উহার রং ত্রিবর্ণেব এবং দৈর্ঘ্যে বোধ হয় চারি ফুট হইবে। পাহাড়ে নানাজাতীয় পাখী দেখিলাম বটে, কিন্তু বাঙ্গালার পাখী একটীও দেখিতে পাইলাম না। আমি সেই স্থানে আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিলাম না।

আসিতে আসিতে আর একটী ঝরণা দেখিতে পাইলাম। পূর্ব্বে যে ঝরণাটী দেখিয়াছিলাম—উহা হইতে বোধ হয় দুই মাইল দূরে ইহা অবস্থিত। এই ঝরণাটী অতি ভীষণ। দুই ধারে পাহাড় মধ্যে একটী ভগ্ন পাহাড়, আর তাহারি উপর দিয়া এই অসীম জলরাশি ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে

নামিয়া আসিতেছে। সম্মুখে শ্বেত কৃষ্ণ প্রভৃতি নানাবর্ণের প্রস্তরে বাধা পাইয়া স্থানে স্থানে ইহা অন্য গতি হইয়া ফিরিয়াছে। কিন্তু যে স্থানে বাধা পাইয়াছে সেই স্থানেই ইহার গর্জ্জন যেন আরো ভয়ঙ্কর বলিয়া বোধ হইল। বাধা পাইয়া ক্রোধে গর্জ্জন করিতে করিতে অন্য স্থানে বেঁকিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু ক্রোধের চিহ্নস্বরূপ প্রচুর ফেনরাশি তথায় উদগীরণ করিতেছে। জলের এই প্রকার ভীষণ গর্জ্জন আমি অন্য স্থানে শ্রবণ করি নাই। স্থানটী বড়ই নির্জ্জন। যত স্থান দেখিয়াছি—এই প্রকার নির্জ্জন স্থান কোথাও দেখি নাই। এই স্থানটীতে একটী পাখী নাই—পশু নাই—এমন কি কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত নাই। শব্দের ভিতর মধ্যে মধ্যে নির্ঝরিণীর ভীষণ গর্জ্জন শ্রুত হইতেছিল।

আমার মনে হইল এই স্থানটী বোধ হয় পৃথিবীর বাহিরে অবস্থিত। বহুক্ষণ আমি বসিয়া এই অনাবিল নীরবতা উপভোগ করিলাম। বিরাট প্রকৃতি চতুর্দ্দিকে নীরবতা ছড়াইয়া আপন বিশালত্ব বিরাটতত্ত্বের পরিচয় দিতেছিল। আমি সমস্ত ভাবনা চিন্তা ত্যাগ করিয়া তন্ময় হইয়া বসিয়া রহিলাম।

কতক্ষণ এইভাবে বসিয়াছিলাম বলিতে পারি না।

সহসা পথপ্রদর্শক বলিল ঃ—"বাবু সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, এই জঙ্গলে নানাবিধ হিংস্র জন্তু বাস করে—আর এখানে অবস্থান করা নিরাপদ নহে।"

তাহার কথায় আমার চমক ভাঙ্গিল—আমি ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম যে, বেলা প্রায় সাড়ে পাঁচটা। এতটা রাস্তা যাইতে হইবে, সুতরাং অনিচ্ছা স্বত্বেও আমাকে সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে হইল। কিন্তু এমন নির্জ্জন স্থান, এমন সুন্দর পাহাড়, এমন সুন্দর নির্ঝরিণী পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আমার ইচ্ছা হইতেছিল না।

সেই দিবস বাসায় ফিরিতে আমাদের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। একে সেই দুর্গম পথ, তদুপরি সন্ধ্যা হইয়াছে —সুতরাং গাড়ী অতি সাবধানে নামিতেছিল। যাহা হউক অতি কষ্টে সে রাত্রে বাসায় ফিরিয়া আসিয়াছিলাম। বাসায় পৌঁছিতে প্রায় নয় ঘটিকা হইয়াছিল।

পর দিবস প্রাতে সহস্রধারা দেখিতে গমন করিলাম। গাড়ী আসিল, আমরা কিছু খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে লইয়া গাড়ীতে উঠিলাম।

গাড়ী সহস্রধারার অভিমুখে যাইতে লাগিল। ডেরাডুনে আসিয়া অবধি এরূপ সুন্দর পথ দেখি নাই। রাস্তার দুই পার্শ্বে অরণ্য সকল সারিবন্দি হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। যত-

দূর দৃষ্টি চলে ততদুব কেবল নিবীড় অরণ্যবাজি দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। তাবপব দুই ধাবে পাহাড়। পাহাড় শ্রেণী শেষ হইলে দেখি বড় বড় চা বাগান আসিয়া উপস্থিত হইল।

বাস্তাব দুই পার্শ্বে এক প্রকার বৃক্ষ দেখিলাম। উহা দেখিতে ঠিক বঙ্গদেশের নিম্ববৃক্ষের মত। সুন্দর শ্যামল ছোট ছোট পাতাগুলিতে গাছ পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমি ভাবিয়াছিলাম ইহা নিম্ববৃক্ষই হইবে—পরে জিজ্ঞাসায় জানিলাম ইহাদের নাম "টুন"। কিন্তু বাঙ্গালাব নিমের সহিত ইহাদের কোনও পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হইল না।

চারি মাইল রাস্তা অতিক্রম করিয়া একস্থানে গাড়ী আসিয়া থামিল। ঘোড়া পরিবর্ত্তন হইবে। এদেশেব নিয়ম এই যে, তিন চার মাইল অতিক্রম করিলেই ঘোড়া বদল করিতে হয়। পাহাড়ের উপর দিয়া পথ চলিয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয় এই প্রকার বন্দোবস্ত।

আমরা একটী "টুন" বৃক্ষের ছায়ায় আসিয়া বসিলাম। কচি কচি পাতাগুলি ধীরে ধীরে আমাদিগকে ব্যজন করিতে লাগিল। সারি সারি টুন বৃক্ষের এই অপরূপ শ্যামল শোভা দেখিতে অতি মনোহর। এই স্থানের নাম "জখন বারি ঘাট।" স্থানটী বড়ই মনোরম। বোধ হয় প্রকৃতিরাণী যেন শ্যামল বস্ত্রে শোভিতা হইয়া এই স্থানে অপরূপ সৌন্দর্য্য প্রকাশ

করিতেছেন। এই স্থানে কোনও লোকালয় নাই। পাহাড়ের নিম্নে পাহাড়ীয়ারা মাত্র বাস করে। এই জনমানব শূন্য স্থানটী দেখিয়া প্রাণে বড়ই আনন্দ হইল। শুনিলাম এই "টুন" বৃক্ষের মূল্য খুব বেশী।

এইরূপে বেলা ১১টার সময় আমরা রাজপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ডেরাডুন হইতে রাজপুর ছয় মাইলের উপর।

রাজপুর ডেরাডুনের একটী প্রধান সহব। এই ছয় মাইল রাস্তার ভিতর কোথাও লোকালয় দেখি নাই। রাজপুব বেশ ছোট সহর, এখানে বহু লোক বাস করিয়া থাকে। ইংরাজদেরও ছুই একটী হোটেল আছে। ভারতবর্ষীয়দিগের দ্বারা চালিত "নিউ ইণ্ডিয়ান হোটেল" বলিয়া আর একটী হোটেল আছে, ইহা ঠিক রাজপুর পোষ্ট আফিসের সম্মুখেই স্থাপিত। এই হোটেলে থাকিবার স্থান পাওয়া যায়। মুসৌরি যাইতে হইলে এই স্থান হইতে পনি, ঘোড়া, ড্যাণ্ডি বা কুলী লইতে হয়। রাজপুরে আসিয়া আমাদিগকে গাড়ী পরিত্যাগ করিতে হইল। কারণ গাড়ী যাইবার আর রাস্তা নাই। এইবার হয় ঘোড়ায় না হয় ড্যাণ্ডিতে যাইতে হইবে। আমরা যখন ইহা শুনিলাম, তখন মনে যে কি ভাব হইল, তাহা কি প্রকারে জানাইব।

বালাম চাউলের মুখাপেক্ষী ডিস্‌পেপসিয়াগ্রস্ত আমি বাঙ্গালী বাবু—আমাকে অশ্বপৃষ্ঠে বহু চড়াই, উৎরাই পার হইয়া তবে সহস্রঝারায় যাইতে হইবে! শাস্ত্রকারেরা যাহা দেখিলে "শত হস্ত দূরে" থাকিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন, আজ বিদেশে আসিয়া তাহারই পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া এই ভীষণ "চড়াই," "উৎরাই" পার হইতে হইবে! আশঙ্কায় আমার অন্তরাত্মা কম্পিত হইতে লাগিল। এই কয়দিনেই "চড়াই" "উৎরাই" অতিক্রম করিয়া পাহাড়ে উঠা কিরূপ কষ্টসাধ্য ব্যাপার তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছিলাম। পাঠক! বাঙ্গালা দেশে বসিয়া আপনারা আমাকে কাপুরুষ বলিতে হয় বলুন, কিন্তু সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া যদি এই কথা বলিতে পারেন, তবে আপনারও বাহাদুরী বুঝিতে পারিব। নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম, কিয়দ্দূর আসিয়া দেখি বহুসংখ্যক পাহাড়ীয়া ঘোড়া ও ড্যাণ্ডি লইয়া অপেক্ষা করিতেছে। তাহারা আমাদিগকে দেখিয়া "বাবু ড্যাণ্ডি চাই" "বাবু ঘোড়া চাই" বলিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইল। আমি মনে মনে সংকল্প করিলাম যে, জীবনে কখনও অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করি নাই, বার্দ্ধক্যে উপনীত হইতেছি—সে "সখ" যে কখন মিটিবে ইহা বলিয়া ত বোধ হয় না। এই পাহাড়ে আসিয়া যদি এই বহুদিনের সখটা মিটিয়া যায়—তবে

মন্দ হয় না। অনেক ভাবিয়া একজন ঘোড়াওয়ালাকে বলিলাম—"দেখ আমি কখনও ঘোড়ায় চড়ি নাই। তোমরা যাহা চাহিতেছ, আমি তাহা অপেক্ষা কিছু বেশী অর্থ দিব—তোমরা আমায় ঘোড়ায় চড়াইয়া লইয়া চল। কিন্তু তোমাদিগকে আমায় ধরিতে হইবে এবং অশ্বের বলগাও একজনকে ধরিতে হইবে।"

আমার কথা শুনিয়া তাহারা হাঁসিয়া অস্থির হইল। একজন বলিল ঃ—"বাবু, অশ্বের লাগাম ধরিয়া লইয়া যাইতে পারি—কিন্তু আপনাকে কি প্রকারে ধরিয়া লইয়া যাইব ?"

কথাবার্ত্তা অবশ্যই পাহাড়ীয়া ভাষাতেই হইতেছিল। আমি এই কয়দিবস ইহাদের দেশে আসিয়া পাহাড়ীয়া ভাষায় সামান্য অভ্যস্ত হইয়াছিলাম।

আমি বলিলাম ঃ—"তাহা না হইলে আমি ঘোড়ায় চড়িতে পারিব না।"

"বাবু আপনি ঘোড়ায় চাপিয়া চলুন—যদি পড়িয়া যান আমরা পারিশ্রমিক লইব না।"

"তোমরা ত পারিশ্রমিক লইবে না—কিন্তু আমার হাত পা ভাঙ্গিলে কি উপায় হইবে ?"

অনেক বাকবিতণ্ডার পর স্থির হইল যে, একটী খুব শান্ত ঘোড়া তাহারা আমায় প্রদান করিবে এবং একজন

মুখ ধরিয়া লইয়া যাইবে ও আর একজন আমার পার্শ্বে পার্শ্বে যাইবে।

আমি ভাবিয়াছিলাম যে, ঘোড়ায় চড়ার প্রস্তাব শুনিলে মাতুল হয় ত ভয় পাইয়া চীৎকার করিবে। সেই জন্য আমি উৎসাহের সহিত ঘোড়াওয়ালাদিগের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছিলাম।

আমাদের কথোপকথনের মধ্যে মাতুল বলিলেন :—"বাবা ঘোড়ায় চাপিয়া যাওয়াই ভাল। ড্যাণ্ডিতে গমন করিলে যদি দৈবাৎ কুলীদের পদস্খলন হয়, তাহা হইলে দেহ চুর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, অতএব ড্যাণ্ডি অপেক্ষা ঘোড়া অনেক ভাল।"

আমি ভাবিয়াছিলাম—মাতুল আমারই মত ঘোড়ায় চড়িতে ভীত হইবে। কিন্তু তাহা হইল না দেখিয়া ইহার কারণ কি জানিতে ব্যগ্র হইলাম। কথায় কথায় মাতুলের নিকট এই ইতিহাসটী বাহির করিয়া লইলাম। মাতুলের গ্রামে একজন পরামাণিক হাতুড়ে ডাক্তার আছেন। তিনি ম্যালেরিয়ার বৎসরে কলিকাতায় আসিয়া কোনও একজন ডাক্তারের বাসায় পাচকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তারপর কি একটী দোষে এক বৎসর পরে ডাক্তার তাহাকে বিদায় দেন। পরামাণিক দেশে গিয়াই ডাক্তার হইয়া

বসে। কুইনাইন ও ক্যাষ্টরওয়েল সম্বল করিয়া তিনি ব্যবসায় অবতীর্ণ হ'ন, এবং ক্রমে ক্রমে একজন বিখ্যাত ডাক্তার হইয়া পড়েন। প্রায় দশবার খানি গ্রামে এই ডাক্তার বাবু চিকিৎসা করিতে যাইতেন।

এই ডাক্তার মহাশয়ের একটী ঘোড়া ছিল। বহু বৎসর তাহাকে ব্যবহার করিয়া যখন তিনি দেখিলেন যে, সে বৃদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য হইয়াছে, তখন তিনি তাহাকে লইয়া কি করিবেন—এই চিন্তায় ব্যাকুল হইলেন। মাতুল শুনিয়া বলিলেন যে, ঘোড়াটী তাহাকে প্রাদান করা হউক, তিনি তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন। ডাক্তার ঘোড়াটী বিদায় করিতে পাবিলে বাঁচেন, সুতরাং তিনি আর কোন কথা না বলিয়া ঘোড়াটি মাতুলকে দান কবেন।

মাতুলেব পেট ভাতায় এক কৃষাণ ছিল। সেই ঘোড়ার ঘাস কাটিত এবং সেবা শুশ্রুষাদি করিত। মাতুল দিনকয়েক ভারী আরামে তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গ্রামে গ্রামে বেড়াইতেন। ঘোড়াটী বড়ই শান্ত ছিল, কারণ তাহার বদমায়েসী করিবার শক্তি তখন ছিল না।

এই ভাবে দিন কয়েক অতিবাহিত হইলে খাইতে না পাইয়া এবং যত্নের অভাবে ঘোড়াটী শমন সদনে উপস্থিত হইল। মাতুল এই কথাগুলি বলিয়া স্বদর্পে বলিলেনঃ—"বাবা

তোমার কোনও ভয় নাই। আমি তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইব। ঘোড়ায় চড়িতে বড় আরাম।”

আমি মাতুলের একান্ত ইচ্ছায় এবং কতকটা সখ মিটাইবার জন্য অবশেষে ঘোড়ায় চড়িতে সম্মত হইলাম।

আমরা যে স্থানে ঘোড়া ভাড়া করিতেছিলাম, সেই স্থান হইতে সহস্রঝারা চারি মাইল দূর। এই চারি মাইল চড়াই উৎরাই ভাঙ্গিলে তবে সহস্রঝারায় পৌছান যাইবে। আমি একটী পছন্দ করিয়া ছোট ঘোড়া লইলাম। মামাও নিজের পছন্দ মত একটী ঘোড়া লইলেন। একজন আমার ঘোড়ার বল্গা ধরিয়া ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে লাগিল এবং আর এক জন পার্শ্বে পার্শ্বে যাইতে লাগিল।

এই প্রকার দীর্ঘ ও উচ্চ পাহাড় আমি কখনও দেখি নাই। যেন তালবৃক্ষের ন্যায় সরলভাবে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই ঘোড়া কিছুতেই দৃকপাত না করিয়া অবলীলাক্রমে তাহার পৃষ্ঠে আরোহী লইয়া পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিল। মাতুল আমার পশ্চাতে আসিতেছিলেন এবং তিনিও নানাপ্রকার বাক্য-দ্বারা আমার উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেছিলেন। পর্ব্বতের সেই দীর্ঘ ও সরল পথ দেখিয়া বাস্তবিকই আমার প্রাণে আতঙ্ক

উপস্থিত হইল। আমি প্রাণপণ শক্তিতে জিনের অগ্রভাগ আকর্ষণ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

বড়ই দুর্গম পথ। হঠাৎ বিপদাশঙ্কা পদে পদে আমাকে উদ্বেলিত করিতেছিল। একবার যদি ঘোড়ার পদস্খলন হয়, তাহা হইলে দেহ চুর্ণ বিচুর্ণ হইয়া যাইবে! আমার জীবনের জন্ত তখন আর মায়া হইতেছিল না। মনে মনে ভাবিলাম যদি নির্ব্বিঘ্নে পাহাড়ের উপর না উঠিতে পারি, তাহা হইলে আমার এই সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা হইবে না। যাহার জন্ত জীবন বিপন্ন করিয়াছি সেটা দেখা অসম্পুর্ণ রহিয়া গেলে বড়ই ক্ষোভ উপস্থিত হইবে।

কি সুন্দর নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী। উপর হইতে নিম্নে এবং নিম্ন হইতে উপরে চারিদিকে ঘন নিবীড় অরণ্যানী। শ্যামল পল্লবাবৃত দীর্ঘাকার বৃক্ষগুলি সেই পাহাড় বক্ষ অবলম্বন করিয়া মনুয্যের ক্ষুদ্র শক্তিকে উপহাস করিবার জন্যই যেন তথায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

যতই উপরে উঠিতে লাগিলাম নানা প্রকার বৃক্ষ, ফুল, ফল ও বিহঙ্গমাদি দেখিতে পাইলাম। কত বর্ণের—কত বিভিন্নাকারের পাখী সেই পাহাড়ে দেখিয়াছিলাম তাহার ইয়ত্ত্বা নাই।

যে পাহাড়ীয়া বালক আমার অশ্বের বল্গা ধরিয়া লইয়া

যাইতেছিল—তাহাব অকুতোভয় দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। সেই পাহাড় যেন তাহার ক্রীড়াভূমি। কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ নাই—কোনও আশঙ্কা নাই। সেই ঘোড়টাকে লইয়া সে বেশ সহজভাবে উপবে উঠিতেছিল। তদুপরি তাহার শিক্ষাও অদ্ভুত। পশু যেন তাহার কথা-বার্ত্তা বেশ বুঝিতে পারিয়াই পর্ব্বতারোহণ করিতেছিল।

সন্মুখে হয়ত খানিকটা গহ্বব রহিয়াছে—বালক চীৎকার করিয়া বলিল "হুঁসিয়ার"। অশ্বটাও বালকের কথা শুনিয়া সেই স্থান বেশ সতর্কতার সহিত অতিক্রম করিল।

বালক অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছিল, আর নানা প্রকারে শিশ্‌ দিয়া ঘোড়াটাকে উৎসাহ প্রদান করিতেছিল।

বালক যেন ঘোড়াকে এই কথা বুঝাইতে চাহিতেছিল যে, তাহার যেন মান রক্ষা করা হয়। সে বড় মুখ করিয়া বাবুকে ঘোড়ায় তুলিয়াছে, বাবুর যেন কোনও অনিষ্ট না হয়।

ঘোড়াও এই সঙ্কেত বেশ বুঝিতে পাবিয়া অতি সন্তর্পণে আমাকে পৃষ্ঠে লইয়া ধীরে ধীরে চড়াই উৎরাই অতিক্রম করিতেছিল।

যতই অগ্রসর হই, ততই নূতন নূতন দৃশ্যাবলী আমার নয়ন সম্মুখে উদ্ভাসিত হইতেছিল। সেই সময়ে এই সকল

সুন্দর সুন্দর দৃশ্যাবলী দেখিয়া হৃদয়ে যে অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছিল—তাহা এখন আর ভাষায় বর্ণনা করিবার শক্তি আমার নাই।

এই সকল দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ আমরা সহস্রঝারায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

অশ্বপৃষ্ঠ হইতে যখন অবতরণ করিলাম, তখন ক্ষুধা তৃষ্ণায় ও ক্লান্তিতে আমার চৈতন্যলোপ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। একে সেই দুর্গম পথক্লেশ এবং অশ্বপৃষ্ঠে পরিভ্রমণ, তদুপরি স্থানের জলবায়ুর মাহাত্ম্যে আমাদের বড়ই ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল।

সামান্য বিশ্রাম করিয়াই আমাদের সঙ্গে যে খাদ্যদ্রব্যাদি ছিল—তাহা ভক্ষণ করিলাম। জীবনে এই প্রকার ক্ষুৎপিপাসায় কখনই কাতর হই নাই। সঙ্গের আনীত দ্রব্যাদি সমস্ত নিঃশেষিত হইয়া গেল, আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না দেখিয়া মাতুল আমার মুখপানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার সেই মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিলাম যে, এখনি সমস্তই নিঃশেষ হইয়া গেল, পরে যদি ক্ষুধার উদ্রেক

হয় তখন কি হইবে? পাহাড়ে ত কিছুই পাওয়া যায় না! আমার তখন সে সমস্ত ভাবিবার অবসর ছিল না। আহারান্তে ঝরণার জল পান করিয়া শরীর সুস্থ হইল। সহস্রঝারাকে স্থানীয় ভাষায় "সম্‌সা" কহে। সহস্রঝারা তিগোরি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। কি সুন্দর দৃশ্য! জীবনে এইরূপ সৌন্দর্য্য বোধ হয় আর কখনও দেখিব না। লোকালয় নাই, জন মানবের সাড়াশব্দ নাই, সেই স্থান অতীব নির্জ্জন, অতীব মনোরম। অতি উচ্চ পর্ব্বত হইতে জলধারা সবেগে গর্জ্জন করিতে করিতে ছুটিয়া আসিতেছে। সে বেগ এত ভীষণ যে, আসিতে আসিতে পাহাড়ের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চূর্ণ বিচূর্ণ করিতেছে।

সমুদ্র গর্জ্জনের ন্যায় সেই শব্দ, কেবলমাত্র সেই স্থানে দিবারাত্র মুখরিত হইতেছে। এই বিরাট নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিবার জন্যই বোধ হয় হিমালয়ের তুষার মণ্ডিত বক্ষের উপর দেবাদিদেব এই অসীম অনন্ত জলঝারা বসাইয়া দিয়াছেন।

সহস্রঝারার জল অতি পরিষ্কার ও সুস্বাদু। পান করিলে, কি পান করিতেছি বুঝিতে পারা কঠিন হইয়া উঠে। এইপ্রকার সুস্বাদু নীর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। দুগ্ধ, ইক্ষুরসও ইহার নিকট তুলনা হয় না। তারপর ইহা এত

শীতল যে, পান করিলে আকণ্ঠপূর্ণ পিপাসায়ও শান্তি পাওয়া যায়।

আমাদের দেশে একটী মেয়েলী প্রবাদ বাক্য আছে যে, জল খাইলে পাথরও জীর্ণ হইয়া যায়। তাঁহারা বোধ হয় পরিশ্রুত জলের উপকারিতা দেখিয়াই এই বাক্যের সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন।

এক ঘণ্টা পূর্ব্বে উদর পূর্ত্তি করিয়া যে লুচী, তরকারী মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিয়াছিলাম, তাহা এক্ষণে সমস্তই হজম হইয়া গেল। আবার ক্ষুধার উদ্রেক হইতে লাগিল। সুতরাং প্রবাদ বাক্যের সার্থকতা সে দিবস বেশ উপলব্ধি করিয়াছিলাম। আমরা নানা স্থান পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এতপ্রকার বিভিন্ন জাতীয় বিহঙ্গম হরিদ্বারেও দেখি নাই। কোন কোনটী অতি বৃহদাকার এবং কোন কোনটী বা অতি ক্ষুদ্রাকার। তারপর নানাবর্ণের বিচিত্র সমাবেশ। একটী পাখী দেখিলাম খানিকটা লাল এবং কাল—লেজটী হরিদ্রাবর্ণের এবং মুখটী সাদা। পাখীগুলির স্বরও অতিশয় সুমিষ্ট। জনমানবের সাড়াশব্দ নাই বটে কিন্তু এই জলকল্লোল ও পখীকূজন শ্রবণ করিলে আর লোকালয়ে ফিরিতে ইচ্ছা করে না। তারপর বৃক্ষ ও লতাদির কথা কত বলিব। পাহাড়ে কত বর্ণের কত

প্রকারের লতা ও গুল্ম দেখিয়া আসিয়াছি—সে সমস্ত কথা আনুপূর্ব্বিক লিখিতে গেলে একটী স্বতন্ত্র প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়ে।

আমরা একটী শ্বেতবর্ণের প্রস্তরের উপর বসিয়া সহস্র-ঝারার অপরূপ সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে লাগিলাম। কতক্ষণ বিভোর হইয়া এই ভাবে বসিয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। হঠাৎ মস্তকোপরি সূর্য্যের প্রখব রশ্মিবাশি পড়িয়া আমাদের সৌন্দর্য্য দর্শনের পথে বাধা জন্মাইয়া দিল। আমি সেই স্থান ত্যাগ কবিলাম। মনে ভাবিলাম,. আব কিছু কি এই স্থানে দর্শনীয় বস্তু নাই? আমরা ত কিছুই জানি না। সেই পাহাড়ীয়া বালককে জিজ্ঞাসা করায় বলিল—"হাঁ বাবু এই স্থানে আর একটী দর্শনীয় জিনিস আছে—সেটী গন্ধ-কের পাহাড়। মধ্যে মধ্যে দুই একজন সাহেব ও বাবু আসিয়া উহা দেখিয়া থাকেন। আমি একবার একজন সাহেব ওএকজন বাবুকে লইয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু সে পথ ইহাপেক্ষা আরোও দুর্গম। আপনারা তথায় যাইতে পারিবেন কি?"

কথাটা শুনিয়া আমার মনে বড়ই আনন্দ হইল। মাতুল কিন্তু বলিলেন:—"না—বাবা—আর গন্ধকের পাহাড়ে যাইয়া কাজ নাই। বেলা অপরাহ্ন হইতে চলিল। এদিকে

ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে, এখন গন্ধকের পাহাড়ে গমন করিলে বাসায় ফেরা কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে।"

আমি যাহা কবিব বলিয়া সংকল্প করি, তাহা না করিয়া ছাড়ি না, ইহাই আমার চরিত্রের বিভিন্নতা। দোষ বলিতেহয় বলুন, গুণ বলিতে হয় বলুন, আমি এই প্রকারেই জীবন যাপন করিয়া অর্দ্ধ শতাব্দী অতিবাহিত করিলাম।

আমি পাহাড়ীয়া বালককে গন্ধক-পাহাড়ে লইয়া যাইবাব জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলাম। তারপর মাতুলকে বলিলাম :—"তুমি এই স্থানে আমার জন্য অপেক্ষা কর, আমি গন্ধক পাহাড় দেখিয়া আসি।" আমার ধারণা ছিল মাতুল একাকী থাকিতে কথনই সম্মত হইবে না, সেই ভরসায় বালককে লইয়া আমি অগ্রসর হইলাম। অবশেষে তাহাই ঘটিল। মাতুল আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিলেন এবং বলিলেন :—"না বাবা একাকী আমি এখানে থাকিতে পারিব না, তাহা হইলে আমায় বাঘ, ভাল্লুকে খাইয়া ফেলিবে। চল না হয় তোমার সহিত গমন করি।" বাস্তবিকই পথ অতি দুর্গম। আবার সেই চড়াই উৎরাই, তদুপরি মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাপ্রকার গহ্বর।

প্রস্তরগুলির উপর পা দিবার উপায় নাই। একটীর

উপর পা দিলে অমনি পা পিছলাইয়া যাইবে। তারপর অতি সন্তর্পণে সেই সকল গহ্বর উলঙ্ঘন করিতে হয়।

বাস্তবিকই আমার অতিশয় কষ্ট হইতেছিল। পথ ত এই প্রকার, তদুপরি দুই ধারে অতি বিজন অরণ্য। এই প্রকার নিবীড় বৃক্ষরাজির সমাবেশ আর কোথাও দেখি নাই। আমার মনে হইতে লাগিল, এখনই বাঘ বহির্গত হইয়া আমাদিগকে খাইয়া উদর পূর্ত্তি করিবে।

মাতুল এই বিপদে বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। তিনি প্রথমে শান্ত হইয়া আসিতেছিলেন, তারপর ক্রমশঃ যত পথ দুর্গমাকার ধারণ করিতেছিল, তিনি ততই চীৎকার করিতেছিলেন।

মাতুল বলিলেন :—"এইবার নিঃসন্দেহে প্রাণটা গেল। আজ কাহার মুখ দেখিয়া বহির্গত হইয়াছিলাম বলিতে পারি না। তোমার সঙ্গে না আসিলেই হইত। অতি কুক্ষণেই যাত্রা করিয়াছিলাম—অবশেষে বিদেশে আসিয়া প্রাণটা খোয়াইতে হইল। বাবা ফিরিয়া চল—এত কষ্ট তুমি সহ্য করিতে পারিবে না। এখনও সময় আছে আর বিলম্ব করিও না।"

আমি মাতুলের কথায় কর্ণপাত না করিয়া নীরবে

অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এই প্রকাবে সেই দুর্গম পিচ্ছিল পথ অতিক্রম করিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে—অতিশয় শ্রান্ত-দেহে গন্ধক পাহাড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

পথের কষ্টের কথা আব বিস্তৃত কি বলিব। বাঙ্গালার সমতল ক্ষেত্রে বসিয়া সহস্র কল্পনাতেও পাঠক এই কষ্ট অনুভব করিতে পারিবেন না।

গন্ধক পাহাড় দেখিয়া আমাব এই সমস্ত পরিশ্রম হইল। এই ভয়ানক পথ, পদে পদে বিপদরাশি—তারপর আমি ক্ষুধা তৃষ্ণার পীড়া সমস্তই বিস্মৃত হইয়া গেলাম। বাজারে গন্ধক বিক্রীত হয় চিরদিন উহাই দেখিয়া তেছি, কিন্তু গন্ধকের পাহাড় ত কখনও চক্ষে দেখি নাই। সুতরাং এই অভিনব দৃশ্য দেখিয়া আমার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল।

গন্ধক পাহাড় হইতে ফোয়ারার ন্যায় অনবরত কল্‌-কল্‌ ধ্বনি করিয়া জল বহির্গত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে পর্ব্বতে বাধা পাইয়া জল আটকাইয়া গিয়াছে এবং সেই স্থানগুলি গন্ধকে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

জলেও গন্ধকের গন্ধ। মাতুল যখনই শ্রবণ করিলেন যে, এই জল পান করিলে সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ আরোগ্য হয় এবং শরীর হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ হয়, তখন তিনি অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া সেই জল পান করিতে লাগিলেন।

শুনিলাম সাহেবেরা এই জল বোতল পূর্ণ করিয়া লইয়া যান। জলেব এই প্রকার উপকারিতার কথা শুনিয়া আমিও অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া জল পান করিতে লাগিলাম। মাতুল আমাকে জল পান করিতে দেখিয়া তিনি আবার আসিয়া জল পান করিলেন।

আমি একটী প্রস্তরের উপব বসিয়া এই গন্ধক পাহাড়েব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যবাশি দেখিতে লাগিলাম।

অতি মনোরম দৃশ্য! পর্ব্বতাভ্যন্তর হইতে স্বচ্ছ সলিল অবিরাম ধারায় বাহির হইয়া আসিতেছে। পাহাড়ে বাধা পাইয়া সেই জল কতক গন্ধকাকার ধারণ করিতেছে, আবার কতক বা পর্ব্বতের তলদেশ দিয়া নিম্নে প্রবাহিত হইতেছে। এই দৃশ্য দেখিতে অতি সুন্দর এবং ভাষায় উহা প্রকাশ করা অসম্ভব।

আমরা পরীক্ষার্থ একটী রৌপ্যমুদ্রা জলে ডুবাইয়া দেখিলাম উহা তাম্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে। টাকাটী ঠিক যেন একটী ডবল পয়সার মতন দেখাইতে লাগিল। পথ প্রদর্শক সেই পাহাড়ীয়া বালক বলিল—"বাবু, এইবার এই স্থান হইতে না বহির্গত হইলে আমরা আর সহরে ফিরিতে পারিব না, পথিমধ্যে রাত্র হইলে ব্যাঘ্রাদি পশু আমাদিগকে খাইয়া ফেলিবে, সুতরাং এই সময়ে বাহির হওয়া আবশ্যক।"

মাতুল এই কথা শুনিবাই আমাব বাহুদ্বয় সবলে আকর্ষণ কবিয়া বলিলেন—"বাবা, আব কাজ নাই ফিবিযা চল, আমি আমাব জন্য তত্টা ভাবিতেছি না, কিন্তু তোমাব জন্য আমাব অতিশয় ভাবনা হইতেছে। শীঘ্র চল বাবা, আব এক মুহুর্ত্তও এই স্থানে থাকিয়া কাজ নাই।"

মাতুলেব কথায় আমাব সেইস্থান পবিত্যাগ কবিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। সেই সুন্দব প্রাকৃতিক দৃশ্য জীবনে আব হয়ত কখন দেখিতে পাইব না, এই সমস্ত ভাবিয়া আমাব একপদও অগ্রসব হইতে ইচ্ছা হইতেছিল না।

যাহা হউক মাতুলেব কাতবোক্তিতে এবং অবশেষে পথিমধ্যে বিপদগ্রস্থ হইব এই চিন্তা কবিয়া অনিচ্ছাসত্বেও আমবা সেই স্থান পবিত্যাগ কবিলাম। পথ অতি দুর্গম বলিয়া আমবা দুই মাইল আগে অশ্ব পবিত্যাগ কবিয়া আসিয়াছিলাম, এবং সেই স্থানে আব একজন পাহাড়ীয়াকে প্রহবী স্বরূপ বাখিয়া আসিয়াছিলাম। আসিতে আসিতে বড়ই কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। পথকষ্টে শবীব যেন ক্রমশঃ অবশ হইতে লাগিল। তদুপবি ক্ষুৎপিপাসায় আমবা বড়ই কাতর হইয়া পড়িলাম।

আসিতে আসিতে একটী প্রকাণ্ড আম্র বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হইল। চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতবেষ্টিত এই স্থানটী বড়ই মনোবম।

সম্মুখে পর্ব্বত—পশ্চাতে পর্ব্বত—যেন পর্ব্বতমালায় উহা বেষ্টিত আছে। আমরা বিশ্রামার্থ সেই স্থানে যাইয়া উপবেশন করিলাম।

চারিদিকে অপরূপ সৌন্দর্য্যরাশি। চক্ষুদ্বয় আবার নূতন খাদ্য পাইয়া পুলকিত হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিক নির্নিমেষ নয়নে দেখিতে লাগিলাম। এই অপরূপ নব সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমার ক্লান্ত দেহে আবার উৎসাহ ফিরিয়া আসিল। আমি আবার দ্বিগুণবলে বলীয়ান হইয়া চলিতে লাগিলাম।

মাতুল চতুর্দ্দিকে আহারন্বেষণ করিতেছিলেন। কিছুই দেখিতে না পাইয়া বলিলেন—"বাবা! এখানে কি বাস্তবিকই কিছু পাওয়া যায় না?"

আমি বলিলাম—"গাছ পালা, লতা পাতা, ফুল ফল, জল—পাহাড় এই সকলই এখানে পাওয়া যায়। যে স্থানে লোকালয় নাই, সেই স্থানে আহারীয় দ্রব্য কোথা পাওয়া যাইবে।"

মাতুল আমার কথা শুনিয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কি করিবেন উপায় নাই দেখিয়া নীরবে চলিতে লাগিলেন।

এই স্থানের বায়ু বরফাপেক্ষা শীতল। চ্যুত মুকুলের গন্ধ বহন করিয়া তত্রস্থ সমীরণ যখন আমাদিগকে ব্যজন

করিতেছিল, তখন বেশ বোধ হইতেছিল যে, কে যেন বরফ জলে আমাদিগকে সিক্ত করিয়া দিতেছে। অদ্যকার এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আমায় উন্মাদ করিয়া তুলিল। আমি মুগ্ধনেত্রে চতুর্দ্দিক দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এই সকল পর্ব্বতশ্রেণী তিহোরি মহারাজের সম্পত্তি। পর্ব্বতে এবং অরণ্যে বিস্তর বন্য জন্তু আছে। ব্যাঘ্র, ভল্লুক, হস্তী প্রভৃতি বন্য জন্তুতে এই সকল অরণ্য পরিপুর্ণ। সন্ধ্যার পর এই সকল স্থানে জন সমাগম একেবারে বন্ধ হইয়া যায়।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া একস্থানে দেখিলাম যে, তিহোরী মহারাজের সৈন্য শিবির পড়িয়াছে। প্রায় দুই শত আন্দাজ সৈন্য সেই ছাউনিতে রহিয়াছে। ইহারা শীকার উপলক্ষে এই জঙ্গলে আসিয়াছে। অদূরে কতিপয় সৈন্য লক্ষ্যভেদও শিক্ষা করিতেছে।

ক্রমশঃ দিবা অবসান হইয়া আসিল। আমরা দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলাম। কারণ পাহাড়ীয়া বালক ক্রমাগত বলিতে লাগিল "বাবু শীঘ্র চলুন, বিলম্বে এই জঙ্গলে বন্য পশু কর্ত্তৃক প্রাণ হারাইতে হইবে।"

তাহার সেই তৎকালীন ব্যগ্রতা ও মুখের আগ্রহভাব এখনও আমার মনে জাগরিত হইয়া রহিয়াছে। ঘোড়া-

গুলিও এত শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান যে, তাহারাও যেন ইহাদের বিপদাশঙ্কা বুঝিতে পারিয়া আরোহণের সময় যে বেগে উপরে উঠিয়াছিল, তদপেক্ষা দ্বিগুণ বেগে নিম্নে অবতরণ করিতে লাগিল।

এই প্রকারে দ্রুতবেগে আমবা সন্ধ্যার সময় রাজপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। রাজপুরে আমাদের গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল। গাড়ীতে উঠিয়া বাসায় যখন ফিরিলাম তখন অনেক রাত্র হইয়া গিয়াছে।

শরীর তখন এত অবসন্ন ও ক্লান্ত যে, বিন্দুমাত্র শক্তি নাই। ক্ষণিক বিশ্রামান্তে উদর পূর্ত্তি করিয়া আহার করিলাম। সহস্রধারার জলেব গুণে সে দিন আমরা দুইজনে বাসায় প্রস্তুত অর্দ্ধেক খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করিয়া ফেলিলাম। আহারান্তে নিদ্রাদেবীর শরণাপন্ন হইলাম।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন শয্যা ত্যাগ করিয়া দেখিলাম যে, গা, হাত ও পায়ে পর্য্যন্ত বেদনা হইয়াছে। জানুদ্বয় এত টাটাইয়াছে যে, উত্থান শক্তি প্রায় রহিত। কিন্তু সে সমস্ত গ্রাহ্য না করিয়া আমি "গুহ্য পানি" দর্শন করিতে গমন করিলাম।

এই "গুহ্য পানি" একটী সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য। কিন্তু স্থান অতি দুর্গম। পথে বিপদাশঙ্কাও আছে। দুই দিকে পাহাড়,মধ্যে অতি সংকীর্ণ পথ। এত সংকীর্ণ যে,অশ্বারোহণ করিয়া যাইবারও কোন উপায় নাই। আমরা এই পথ ধরিয়া প্রায় তিন মাইল অতিক্রম করিলাম। গমন করিতে করিতে পার্শ্বস্থ গাছে ও পর্ব্বতে আসিয়া প্রথম আমাদের গাত্রবস্ত্র ছিঁড়িল—তারপর উভয়েরি পৃষ্ঠদেশ ক্রমশঃ ক্ষত বিক্ষত হইল এবং রক্তধারা বহিতে লাগিল। আমি যে স্থানেই গমন করি মাতুলকে সঙ্গে লইয়া যাই। এক্ষেত্রেও মাতুলকে পরিত্যাগ করি নাই। মাতুলের পৃষ্টদেশ দিয়া যখন রক্ত বহির্গত হইতে লাগিল, তখন তিনি কখনও বা পাহাড় কখনও বা গাছ ইত্যাদিকে নানা প্রকার মধুর সম্ভাষণ করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন।

গমন করিতে করিতে দেখিতে পাইলাম যে, মাঝে মাঝে

ভুটিয়ারা বাস করিতেছে। তাহারা পর্ণ কুটীরে গৃহপালিত গরু, ছাগল, মেষ ইত্যাদি লইয়া পুত্র কলত্র সহ বেশ সুখে বাস করিতেছে। ভাবনা নাই, চিন্তা নাই, উদ্বেগ নাই, আশঙ্কা নাই উহারা তথায় নিরাপদে দিনগুলি সুখের সহিত কাটাইতেছে।

আমরা কিয়দ্দূর গমন করিয়া পথ স্থির করিতে না পারিয়া এক ভুটিয়ার কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

কুটীর প্রাঙ্গন অতি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। এত যত্নের সহিত সেই পর্ণকুটীর রক্ষিত হইতেছে যে, দেখিলে বোধ হয় রাজপ্রাসাদেও এত যত্ন দেখিতে পাওয়া যায় না।

আমাদের ডাকাডাকিতে একটী ভূটিয়া রমণী এক বালককে লইয়া উপস্থিত হইল। আমরা ভূটিয়া ভাষা বুঝি না—সেও আমাদের বাঙ্গালা ভাষা বুঝে না। তবে অনেক-বার "গুহ্যপানি" "গুহ্যপানি" বলাতে সে বুঝিতে পারিল যে, আমরা "গুহ্যপানি" দেখিতে যাইব এবং তজ্জন্য রাস্তার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।

ভাবে বুঝিতে পারিলাম যে, রমণী আমাদের বিপদে দুঃখিত হইয়াছে। সে তাহার পুত্রের সহিত যে ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল, তাহাতে স্পষ্ট সহানুভূতির চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। অবশেষে বালকটীকে রমণী আমা-

দিগকে পথ দেখাইয়া দিতে বলিল। বালক সেই ভূটিয়া রমণীর সন্তান এবং তাহার বয়স প্রায় দ্বাদশ বর্ষ হইবে। সে আমাদিগকে ইঙ্গিত করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে বলিল। আমরাও তাহার অনুগমন করিলাম। বালক অতি ক্ষিপ্রতার সহিত সেই দুর্গম পথে যাইতে লাগিল। তাহার দেশ—পথ ঘাট তাহাব সুপরিচিত, এমন কি প্রত্যেক পাথরটী পর্য্যন্ত তাহার পরিচিত। সুতরাং সে অতি দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিল। আমার মনে হইল যেন কাষ্ঠ-বিড়াল পাহাড়ের উপর হইতে লম্ফ দিয়া পাহাড়ান্তরে গমন করিতেছে।

তাহার সহিত গমন করিতে আমাদিগকে বেশ বেগ পাইতে হইয়াছিল। একে পার্ব্বত্য পথে অনভ্যস্ত—তদুপরি পূর্ব্ব দিনের পরিশ্রমে আমাদের শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত, কাজেই প্রতি পদক্ষেপে আমাদিগের কষ্ট হইতেছিল।

মধ্যে থামিবার জন্য বালককে ইঙ্গিতে অনেকবার ডাকিতে হইয়াছিল। হয়ত দেখিলাম সে দ্রুতবেগে অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে, আমরা অনেক পিছাইয়া পড়িয়াছি। বালকও আমাদের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া মাঝে মাঝে থামিতে লাগিল। মোটের উপর বালক সে দিন আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত করিয়া তুলিয়াছিল।

এই প্রকাবে আমবা একটী পার্ব্বত্য ঝবণাব নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ঝবণাটী অতি বৃহৎ এবং তাহাতে বেগও আছে। হঠাৎ পথিমধ্যে ঝবণা দেখিয়া আমাব মুখ শুকাইয়া আসিল। কি প্রকারে এই ঝরণা অতিক্রম করিব—এই চিন্তাই তখন প্রবল হইল।

দেখিলাম সেই ভুটিয়া বালক একটী লাঠির সাহায্যে অবলীলাক্রমে সেই ঝবণা পাব হইয়া গেল। তখন বুঝিলাম যে, ঝবণার জল অতি অল্প এবং আমরাও যষ্টিহস্তে ধীবে ধীরে ঝরণা অতিক্রম করিলাম। এই প্রকাবে আমবা "গুহ্য পানি" আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

বহুকষ্টে অবশেষে আমাদের এই অভিলষিত স্থানে উপস্থিত হইয়া মনে বড়ই আনন্দ হইল।

এই স্থান অতি ভয়ঙ্কর এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। একটী পাহাড় ববাবব চলিয়া আসিয়াছে। মধ্যে এক স্থানে আসিয়া বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং তাহার মধ্য দিয়া জল-ধারা প্রবাহিত হইতেছে। ঠিক বোধ হয় কে যেন পাহাড়-টীকে দুইভাগে চিরিয়া এই প্রকার কবিয়াছে। পাহাড়টী যে স্থানে বিভক্ত হইয়াছে। তাহাবদুই পার্শ্বদেশ সমতল এবং এই দুই স্থানে অরণ্য রহিয়াছে উহা এত নিবীড় যে, দিবা-ভাগেও কিছু দৃষ্টিগোচব হয় না। এই বন মধ্যে বহুসংখ্যক

হিংস্র ব্যাঘ্র, ভল্লুক, গণ্ডার, হস্তী প্রভৃতি বাস করিয়া থাকে। তাই বলিতেছিলাম যে স্থানটী অতি ভয়ঙ্কব।

কিন্তু প্রকৃতির এই উন্মুক্ত লীলাক্ষেত্র বড়ই নয়নাভিরাম। দুইধাবে অতি বিস্তৃত অবণ্য—লোকালয় নাই—জনকোলাহল নাই—তারপব পর্ব্বত মধ্য হইতে এই পবিত্র ধারা মহাশব্দে বহির্গত হইতেছে। জলের ভীষণ গর্জ্জনও সেই স্থানের ভীষণতা আরো বৃদ্ধি করিয়াছে।

পর্ব্বত গাত্র নিঃসৃত জলরাশি একটী ঝরণার সৃষ্টি করিয়াছে। যে স্থানে ঝবণা প্রবাহিত হইতেছে, সেই স্থান ভয়ঙ্কর অন্ধকারময়। এত অন্ধকার যে, নিকটস্থ মাতুলকে ও সেই ভুটিয়া বালককে আমি দেখিতে পাই নাই। গুহ্যপানির এই তমসাবৃত ভাব দেখিয়া মনে হয়, প্রকৃতি-দেবী যেন কঠোব হস্তে এই পর্ব্বতকে বিভক্ত করিয়া গুহ্য-পানির সৃষ্টি করিয়াছেন।

সেই ভীষণ অন্ধকাররাশি মথিত করিয়া আমি অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া ভুটিয়া বালক ও মাতুল চীৎকার করিতে লাগিল।

মাতুল বলিলেন—"বাবা—আর অগ্রসর হইও না—অন্ধকারে সাপ, ভল্লুক সবই থাকিতে পারে, আমার কথা শুন—ফিরিয়া এস।"

ভূঠিয়া বালকের চীৎকারধ্বনিতে বুঝিলাম সেও আমাকে অগ্রসর হইতে বারণ করিতেছে।

পাহাড়ে ময়াল সাপের ভয়টাই বেশী। মাতুলের কথায় আমার মনে একটু ভয়েরও উদ্রেক হইল। ইচ্ছা হইয়াছিল—একবার অগ্রসর হইয়া দেখি—উহার অপর পার্শ্বে কি আছে। আমার বোধ হইতেছিল অপর পার্শ্বে যাইলে আলো দেখিতে পাইব। কিন্তু মনের সংকল্প মনেই রহিয়া গেল। আমায় বাধ্য হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল।

সেই স্থান হইতে ভিন্ন পথে ভূটিয়া বালক আমাদিগকে লইয়া আসিল। পথে আসিতে আসিতে দেখিলাম যে, পাহাড়ের কোলে কোলে নানাবিধ ফুলের গাছ সমূহ রহিয়াছে। এই সকল বৃক্ষে শ্বেত, পীত, লোহিত প্রভৃতি নানা জাতীয় পুষ্প সমূহ প্রস্ফুটিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছিল। এই স্বাভাবিক পুষ্প কুঞ্জগুলি দেখিতে এত সুন্দর যে, দেখিলেই বোধ হয় কে যেন অতি যত্ন সহকারে ইহা স্থাপিত করিয়াছে। এই অযত্ন রক্ষিত অযত্ন রোপিত পুষ্প বাটিকাগুলি দেখিলে মনে হয়—প্রকৃতি দেবী যেন সহস্তে ইহাদের লালন পালনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আসিতে আসিতে দেখিতে পাইলাম যে, সেই অরণ্য মধ্যে এক নেপালি সন্ন্যাসিনী পর্ণকুটীর বাঁধিয়া বাস করিতেছেন।

আমরা যখন উপস্থিত হইলাম, তখন তিনি ধ্যানস্তিমিত নেত্রে বসিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ তাঁহার ধ্যানভঙ্গের জন্য অপেক্ষা করিলাম। কিন্তু তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল না দেখিয়া আমি অবনত মস্তকে তাঁহাকে বারংবার প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। শ্রেষ্ঠীর নিকট জিজ্ঞাসায় জানিয়াছিলাম যে, এই সন্ন্যাসিনী কত দিনের তাহা কেহই বলিতে পারেন না। অশীতিবর্ষ বয়স্ক যে সমস্ত বৃদ্ধেরা আছেন—তাঁহারাও বলিয়া থাকেন যে, ঐ ভাবেই তাঁহারা সন্ন্যাসিনীকে দেখিয়া আসিতেছেন। কিন্তু হঠাৎ দেখিলে তাঁহার এত বয়স হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। প্রশান্ত—সৌম্য শান্ত কমনীয়—মুখমণ্ডল, তদুপরি এক স্বর্গীয় জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হইয়া উহা অপূর্ব্ব শ্রী মণ্ডিত করিয়া দিয়াছে।

সন্ন্যাসিনীর কথা চিন্তা করিতে করিতে আমরা সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। রাত্রে আহারাদির পর দুইখানি কম্বলে শরীর আবৃত করিয়া নিদ্রার সুকোমল ক্রোড়ে অঙ্গ ঢালিয়া দিলাম।

প্রাতঃকালে উঠিয়া পুনরায় ভ্রমণ জন্য প্রস্তুত হইলাম। মাতুল অদ্য একেবারে বাঁকিয়া বসিলেন। পথশ্রমে তাঁহার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছে—তিনি ভ্রমণে অশক্ত বিছানায়

শয়ন করিয়া বার বার এই কথাই বলিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া সজোরে তাঁহাকে শয্যা হইতে তুলিলাম। অনেক সাধ্য সাধনার পর মাতুল আমার সহিত ভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

পথিমধ্যে রেলওয়ে পুলিশের সব্‌ইন্সপেক্টর মহাশয়ের সহিত আমার আলাপ হইল। লোকটী অতিশয় ভদ্র—তাঁহার কথাবার্ত্তায় আমি অতীব প্রীতিলাভ করিলাম।

আমরা প্রথমতঃ গুরু রামরায়ের সমাধি মন্দির দেখিতে গমন করিলাম। ডেরাডুনের মধ্যে ইহাই আদি অট্টালিকা। ১৭৬৪ সংবতে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। যে সময়ে এই মন্দির নির্ম্মিত হয়,সে সময় ডেরাডুন জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। দিবা-ভাগেও ব্যাঘ্র ও অন্যান্য হিংস্র জন্তুর ভয়ে কেহই একাকী বহির্গত হইতে পারিত না। গুরু রামরায় শিখেদের গুরু। ইনি কোন গুরু আমি তাহা অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই। তবে ইঁহার সমাধি মন্দির দেখিয়া বোধ হয়, ইনি একজন প্রসিদ্ধ মহাত্মা ছিলেন। প্রত্যহ শতধিক সাধু সন্ন্যাসী এই স্থানে ভোজন করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান মোহন্তদ্বয় লছমন দাস ও চরণ দাস। ইহাদের সহিত আমার আলাপ হইয়া গেল। মোহন্তদ্বয় অতি অমায়িক প্রকৃতির লোক। আমরা বাঙ্গালা দেশ হইতে

আসিয়াছি শ্রবণ করিয়া তাঁহাবা বিশেষ যত্নের সহিত আমাদিগকে দর্শনীয় বস্তুগুলি দেখাইতে লাগিলেন।

মোগল সম্রাটদিগেব সময় হইতে সাত মৌজা এই স্মৃতি-মন্দিরের জন্য ছাড় প্রদত্ত হইয়াছে। মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব পর্য্যন্ত এই ছাড় স্বীকাব কবিয়া গিয়াছেন। অধুনা আমাদেব ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্ত্তাও এই সাত মৌজা ছাড় প্রদান করিয়াছেন।

এই সাত মৌজার বাৎসরিক তিনলক্ষ টাকা আয় হয়। পূর্ব্বে পঞ্চাশ হাজার ছিল এক্ষণে ডেরাডুন সহর হইয়াছে বলিয়া আয়ও যৎপরোনাস্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই মৌজার আয় হইতেই সাধু সন্ন্যাসী ভোজন ইত্যাদি সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

১৭৪০ সংবতে গুরু রামরায়ের মৃত্যু হয়। তাঁহার চারি সহধর্ম্মিণী ছিল। পরস্পর চারিটি সমাধি মন্দির তাঁহাদের শেষ স্মতি বক্ষে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

স্বামী জউন কাটুন (Swami Jun—Ka-tun) নামে একজন শিখ ধর্ম্মাবলম্বী সন্ন্যাসীর মৃত্যু এইস্থানে হইয়াছে। মন্দির গাত্রে প্রস্তর ফলকে তাঁহার নাম ক্ষোদিত রহিয়াছে।

সমাধি মন্দিরের ভিতর গুরু রামরায়ের এক আলেখ্য

দেখিতে পাইলাম। সৌম্য—শান্ত—দীর্ঘাকার মূর্ত্তি। দেখিলে হৃদয় ভক্তিভরে নত হইয়া আইসে। মন্দিরাভ্যন্তর অনবরত ধূপ ধুনা ও লোবানের গন্ধে আমোদিত হইতেছে।

মোহন্তদ্বয় আমাদিগকে লইয়া "ঝাণ্ডা" দর্শন করাইয়া আনিলেন। শিখদিগের এই "ঝাণ্ডা" অনেকটা জৈনদিগের "ঝাণ্ডার" মত। কলিকাতায় জৈনদিগের পরেশনাথের উৎসব উপলক্ষে এই "ঝাণ্ডা" দেখিতে পাওয়া যায়। মাঘ মাসে এখানে একটী মেলা হইয়া থাকে। সেই সময়ে পঞ্চনদ প্রভৃতি প্রদেশ হইতে বিস্তর শিখ ও অন্যান্য জাতি আগমন করিয়া থাকেন।

সমাধি মন্দির সংলগ্ন "পাকশালা" দেখিলাম। এই স্থানে যে সকল সন্ন্যাসীরা ভোজন করে—তাহাদিগের জন্য আহার্য্য প্রস্তুত হয়। যাহারা অপরের প্রস্তুত খাদ্যাদি গ্রহণ করে না—তাহাদিগকে সিধা প্রদান করা হইয়া থাকে।

সমাধি মন্দির দেখিতে দেখিতে বেলা দশ ঘটিকা উত্তীর্ণ হইল। আমরা আর অপেক্ষা না করিয়া মোহন্তদ্বয়ের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

পথিমধ্যে আসিতে আসিতে একটী রুদ্রাক্ষ গাছ দেখিতে পাইলাম। ইহার পূর্ব্বে আমি কখনও রুদ্রাক্ষ গাছ দেখি নাই। যে বীজের জন্য হিন্দু এত অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন,

তাহার বৃক্ষ দেখিয়া আমার অত্যন্ত আনন্দ হইল। আমি সেই বৃক্ষমূলে বসিয়া পড়িলাম।

রুদ্রাক্ষ গাছের পাতা অনেকটা আতা পাতার মত। ফলগুলি সুপক্ক হইলে উহার খোসা ছাড়াইলে রুদ্রাক্ষ বীজ বাহির হয়। গাছে বিস্তর ফল হইয়াছে, আমি অতি কষ্টে কতিপয় কাঁচা ফল সংগ্রহ করিলাম।

অধুনা অকৃত্রিম রুদ্রাক্ষ বীজ পাওয়া যায় না। তাহার কারণ এই সকল ফল সুপক্ক হইলে সংগৃহীত হইয়া পাশ্চাত্য দেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য দেশ—অর্থাৎ জার্ম্মানী ও আমেরিকায় রুদ্রাক্ষের যথেষ্ট আদর আছে। পাশ্চাত্য দেশবাসী অর্থবান—তাঁহারা উচ্চ মূল্যে উহা ক্রয় করিয়া থাকেন। আমরা সস্তায় রুদ্রাক্ষ অন্বেষণ করি, কাজেই আসল জিনিষ কোথা হইতে পাইব?

মাতুল সহসা বলিলেন—"বাবা! ক্ষুধায় আমার পেট জ্বলিতেছে। এক্ষণে বাটী ফিরিয়া চল—আহারান্তে আবার বাহির হইব।"

আমি মাতুলের কথায় কোন প্রতিবাদ না করিয়া বাটী ফিরিলাম। আসিতে আসিতে আর একটী কাঁটাল গাছ রাস্তার মধ্যে দেখিয়াছিলাম, অতবড় কাঁটাল গাছ আর আমি কখনও দেখি নাই। দেখিতে ঠিক বৃহৎ বটবৃক্ষের

মত। গাছে অসংখ্য কাঁটাল ধরিয়াছে। নদীয়া জেলায় যে প্রকার বৃহদাকার কাঁটাল গাছ দেখিতে পাওয়া যায়—ইহা ঠিক সেই প্রকার। তবে কাঁটালগুলি শুনিলাম খুবই সুমিষ্ট হয়। এচোঁড় দেখিয়া মাতুলের রসনায় জল আসিল—তিনি লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া তিন চারিটা বড় বড় দেখিয়া এঁচোড় সংগ্রহ করিলেন।

আমি বলিলাম—"মাতুল বিদেশে আসিয়াছ—সরকারী রাস্তার গাছের ফল না বলিয়া গ্রহণ করিতেছ। কোতোয়াল দেখিতে পাইলে এখনি তোমায় লইয়া গিয়া সরকারী আতিথ্য গ্রহণ করাইবে।"

মাতুল বলিলেন—"বাবা অত ভয় করিলে বিদেশে আসা চলে না। তোমার কোনও ভয় নাই। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ—কেহই আমার কিছু করিতে পারিবে না।"

কথোপকথন করিতে করিতে বাসায় আসিলাম। আহারান্তে বেলা একাদশ ঘটিকার সময় আমরা নালাপানি দেখিবার জন্য পুনরায় বহির্গত হইলাম। এখানকার গাড়ীকে টঙ্গা বলে। আমাদের টঙ্গাওয়ালা বৃদ্ধ অতি সরল ও অমায়িক প্রকৃতির লোক। আমরা তাহাকেই নিযুক্ত করিলাম।

পথে যাইতে যাইতে আমাদের সেই পূর্ব্ব পরিচিত

পাহাড়ীয়ার সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমরা তাহাকে পথ দেখাইবার জন্য সঙ্গে লইলাম।

হঠাৎ পথিমধ্যে প্রবল বৃষ্টিধারা পড়িতে লাগিল। কিন্তু তখন আর উপায় নাই। সর্ব্বশরীর ও পরিধেয় বস্ত্র ভিজিয়া গেল—তথাচ আমি, সুন্দর লাল পথপ্রদর্শক ও মাতুলকে লইয়া চলিতে লাগিলাম।

টঙ্গাওয়ালা বলিল—"বাবু অদ্য না বাহির হইলেই ভাল হইত। বৃষ্টিতে পাহাড় গাত্র কর্দ্দমাক্ত হইয়া উঠিবে। তাহাতে আপনাদের বড়ই অসুবিধা হইবে।"

মাতুল এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। এখন শীতে তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল, তিনি আমাকে তীব্র ভৎসনা এমন কি অভিসম্পাত পর্য্যন্ত করিতে লাগিলেন।

যাহা হউক সহস্র অসুবিধা ও অসহনীয় কষ্ট ভোগ করিয়া পর্ব্বতের নিম্ন দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

এইবার মাতুলের অভিসম্পাত হাড়ে হাড়ে ফলিল। এত দেশ ভ্রমণ করিলাম—এত চড়াই উৎরাই অতিক্রম করিলাম—কিন্তু নালাপানীতে যে কষ্ট পাইয়াছি, তাহা জীবনে কখন ভুলিব না।

বৃষ্টি হওয়াতে পর্ব্বত গাত্র অতিশয় পিচ্ছিল হইয়াছে। তাহার উপর আরোহণ করিতে গিয়া—কতবার পড়িয়াছি,

কতবার উঠিয়াছি তাহা বর্ণনাতীত। পথশ্রমে ভয়ঙ্কর কষ্ট উপস্থিত হইল। এমন কি দমবন্ধ হইবার উপক্রম হইল।

প্রায় তিন মাইল উপরে উঠিয়াছি। এখন আর অবতরণ করিয়াও কোন ফল নাই। কারণ গাড়ী নিকটে নাই যে, নামিয়া উহাতে চড়িয়া বসিব। যাহা হউক প্রাণ ওষ্ঠাগত করিয়া অবশেষে অভিলষিত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

পাহাড়েব উপব দেশে একখানি মাত্র পর্ণকুটীবে এক সাধু বাস করিতেছেন—দেখিতে পাইলাম। আমরা তাঁহার নিকটে গিয়া ক্লান্তদেহে উপবেশন করিলাম। ক্ষণিক বিশ্রা, মের পব যখন ক্লান্তি সামান্য বিদূবিত হইল—হঠাৎ মাতুল চীৎকার করিয়া উঠিলেন। আমি ব্যাপার কিছু বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

মাতুল বলিলেন—"সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আমার চারি টাকা দামের জুতা জোড়াটী একেবারে ছিঁড়িয়া গিয়াছে। আর উহাতে পদার্থ নাই। আমি কি করিয়া বাটী ফিরিব। শুধু পায়ে চলিবারও শক্তি নাই—দেখ আমার পদদ্বয় ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে।"

বাস্তবিকই জুতা উন্মোচন করাতে দেখিলাম মাতুলের পাদদেশ রুধিরাক্ত হইয়াছে। আমার জুতা জোড়াটী মজবুত ও নূতন ছিল বলিয়া এই প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই।

সন্ন্যাসীপ্রবর আমাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। মৃদু তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"বাবা এমন কাজ করিতে আছে? আত্মাকে কষ্ট দিলে কোন কাজই সফল হয় না। আমি প্রায় ত্রিশ বৎসর এখানে বাস করিতেছি, খুব কম লোকই এখানে এতটা আয়াস স্বীকার করিয়া আসিয়া থাকে। এমন কি সাহেবেরা পর্য্যন্ত আসিতে ভয় পান। একে অতি দুর্গম পথ—তদুপরি আজ বৃষ্টি হইয়া আরো ভীষণ হইয়াছে। যাহা হউক তোমরা পরিধেয় বস্ত্র ও জামাদি খুলিয়া শ্রান্তি দূর কর।"

নালাপানি ডেরাডুন হইতে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। তিন মাইল চড়াই ভাঙ্গিয়া পাহাড়ে উঠিতে হয়—বক্রী পথ টঙ্গা করিয়া আসিতে হয়।

সাধুর নিকট শুনিলাম—এই পাহাড়ের নামও নালাপানি পাহাড়। পাহাড়ের উর্দ্ধদেশ হইতে জলধারা উত্থিত হইয়া নালায় পড়িতেছে, তজ্জন্য ইহার নাম নালাপানি হইয়াছে। এই জল সমগ্র ডেরাডুনের অধিবাসীরা পান করিয়া থাকে।

পাহাড়ের উপর এক শিবমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। জগন্নাথ গিরি মহাদেবের পূজক ছিলেন। প্রায় এক বৎসর হইল তিনি মর জগত হইতে বিদায় লইয়াছেন। মন্দির মধ্যে তাঁহার ফটোগ্রাফ দেখিলাম। গিরির মৃত্যুর পর তাঁহার প্রধান শিষ্য পূজা করিয়া আসিতেছেন।

মন্দির মধ্যে একটী রুদ্রাক্ষ গাছ দেখিতে পাইলাম। এই গাছের নিম্নেই মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। মন্দির ভেদ করিয়া পাহাড়ের উপর রুদ্রাক্ষ গাছটী উঠিয়াছে। স্থানটী অতি নির্জ্জন ও মনোরম। সাধকের পক্ষে যে বিশেষ উপযুক্ত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

পাহাড়ের উপর বড় বড় বিল্ববৃক্ষ দেখিতে পাইলাম। বৈদ্যনাথে ও কাশীতে যে প্রকার অসংখ্য বিল্ববৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, এখানেও ঠিক সেই প্রকারই দেখিলাম।

ইতঃস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে একটী সমাধি-মন্দির দেখিতে পাইলাম। জিজ্ঞাসায় অবগত হইলাম ইহা নাত্মাসিং নামক একজন শিখ সন্ন্যাসীর স্মৃতি-মন্দির এবং তাঁহার প্রধান শিষ্য দেওয়া শঙ্কর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে।

স্থানটী অতিশয় মনোরম একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পাহাড়ের উপর এই নির্জ্জন প্রদেশে এই প্রকার সুন্দর স্থান আছে—ইহা কল্পনাতেও আইসে না। কষ্ট স্বীকার করিয়া

আসিয়াছিলাম বলিয়া আজ আমার একটী রমণীয় ও পবিত্র স্থান দৃষ্টিগোচর হইল।

যে স্থানে মহাদেবের মন্দির, সেই স্থানটী অতিশয় পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। বিজন অরণ্যের মধ্যে যে এই প্রকার পরিষ্কার স্থান আছে—তাহা সহজে অনুমিত হয় না। মধুর বন্য কুসুমের সুবাসে ও নানাজাতীয় বিহঙ্গমের কলকণ্ঠতানে স্থানটী যেন নন্দনকানন বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

যে স্থানে পাহাড়ের উপর "নালাপানি"—অর্থাৎ জল বহির্গত হইতেছে, সেই স্থানটীর চতুর্দ্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত। এখান হইতে পাইপ বসাইয়া সহরে জল লইয়া যাওয়া হইয়াছে। পম্পিং ষ্টেশন নাই, পরিষ্কার করিবার জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্তও নাই। কেবল মাত্র পাইপ সাহায্যে এই স্বভাব পরিশ্রুত স্বাস্থ্যকর জল সহরবাসীকে প্রদত্ত হইতেছে। জব্বলপুরেও নর্ম্মদার জল—এই প্রকারে সরবরাহ করা হইয়া থাকে।

পাইপ হইতে আবার কতক জল পড়িয়া যাইতেছে। এখানকার পাহাড়ীয়া রমণীরা কলসী ভরিয়া ঐ জল লইয়া যাইতেছে। ক্রমে অপরাহ্ণ হইয়া আসিল। আমরা আর অপেক্ষা না করিয়া বাসায় ফিরিলাম।

মিঃ এডওয়ার্ডের কথা বোধ হয় পাঠকের মনে আছে।

সন্ধ্যার সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। কথাবার্ত্তায় বহুক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেল।

আমরা ডেরাডুন ত্যাগ করিতেছি শুনিয়া তিনি অতীব দুঃখিত হইলেন। আরও দুই একদিন থাকিবার অনুরোধ করিলেন। কিন্তু আমার মন তখন লক্ষ্ণৌ দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে। সুতরাং সাহেবের অনুরোধ সত্ত্বেও লক্ষ্ণৌ যাত্রার আয়োজন স্থির করিলাম।

৮ই ফেব্রুয়ারী ২৬শে মাঘ রবিবার আমরা লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিলাম। রাত্রে রওনা হইয়াছিলাম। সমস্ত রাত্রি দিব্য আরামে গাড়ীতে ঘুমাইয়াছি। প্রভাতে নিদ্রা হইতে উঠিয়া দেখি পূর্ব্বদিক লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছে। বৃহৎ কাঞ্চন-থালার ন্যায় সূর্য্যদেব উদিত হইতেছেন। প্রভাত সমীরণ শিশির স্নাত হইয়া ধীরে ধীরে গাড়ীতে প্রবেশ করিতেছে। শীতল হইলেও প্রাতঃ সমীরণে বড়ই আরাম বোধ হইতে লাগিল। আমরা পাহাড়ের পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি, এমন কি উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। কেবল দুই পার্শ্বে বড় বড় ময়দান ধূ ধূ করিতেছে। মাঝে মাঝে কচিত শস্যক্ষেত্রও দৃষ্টিগোচর হইল।

মেল হু হু শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে! কাল রাত্রে কোথায় ছিলাম—আর আজ কোথায় আসিলাম! কোথায় পর্ব্বত-

াল বেষ্টিত প্রকৃতির লীলাকানন ডেরাডুন—আর কোথায় সমতল ক্ষেত্র সমন্বিত লক্ষ্ণৌ!

বেলা ৮টার সময় মেল Balamau (বালামউ) ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। দুই পার্শ্বে মুকুলভরা আম্রবৃক্ষের স্নিগ্ধ মধুর গন্ধ বাহির হইতেছে—সমীরণ মৃদু প্রবাহিত হইয়া শ্রান্তি বিদূরিত করিতেছে। সে কন্‌কনে পাহাড়ে শীত আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এখানকার বাতাস অতি মধুর ও স্বাস্থ্যকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

দুইদিকে যতদূর দৃষ্টিগোচর হইতেছে—কেবলই বড় বড় মাঠ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগল। বৃহদাকার গাভী ও মহিষেরদল সেই সকল মাঠে তৃণান্বেষণে ইতঃস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাখাল বালকগণ লাঠি হস্তে তাহাদিগকে তাড়না করিতেছে।

এইস্থানে শস্যক্ষেত্র আদৌ দৃষ্টিগোচর হইল না। কেবলই বিস্তৃত মাঠ মরুভূমির মত ধূ ধূ করিতেছে দেখিতে পাইলাম।

স্থানে স্থানে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত কূপ রহিয়াছে। গ্রাম্যরমণীরা ক্রোড়ে শিশু ও মস্তকে জলপূর্ণ কলসী লইয়া অবলীলাক্রমে চলিয়া যাইতেছে। বহুদূরে তাহাদের কুটীর অবস্থিত—নিকটেও কূপ নাই—কাজেই বাধ্য হইয়া কেহ

কেহ বা কলসীর উপর আর একটী কলস বসাইয়া লইয়া যাইতেছে। পশ্চিমে জলকষ্ট ভয়ঙ্কর। যাঁহারা একবার এসব স্থানে আসিয়াছেন—তাঁহারা ইহা বেশ উপলব্ধি করিয়াছেন।

এইবার মাঝে মাঝে অড়হর ক্ষেত্র দেখা যাইতে লাগিল। এতক্ষণ দুই পার্শ্বের মাঠগুলা যেন মুখ ব্যাদন করিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিতে আসিতেছিল—মেলও যেন সেই ভয়ে দ্রুত হইতে দ্রুততর গতিতে ছুটিতে ছিল।

ইহার পর Sandila (স্যাণ্ডিলা) ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। রাত্রে পাঞ্জাব মেলের সহিত আমাদের গাড়ী কাটিয়া জুড়িয়া দিয়াছিল সুতবাং আমাদিগকে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হয় নাই।

স্যাণ্ডিলা অতিক্রম করিবার পর শস্যক্ষেত্র ও লোকালয় দুইপার্শ্বে দেখা যাইতে লাগিল। বেলা নয় ঘটিকার সময় আমরা লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম।

দৈনিক দুই মুদ্রা ভাড়া স্বীকার করিয়া এক দ্বিতল অট্টালিকা ভাড়া করিলাম। আহারাদির পর দেহ অবসন্ন হইল। নালাপানির পরিশ্রম—রাত্রে মেলে ৯টা হইতে দিবা ৯টা পর্য্যন্ত ভ্রমণ—ইত্যাদি নানা কারণে শরীর শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ ক্লান্তি কোন দিনই হয় নাই। যাহা

হউক আহারান্তে বিশ্রাম করিয়া তিনটার সময় ভ্রমণে বহির্গত হইব—ইহাই স্থিব করিলাম।

মাতুল চটিয়া লাল হইয়াছেন। আমি অনর্থক ঘুরিয়া বেড়াই এবং সামান্য বিশ্রাম করিয়াই আবার ভ্রমণে বহির্গত হইব ইহাই তাঁহার চটিবার কারণ।

আমিনাবাদের উপর লাটুচ্ রোডেব উপর আমাদের বাসা। এখানে বহু বাঙ্গালী বাস করিয়া থাকেন। গোমতী নদীর জল পাইপ দ্বাবা সহরে সরবরাহ করা হয়। কিন্তু জল ডেরাডুনের নালাপাণির মত সুমিষ্ট নয়।

বেলা চার ঘটিকার সময় আমরা মিউজিয়ম দেখিতে গমন করিলাম। স্থানীয় ভাষায় ইহাকে "আজব ঘর" বলে। আজব ঘর লক্ষ্ণৌর মধ্যে একটী দেখিবার জিনিষ বটে। কলিকাতা মিউজিয়মের মত সুবৃহৎ ও নানাবিধ দর্শনীয় বস্তু পরিপূর্ণ না হইলেও ইহাতে দেখিবার জিনিষ অনেক আছে। ইহা একপ্রকার লক্ষ্ণৌ প্রদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে বাটীতে পূর্ব্বে আজব ঘর ছিল, তাহা নবাবদের ছত্রমঞ্জিলের প্রাসাদভুক্ত ছিল। বাড়ীটি আপাদ-মস্তক লোহিত বর্ণে রঞ্জিত বলিয় ইহাকে "লালবার-দোয়ারী" বলা হয়। "লালবারদোয়ারী" নবাবী নাম—ইংরা-জেরা ইহাকে Coronation Hall বলিয়া থাকেন।

এই স্থানে পূর্ব্বে অযোধ্যার নূতন নবাবদিগের অভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদিত হইত। নবাব যখন ছত্রমঞ্জিল প্রাসাদে থাকিতেন, সেই সময়ে "লালবার দোয়ারিতে" দরবারাদি বসিত। এই সময়ে ইহা "আমখাস" ও "দেওয়ানখাসের" কার্য্য করিত। মিউজিয়ম এক্ষণে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

ছত্রমঞ্জিলের "লালবাব দোয়ারি" ও "কৈসর বাগের চাঁদনী বারদোয়ারী" এই দুইটির মধ্যে লালবার দোয়ারীই অধিকতর প্রশস্তায়তন বলিয়া বোধ হইল। প্রথমোক্তটী অযোধ্যার পঞ্চম নবাব সদত আলি খাঁর আমলে নির্ম্মিত হয়। দ্বিতীয়টী নবাব ওয়াজিদ আলি সাহার কীর্ত্তি। এইরূপ জনশ্রুতি বারদোয়ারীর প্রশস্ত হলটীর আদ্যোপান্ত লোহিতবর্ণ মখমলে মণ্ডিত ছিল।

চাঁদনী বারদোয়ারীর অধিকাংশ রূপার পাতে মোড়া ছিল বলিয়া ইহা চাঁদনী বারদোয়ারী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। লালবার দোয়ারী দ্বিতল—ইহার উত্তর দক্ষিণে সুবিস্তৃত সোপান মালা। এই সোপানরাজির সহায়ে অভিষেক মন্দিরের মধ্যস্থ সুপ্রশস্থ দালানে উপস্থিত হওয়া যায়। দালানটীকে দেখিলেই একটী দরবার গৃহ বলিয়া বোধ হয়। গৃহটীর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিণ সৌন্দর্য্য যাহা কিছু সমস্তই গিয়াছে, এখন কেবল অতীতের স্মৃতির ন্যায়

তাহার কঙ্কালরাজি বর্ত্তমান। ইংরাজরাজ তাহাব উপর কারিকুরী করিয়া সেই জীর্ণ কঙ্কাল ঢাকিতে চেষ্টা করিয়াছেন—কিন্তু সম্যকরূপে কৃতকার্য্য হ'ন নাই।

মিউজিয়মের উপরতলায় প্রশস্ত দালানে প্রবেশ করিয়াই দক্ষিণ দিকে দৃষ্টিপাত কবিলে লক্ষৌব সুন্দর মৃত্তিকা নির্ম্মিত পুত্তলিকা ও খেলানাগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। মৃত্তিকার পুত্তলী নির্ম্মাণে লক্ষৌ আমাদের কৃষ্ণনগরের নিম্নেই আসন পাইবার উপযুক্ত। মৃত্তিকা নির্ম্মিত মূর্ত্তিগুলির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

মিউজিয়মে দেখিবার অন্যান্য জিনিষেব মধ্যে মুরাদাবাদের, আগরার, সাহারাণপুরের ও লক্ষৌর শিল্পকার্য্যগুলিই প্রধান। আগরার কারুকার্য্যময় দ্রব্যগুলির মধ্যে নানা গঠনবিশিষ্ট কাগচ চাপা, প্রস্তরময় ফলপুষ্প শোভিত কলমদান, কোমল পাথরের (Soap ston e) উপর খোদিত দ্রাক্ষাপত্র ও ফল, সাহেবদের কার্ড রাখিবাব পাত্র, মার্ব্বেল প্রস্তর নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্স ও কোমল পাথরের নির্ম্মিত এক অতি সুন্দর শিল্প কার্য্যময় খোদিত সর্পমূর্ত্তি। এতদ্ভিন্ন আগরা হইতে আনীত এক বৃহৎ চন্দনকাষ্ঠের দ্বার দেখিলাম। ইতিহাসে পড়িয়াছিলাম যে, সোমনাথ দেবের মন্দিরদ্বার চন্দন কাষ্ঠে নির্ম্মিত ছিল—মামুদ তাহা উঠাইয়া লইয়া

যান। এই চন্দন কাষ্ঠের দ্বার দেখিয়া আমার সেই বহুকালের পুরাতন কথা মনে পড়িয়া গেল।

ইহা ছাড়া মোরাদাবাদ, বুলন্দ সহর প্রভৃতি স্থানের পিত্তল নিৰ্ম্মিত কারুকার্য্যময় দ্রব্যাদি, নানাবিধ সতরঞ্চ ও কাষ্ঠ নির্ম্মিত সাহেবী খানার উপকরণ সমস্ত দেখিলাম। তাজমহলের এক হস্তীদন্ত নির্ম্মিত জীবন্ত প্রতিকৃতি দেখিতে পাইলাম। ইহার শিল্প-কৌশল চক্ষে না দেখিলে বুঝাইবার উপায় নাই।

মিউজিয়মের বাহিরে আসিয়াই দ্বারের সন্নিকটে আমরা মহারাজ সমুদ্র গুপ্তের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়ার প্রস্তরময় প্রতিকৃতি দেখিতে পাইলাম। এই প্রস্তরময় প্রতিকৃতি নেপালে পাওয়া গিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন আজবঘরে লক্ষ্ণৌয়ের নবাব ও রাজগণের কয়েকখানি চিত্রিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছবি, আগরা দুর্গ, তাজমহল, কুতবমিনার, গোয়ালিয়র দুর্গ, জুম্মা মস্‌জিদ, মতি মসজিদ প্রভৃতি বাদসাহী কীর্ত্তিসমূহের এক একখানি ফটোগ্রাফ আছে। বহুকালের নানারূপ বৌদ্ধমূর্ত্তি, বৌদ্ধযুগের নানাপ্রকার পাষাণময় মূর্ত্তি, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বের অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রাদি, নানাপ্রকারে দেব-দেবীর পাষাণমূর্ত্তি, জীবজন্তু ও পশুপক্ষী সমস্তই অতি যত্নের সহিত এই স্থানে সংরক্ষিত হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌ নগরীর অন্যান্য বিবরণ প্রদান করিবার পূর্ব্বে আমরা অতি সংক্ষেপে ইহার ঐতিহাসিক বিবরণ একটু প্রদান করিব।

লক্ষ্ণৌ একটী প্রকাণ্ড সহর! কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, রেঙ্গুন, করাচী, লাহোর ইত্যাদির নিম্নেই লক্ষ্ণৌয়ের নাম করা যাইতে পারে। বিখ্যাত পণ্ডিত স্যার উইলিয়ম হণ্টারও এই কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। দ্বাদশ ক্রোশ ব্যাপিয়া এই সহর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—এইজন্য ইহাকে "বারকোশিও" বলা হইয়া থাকে!

লক্ষ্ণৌ ষ্টেসন পার হইয়া ঠিক সম্মুখে একটী রাস্তা পড়ে, উহাকে আমিনাবাদের রাস্তা বলে। লক্ষ্ণৌএর মধ্যে আমিনাবাদ সর্ব্বাপেক্ষা জনপূর্ণ স্থান। কিয়দ্দূর আসিয়াই একটী বৃহৎ খালের উপর পৌছান যায়। খালটীর অবস্থা অতি শোচনীয়। খালের পোল পার হইলেই আমিনাবাদের মধ্যে প্রবেশ করা হইল। রাস্তার উভয় পার্শ্বেই বড় বড় বাড়ী। কলিকাতার যে কোনও গলির সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে।

লক্ষ্ণৌ সহরটী গোমতী নদীর তীরে স্থাপিত। কলিকাতা হইতে লক্ষ্ণৌ ৬১০ মাইল। লক্ষ্ণৌ ডিষ্ট্রীক্টের মোট জনসংখ্যা প্রায় ছয় লক্ষ। ইহার বর্ত্তমান উন্নতি নবাবদিগের সময়

হইতেই হইয়াছে। ইংবাজরাজও বহু রাস্তা, ঘাট, অট্টালিকা, বিদ্যালয় মন্দির, কলের জল, আলো ইত্যাদি সৃষ্টি করিয়া ইহাব উৎকর্ষতা আরো বৃদ্ধি করিয়াছেন। বহুকাল হইতে লক্ষ্ণৌ ও দিল্লী কালোয়াতী সঙ্গীত বাদ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। মুসলমান বাদসাহেরা বিলাসব্যসনে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত কবিতেন। সেই জন্যই এই দুই নগবীতে এক সময়ে গীত বাদ্যেব তুমুল চর্চ্চা ছিল। লক্ষ্ণৌ "ঠুংরি" একটী প্রসিদ্ধ সুর। এই লক্ষ্ণৌ নগরীতেই শোরীমিয়া জন্মগ্রহণ করেন। অধুনা তাঁহার রচিত টপ্পা সঙ্গীত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে। লক্ষ্ণৌএব বাইজী অতি বিখ্যাত। ইহারা দেশ বিদেশে যাইয়া নৃত্যগীত করিয়া আইসে।

অযোধ্যা প্রদেশের মধ্যে লক্ষ্ণৌ ডিষ্ট্রীক্ট একটী সমৃদ্ধিশালী বিভাগ। এই বিভাগের শাসন সম্বন্ধে প্রধান কেন্দ্রস্থল লক্ষ্ণৌ সহর। অযোধ্যায় বিস্তর তালুকদার আছেন। তাঁহাদের সমস্ত মামলা মকদ্দমা এই স্থানে হইয়া থাকে। অবশ্য অপিল করিতে হইলে এলাহাবাদ হাইকোর্টে যাইতে হয়। যুক্ত-প্রদেশের শাসনকর্ত্তা লক্ষ্ণৌ নগরীতে বাস করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন মিলিটারী, ডাক ও তারবিভাগের বড় আফিস ও অন্যান্য ছোট ছোট সরকারী আফিস এখানে

বিস্তর আছে। লক্ষ্ণৌএ আউধ এণ্ড রোহিলখণ্ড রেল কোম্পানীর প্রধান আফিসও আছে।

গোমতী ও সহী নাম্নী দুইটী প্রধান নদী এখানে আছে। গোমতী উত্তর দিক হইতে লক্ষ্ণৌএ প্রবেশ করিয়া বরাবর দক্ষিণ বাহিনী হইয়া লক্ষ্ণৌ অতিক্রম করিয়া তৎপরে পূর্ব্বে বারাবাকী অভিমুখে ফিরিয়াছে। গোমতীর বৈতা ও লোনা নামে দুইটী প্রধান শাখা আছে। সহী নদী লক্ষ্ণৌ ডিষ্ট্রীক্টের পশ্চিম বাহিনী হইয়া চলিয়া গিয়াছে।

লক্ষ্ণৌয়ের প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহ করা অতিশয় কঠিন। জনশ্রুতি মুখে যত্‌দূর শুনা যায়, তাহা হইতেই যৎকিঞ্চিৎ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। জনশ্রুতি এই যে, ভগবান রামচন্দ্র রাবণ বধ করিয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া লক্ষ্মণকে গোমতী তীরস্থ ভূভাগগুলির শাসন ভার প্রদান করেন। অনন্তাবতার লক্ষ্মণদেব গোমতী তীরস্থ বাসুকীর প্রিয় একখণ্ড উচ্চ ভূমিতে, স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। এই রাজধানী লক্ষ্মণপুর আখ্যা প্রাপ্ত হয়। গোমতী তীর হইতে ঘর্ঘরার প্রান্ত সীমা পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগই লক্ষ্মণের শাসনাধীনে ছিল। যে উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর সুমিত্রা তনয় স্বীয় রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা অধিকার করিয়া বর্ত্তমান "মচ্ছি-ভবন" সদর্পে দণ্ডায়মান আছে। আজও

এখানকার হিন্দুরা এই স্থানকে পবিত্র মনে করিয়া থাকে। এখনও অনেকের নিকট এই স্থল লক্ষ্মণপুর বলিয়া পরিচিত।

লক্ষ্মণের পর হইতে লক্ষ্ণৌর আর কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা আকবর বাদসাহের সময়ে আবার ইতিহাসে (আইন আকবরীতে) লক্ষ্ণৌয়ের নামোল্লেখ দেখিতে পাই—এই সময়ে বা ইহার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই বোধ হয় লক্ষ্মণপুর নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া লক্ষ্ণৌ হইয়া গিয়াছে। মুসলমান অধিকারের পূর্ব্বে লক্ষ্ণৌ এক খানি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। তখন ইহাতে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বাসই অধিক ছিল। কিন্তু পরিশেষে যখন সেখ উপাধিধারী মুসলমান সম্প্রদায় এই স্থান দখল করিয়া বাস করিতে লাগিলেন—তখন হইতেই মুসলমান ও অন্যান্য জাতীয় লোক এই স্থানে বাস করিতে লাগিল। ইহাদিগের পর রামনগরের পাঠানেরা লক্ষ্ণৌর কিয়দংশ অধিকার করিয়া লয়েন। তাঁহারা বর্ত্তমান "গোল দরজা" পর্য্যন্ত আপনাদের সীমা বিস্তৃত করিয়াছিলেন। সেখজাদারা আত্মরক্ষা ও পাঠানদের অন্যায় আক্রমণ হইতে আপনাদের অধিকৃত সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য বর্ত্তমান মচ্ছিভবনের নিকট একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। এই সময় হইতেই লক্ষ্ণৌ একটী ক্ষুদ্র গোছের সহর হইয়া পড়ে।

ইহার পর বাদসাহ আকবর লক্ষ্ণৌয়ের উন্নতিকল্পে দুই চারিটি কার্য্য করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ লক্ষ্ণৌ ইহার বর্ত্তমান উন্নতির জন্য ক্রমান্বয়ে আকবর, আসফউদ্দৌলা ও সাদত আলির নিকট সম্পূর্ণ ঋণী।

মহাত্মা আকবর লক্ষ্ণৌ সহর অতিশয় পছন্দ করিতেন। বিখ্যাত হিন্দু রাজস্বসচীব রাজা টোডরমল্ল বাদসাহের অধিকারস্থ ভূভাগের যে এক জরীপ করিয়াছিলেন, তাহার মন্তব্যের মধ্যে লক্ষ্ণৌ একটী "জনপূর্ণ" "সুন্দরী নগর" বলিয়া উল্লিখিত আছে। লক্ষ্ণৌয়ের যে স্থান আজকাল হিন্দু অধিবাসীরা অধিকার করিয়া রহিয়াছে—তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। চকের দক্ষিণাংশ সমস্তই প্রায় মহাত্মা আকবর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা অধিক ছিল ও তিনি স্বীয় জগৎবিখ্যাত উদারতা গুণে তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বাধ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। আকবরের পুত্র মির্জ্জা সেলিম সাহেব নামানুসারে লক্ষ্ণৌয়ের একাংশ আজও "মির্জ্জামণ্ডি" বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

মোগলরাজ্যের শেষ দশায়, যখন বাদশাহগণের বলবীর্য্য ক্রমশঃ অন্তঃসার শূন্য হইতেছিল—সেই সময়ে কয়েকজন বুদ্ধিমান ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বাদসাহদিগের ক্ষমতা অগ্রাহ্য

করিয়া স্বাধীনভাবে ভারতের নানা স্থানে, ইচ্ছামত রাজ্য স্থাপন করেন। ইহাদের মধ্যে দাক্ষিণাত্যের নিজাম উল্-মুলক ও আর্য্যাবর্ত্তের সাদত খাঁই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া সাদত খাঁ স্বীয় বুদ্ধি ও প্রতিভা বলে বাদসাহের সরকার হইতে অযোধ্যার সরকারের উজীর পদে নিযুক্ত হ'ন। উজীরি হইতে ক্রমশঃ বল সঞ্চয় করিয়া সাদত খাঁ পরিশেষে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া অযোধ্যার নূতন রাজবংশের প্রাথ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার শেষ বংশধর ওয়াজিদ আলি শা কলিকাতার সন্নিকট মেটিয়াবুরুজে বহুকাল বাস করিয়াছিলেন। "মুচিখোলার নবাব" বলিয়া এখন তাঁহারা অভিহিত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে যে সাদত খাঁর নামোল্লেখ করিয়াছি—ধরিতে গেলে তাঁহার সময় হইতেই লক্ষ্ণৌএর প্রকৃত উন্নতি আরম্ভ হয়। এই সময় হইতেই অযোধ্যার প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ হয়। সাদত ও তাঁহার উত্তরাধিকারীরা প্রথমে লক্ষ্ণৌ প্রদেশে আধিপত্য স্থাপন করিয়া ক্রমশঃ বুদ্ধি ও প্রতিভাবলে সুদুর এলাহাবাদ, কানপুর, গাজিপুর ও রোহিলখণ্ড প্রদেশে আপনাদের শাসন ক্ষমতা বিস্তার করেন।

ঔরঙ্গজেবের কূট নীতির প্রভাবে মোগল সাম্রাজ্য যখন ধ্বংশমুখে পতিত হইল, তখন সাদত খাঁ ও নিজাম উলমুলুক

প্রায় সমকালেই ৰ স্ব ক্ষমতা বিস্তার করেন। তাঁহারা উভয়েই প্রায় এক সময়ে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন—কিন্তু হায়! নিজামবংশ আজও উজ্জ্বলভাবে রাজত্ব করিতেছেন—এবং দেশের সকলের নিকটই পূজিত হইতেছেন। কিন্তু সাদতের বংশ দয়ালু শাসনকর্ত্তা ন্যায়পরায়ণ বৃটিশ-রাজের সহিত বিবাদ করিয়া অতি অল্পকালের মধ্যে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে।

সাদত খাঁ অযোধ্যা বংশের আদি পুরুষ—১৭৩৯ খৃঃ অঃ তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পর হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত মুসলমান ভূপতি অযোধ্যায় রাজত্ব করিয়াছিলেন।

নবাব উজীরদিগের নাম।

(১) নবাব সাদত খাঁ বাহাদুর বুরহান উল্‌মুলুক্।
(২) ,, মনসুর আলি খাঁ সফ্‌দারজঙ্গ বাহাদুর।
(৩) ,, সুজাউদ্দৌলা বাহাদুর।
(৪) ,, আসফ্‌উদ্দৌলা বাহাদুর।
(৫) ,, সাদত আলি খাঁ বাহাদুর।

রাজাদিগের নাম।

(১) রাজা গাজিউদ্দিন হায়দর।
(২) ,, নশীরুদ্দিন হায়দর।

(৩) ,, মহম্মদ আলিশা।

(৪) ,, আমজাদ আলি শা।

(৫) ,, ওয়াজিদ আলি শা।

উপরোক্ত তালিকা হইতে দৃষ্ট হইবে—যে নবাব সাদত খাঁ হইতে ক্রমান্বয়ে দশজন নবাব অযোধ্যায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে শেষ নৃপতি নবাব ওয়াজিদ আলি খাঁ কলিকাতার দক্ষিণ মেটিয়াবুরুজে বন্দীবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন।

সাদত খাঁ অযোধ্যার রাজবংশের স্থাপয়িতা। স্বয় দক্ষতা ও অধ্যবসায় এবং সাহসের গুণে অতি সামান্য অবস্থা হইতে ইনি উচ্চতর পদবীতে আরোহণ করেন। ভারতের বহির্ভাগ হইতে যে সমস্ত মহাপুরুষ ভাগ্যপরীক্ষার্থ এখানে আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সাদত আলি খাঁ একজন। ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ আলি খাঁ দশবৎসর বয়সে ভাগ্য পরীক্ষার্থ পাটনায় আসিয়া উপস্থিত হন। পাটনায় তাঁহার সহোদর ও পিতা অবস্থান করিতেছিলেন। মহম্মদ আলি আসিয়া দেখিলেন যে, পিতার মৃত্যু হইয়াছে সুতরাং দুই ভ্রাতায় পাটনা পরিত্যাগ করিয়া রাজধানী দিল্লীতে আগমন করেন। নবাব সারবুলান্দের নিকট মহম্মদ আলিখাঁর এক চাকরী জুটিল—কিন্তু উদ্ধত প্রকৃতির যুবক কোন এক

কারণে প্রভুর বিদ্রূপ বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া চাকরী পরিত্যাগ করেন।

এই সময় হইতেই তাঁহার ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার উপর প্রসন্না হ'ন—তাঁহার বহুকালের সাধনার ফল এই সময়ে ফলবতী হয়। তিনি দিল্লীর বাদসাহের সহিত পরিচিত হইয়া উঠিলেন। স্বীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রতিভার জোরে বাদসাহের তিনি সহজেই মনোযোগ আকর্ষণ করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কিয়দ্দিন বাদসাহ সকাশে থাকিয়া—তিনি বাদসাহ কর্ত্তৃক অযোধ্যার সুবাদারি পদ প্রাপ্ত হ'ন। মহম্মদ আমিন সাদত খাঁ উপাধি লাভ করিয়া অযোধ্যার মসনদে বসিলেন।

সাদত খাঁ যে সময়ে অযোধ্যায় প্রথম প্রবেশ করেন—তখন সেখানে প্রত্যেক বিষয়েই গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা চলিতেছিল। কতকগুলি ক্ষমতাপন্ন জমীদার তখন প্রকৃত পক্ষে দেশ শাসন করিতেছিলেন। তাঁহারা কেহই প্রজার মুখের দিকে চাহিতেন না—যে যার স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। অত্যাচার ও নির্য্যাতনে তখন অযোধ্যার লোক ত্রাহি ত্রাহি করিতেছিল। কিন্তু প্রজার জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল না—স্ব স্ব প্রভূত্ববর্দ্ধক কার্য্যেই তাঁহাদের দিন কাটিত।

দরিদ্র ও সহায়হীনদিগের সমূহ বিপদ। প্রকৃত পক্ষে তাহারাই সর্ব্বপ্রকারে ক্ষতিগ্রস্থ হইতেছিল। প্রজা বীজ বপন করিয়া সম্বৎসর প্রাণপাত করিয়া শস্য উৎপন্ন করিল—শস্য কাটিয়া আনিয়া একত্রে সংগ্রহ করিল—ইতিমধ্যে একদল ডাকাইত আসিয়া তাহা লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গেল। একজন কঠোর পরিশ্রম করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিল—হয়ত এই জন্য তাহাকে জীবনব্যাপী শ্রম করিতে হইয়াছে, অপর ব্যক্তি বলপূর্ব্বক তাহার নিকট হইতে সেইগুলি কাড়িয়া লইল। সাদতের পূর্ব্বে যাঁহারা সুবেদারী করিতেন—তাঁহাদেরও মতলবের ততটা স্থিরতা ছিল না।

সাদত অযোধ্যায় আসিয়াই সমগ্র দেশের এই প্রকার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া অতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন। কিন্তু তিনি নিশ্চেষ্ট থাকিবার লোক নহেন। প্রজার এই আকুল রোদন তাঁহার অন্তঃস্থলে গিয়া পৌঁছিল। তিনি এই অত্যাচার নিবারণ কল্পে প্রথমেই জমীদারদিগকে ক্ষমতাহীন করিলেন। নূতন নূতন আইন বাহির করিয়া রাজ্য শাসনের সৌকর্য্যার্থে তিনি প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইল, তিনি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিলেন—রাজ্য মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল—প্রজাকুল সুস্থ হইল, দুষ্টের দমন হইল—সকল

বিষয়েই বিশৃঙ্খলা দূর হইয়া গেল। দুই চারি বৎসরের ভিতরই রাজকোষে প্রচুর অর্থ সঞ্চিত হইল। সাদত খাঁ স্বকায় বুদ্ধি বিস্তার করিয়া প্রজার হৃদয়ে সিংহাসন স্থাপন করিয়া—এক বিশাল রাজত্ব সংস্থাপন করিলেন।

হঠাৎ ধনী হইলেই মনুষ্য প্রধানতঃ জাঁকজমক ভাল বাসিয়া থাকে। কিন্তু সাদত এই জাঁকজমকের প্রিয় ছিলেন না। তাঁহার উত্তরাধিকারীরা যে প্রকার বিলাস বাসনে কাটাইয়াছিলেন—তিনি তাহার এক চতুর্থাংশও উপভোগ করিতে পান নাই। কিসে প্রজা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে—কিসে দেশের উন্নতি হইবে—কিসে রাজ-কোষে অর্থ সঞ্চয় হইবে, এই চিন্তাই তাঁহাকে সদা ব্যতিব্যস্ত করিত। তিনি রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্ত লক্ষ্ণৌয়ের পূর্ব্ব-তন শাসনকর্ত্তা সেখজাদাদিগের একজন বংশধরের নিকট সামান্য ভাড়ায় একটী বাটী বর্ত্তমান মচ্ছি-ভবনের নিকট ভাড়া করিয়া লয়েন। সেই ভাড়াটীয়া সামান্য বাটীতেই সুবাদারের রাজপ্রাসাদের কার্য্য করিত। প্রথম প্রথম তিনি বাটীর অধিকারীদিগকে নিয়মিত ভাড়া প্রদান করিয়া-ছিলেন—কিন্তু পরিশেষে তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়া—তাহার ভিত্তিমূল দৃঢ় করিতে হইলে যে সকল মহদগুণের আবশ্যক—সাদত খাঁর তাহার

কিছুরই অভাব ছিল না। শান্তির সময় প্রজাবৃন্দের মধ্যবর্ত্তী হইয়া থাকিতে তাঁহার যেমন আমোদ ছিল—যুদ্ধের সময় সেনাপতিরূপে সৈন্য পরিচালনা করিতেও তিনি সেইরূপ আমোদ উপলব্ধি করিতেন। প্রজাবৃন্দের সুখ সম্বর্দ্ধনার্থে নানাবিধ মঙ্গলময় ব্যবস্থা প্রণয়নে তিনি যেমন বুদ্ধির উৎকর্ষতা দেখাইয়াছিলেন—শত্রুর মস্তকে তরবারি আঘাত কার্য্যেও সেই প্রকার শারীরিক বীর্য্যের শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক বীরগণের মধ্যে তিনি একজন বিশেষ বীর বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ভগবান সিং নামক একজন হিন্দুবীর কেবল মাত্র তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, ভগবান সিংহকে সকলেই অমানুষিক শক্তিসম্পন্ন বীরপুরুষ বলিয়া জানিত। কোনও সময়ে ভগবানের সহিত সাদত খাঁর বিবাদ হয়, সেই সময়ে তাঁহারা উভয়ে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'ন। হিন্দুবীর ভগবান সেই যুদ্ধে সাদতের হস্তে নিহত হ'ন। ভগবানের মৃত্যু হইলে তাঁহার যশোরাশি চতুর্দ্দিকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয—এবং তিনি হিন্দু ও মুসলমান সকলেরি নিকট বিশেষরূপে পূজিত হ'ন। লক্ষ্ণৌএ আজও গল্পচ্ছলে অনেকে এই সমস্ত কাহিনী কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আমাদের যে বৃদ্ধ মুসলমান পথ প্রদর্শক ছিলেন, তিনিই আমাদিগকে এই সকল কাহিনী শুনাইয়াছিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

এত গুণ থাকিলেও সাদতের যশোরাশি নিতান্ত অকলঙ্ক নহে। জনশ্রুতি এই যে, তিনি এবং নিজাম উভয়েই এক-যোগে মন্ত্রণা করিয়া নাদির সাহকে ভারতাক্রমণে প্রবর্ত্তিত করেন। ইহার পরিণাম ফল—তাঁহার পক্ষে যে বিষময় হইয়াছিল—তাহার অনেক প্রামাণ পাওয়া যায়। দিল্লির তৎকালীন বাদসাহ সাদত খাঁর চক্ষুশূল ছিলেন—যখন নাদির দিল্লি প্রবেশ করিলেন—অর্থ সংগ্রহই যে তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ইহা বাদশাহ বুঝিতে পারিলেন। ক্ষীণপ্রতাপ মোগল সম্রাট—নাদিরের গতিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়া তৎপ্রস্তাবিত দুই কোটী টাকা প্রদান করিতে সম্মত হ'ন। নাদির সাহও বিনারক্তপাতে এতগুলি টাকা পাইয়া সন্তুষ্ট-চিত্তে চলিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু বিধির বিধান অন্যরূপ। তাহা হইল না। সাদত খাঁ নিজামের মন্ত্রণায় নাদিরকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, "মহাশয়, দুই কোটী টাকা অতি সামান্য—ইহা দিল্লির বাদসাহের উপযুক্ত প্রতিদান নহে। আপনি ইহা গ্রহণ করিলে আমি নিজ ক্ষুদ্র রাজ্যের এক কোণ হইতে দুই লক্ষ টাকা তুলিয়া দিতে পারি।" নাদির সাহের ইহাতে চক্ষু ফুটিল; ভারতের অদৃষ্টেও লুণ্ঠন আছে—সুতরাং তাহাও অসম্পূর্ণ রহিল না। নাদির সাহ দিল্লি লুণ্ঠন করিয়া যাহা পাইলেন—তাহাতেও তাঁহার মনতুষ্টি

হইল না। তিনি সাদত খাঁর কথিত দুই লক্ষ টাকা তাঁহার নিকট দাবী করিয়া বসিলেন। উৎক্ষিপ্ত সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র যে শত্রু বিনাশ করিয়া আসিয়া পুনরায় তাঁহার গাত্রে লাগিবে—ইহা সাদত খাঁর বিশ্বাস হয় নাই। শত্রুর বিনাশেচ্ছায় তিনি যে জাল পাতিয়াছিলেন—তাহাতে যে নিজেই আবদ্ধ হইবেন, ইহা তাঁহার আদৌ ধারণা ছিল না। বন্ধুভাবে নিজামের নিকট পরামর্শ চাহিলেন। নিজাম বরাবরই সাদত খাঁকে বন্ধু না ভাবিয়া প্রতিদ্বন্দী বলিয়া ভাবিতেন। তিনি মুখে সাদতকে যথেষ্ট বন্ধুত্ব প্রদর্শন করিতেন—কিন্তু ভিতরে ভিতরে কিসে তাঁহার সর্ব্বনাশ হয় সেই চিন্তাই করিতেন। এক্ষণে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া তাঁহার বহুকালের বৈরনির্য্যাতনের কল্পনা মনে উদয় হইল। তিনি মৌখিক সদ্ভাব দেখাইয়া সাদত খাঁকে এক পত্র লিখিলেন যে, উপস্থিত তাঁহারও বিষম বিপদ। নাদির সা তাঁহার নিকটও দুইলক্ষ টাকা চাহিয়াছেন—কিন্তু তাঁহার অর্থ নাই, তিনি অর্থ কোথায় পাইবেন—বিষ পানে ইহলোক ত্যাগ করিবেন—ইহাই তাঁহার মনের বাসনা। সাদত এই কথায় ভুলিলেন। চতুরের চাতুরীজালে বদ্ধ হইয়া তিনি কথাটার অর্থ যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। নিজ শিবিরে আসিয়া তাড়াতাড়ি হলাহল

পান করিলেন—ইহাতেই তাঁহার জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইল।

মৃত্যুর পর সাদত খাঁ নয় লক্ষ টাকা কোষাগারে রাখিয়া যান। প্রজা লুণ্ঠন করিয়া এই অর্থ সঞ্চিত হয় নাই বটে—কিন্তু ধনীর উপর তাঁহার মাঝে মাঝে উৎপাত চলিত। অযোধ্যার বিশৃঙ্খলতার সময় অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নবাব প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু সাদত আলির দৃষ্টি তাহাদের উপর পড়াতে—তাহারা ক্রমে ক্রমে ক্ষমতাহীন হইয়া পড়েন। ইহাতে অযোধ্যার মধ্যে সুশাসনের প্রাদুর্ভাব ও সর্ব্বপ্রকারে প্রজার উন্নতি হইয়াছিল।

সাদতের মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা ও ভ্রাতষ্পুত্র সফ্‌দার জঙ্গ সিংহাসনে উন্নীত হ'ন।

ইহার পর অনেক ঘটনা হইয়াছে। অনেক নবাব পরিবর্ত্তন হইয়াছে। লক্ষ্ণৌয়ের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বড় বড় অট্টালিকা ও মনোহর উদ্যান সকল নির্ম্মিত হইয়াছে। লক্ষ্ণৌএর রাজস্ব বহু বৃদ্ধি পাইয়াছে—এবং সিপাহী বিদ্রোহ পর্য্যন্ত অনেক ঘাত প্রতিঘাত উহার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। সে সমস্ত ইতিহাসের কথা আমূল লিপিবদ্ধ করিতে হইলে একখানি সুবৃহৎ স্বতন্ত্র পুস্তক হইয়া পড়ে। পাঠক যদি আরো জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে

মনস্বী বর্ক প্রভৃতি পণ্ডিতগণের বিরচিত গ্রন্থাদি পাঠ করিবেন।

লক্ষ্ণৌয়ের নবাবেরা যে সকল বিলাস ব্যসন উৎসব অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন—তাহা পৃথিবী বিশ্রুত। দিল্লির বাদসাহেরাও এই প্রকার নবাবীয়ানা দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহারা দিলারাম, দিলখুসি, ফায়েত বকস, সুবরক্স কুঠী, মতিমহল, মচ্ছিভবন, কৈশরবাগ, তারাকুঠী, চরবাগ প্রভৃতি যে সকল অট্টালিকা ও প্রমোদোদ্যান নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন—তাহা এখনও তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য ও বিলাসিতার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

মতিমহলে নবাবদিগের আমোদ প্রমোদের অনুষ্ঠান হইত। নবাবেরা চিড়িয়ার লড়াই দেখিতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। অন্যান্য আমোদ প্রমোদের মধ্যে চিড়িয়ার লড়াই লক্ষ্ণৌয়ের নবাবদিগের প্রধান আমোদ ছিল। রাজা হইতে সামান্য প্রজা পর্য্যন্ত এই আমোদ সংক্রামক হইয়া পড়িয়াছে। লক্ষ্ণৌএর রাজবংশের অস্তিত্ব এখন ত লোপ হইয়াছে, কিন্তু আজও এখানকার হিন্দু ও মুসলমানের ভিতর চিড়িয়ার লড়ায়ের বিশেষ প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। নবাব সাহেবেরা আহারাদির পরই এই আমোদে মত্ত হইতেন। আহারাদি শেষ হইলে টেবিলের উপর

বস্ত্র বিছাইয়া দুইটি শিক্ষিতা পক্ষিণী আনিয়া সেই টেবিলের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইত। এই প্রকার বাঙ্গযুদ্ধে তাহাদিগকে উত্তেজিত করিবার জন্য নানাবিধ উত্তেজক ঔষধ ও ভোজ্য এই সময়ে প্রস্তুত রাখা হইত। দুই পক্ষিণীর মধ্যে একটী পুং-পক্ষী ছাড়িয়া দিলে সেই শিক্ষিত পুং পক্ষী ধীরে ধীরে মধ্যস্থলে গিয়া দাঁড়াইত এবং পক্ষিণীদিগকে যুদ্ধার্থে উৎসুক দেখিলেই ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িত। ইহার পর ভয়ানক যুদ্ধ! দুইটি পক্ষীতে ঠোকরা ঠুকরী লাফালাফি করিয়া মহা সমর বাধাইত, চঞ্চুর আঘাতে ও কৌশলময় গতিকে একটা আর একটাকে টেবিলশায়ী করিবার চেষ্টা করিত, পরিণামে যেটার জয়লাভ হইত সে নবাব সাহেবের বিশেষ আদর পাইত এবং তাহার রক্ষকও বিনা পুরস্কারে যাইত না। অযোধ্যা ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইলে মতি মহল ইংরাজের দখলে আসে, কিন্তু সিপাহী মহাবিদ্রোহে ইহা পুনরায় তাহাদের হস্তচ্যুত হইয়া পড়িলে—স্যার কলিন ক্যাম্বেল আসিয়া তাহা পুনরায় দখল করেন। তারাকুঠী একটী মনোরম কারুকার্য্যময় সুবৃহৎ প্রাসাদ। ইহার এক অংশে একটী ক্ষুদ্র গোছের মানমন্দির ছিল। নবাবেরা এই স্থানে উঠিয়া কখন কখনও গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি পর্য্যালোচনা করিতেন। Col. Wilcox নামক একজন

ইংরাজ জ্যোতির্ব্বিদের তত্ত্বাবধানে কতকগুলি জ্যোতিষ যন্ত্র এই প্রাসাদের অত্যুচ্চ চুড়ায় স্থাপিত হইয়াছিল। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইহার অধিকাংশই বিনষ্ট হইয়াছে।

দিলখুসী সহরের বাহিরে অবস্থিত—নবাব এইস্থানে আসিয়া পালিত জন্তু শিকার করিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ লালবার দোয়ারি সাদত আলির সময়ে নির্ম্মিত হয়—নবাবেরা এই সমগ্র প্রাসাদটিকে "লালবাব দোয়ারি ও অভিষেক গৃহটীকে "কসর-উল্-সুলতান" বলিতেন। ইংরাজেরা ইহাকে Throne Room বলেন—এইস্থানে অভিষেকের সময় মহাদরবারে নবাবকে নজরাদি দিয়া রেসিডেণ্ট ও অন্যান্য পদস্থলোকে সম্মান দেখাইতেন।

ইহার পর গাজীউদ্দীন হায়দারের সমাধিমন্দির দেখিতে গমন করিলাম। Provincial Meuseum দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলাম। গাজী-উদ্দিনের এক তৈলচিত্র দেখিলাম। লক্ষ্ণৌএ গাজিউদ্দিনের অনেক কীর্ত্তি আছে। ইহার মধ্যে নৌলাক্ষী, দর্শন-বিলাস, সানজফ, সাদত আলির সমাধি মন্দির, মুরগুদ, মঞ্জিল প্রভৃতিই প্রধান। আমরা সর্ব্বাগ্রে সানজফের বিবরণ দিব।

"সাহা নজফ" বা "নজফ আস্রেফ" একটী প্রকাণ্ড সমাধি মন্দির। গাজিউদ্দীন বাদসাহ ইহা নিজ সমাধির জন্য প্রস্তুত করেন। গোমতীর অতি সন্নিকটে স্থাপিত বলিয়া দূর হইতে কিম্বা কোন উচ্চ স্থল হইতে ইহার দৃশ্য অতীব মনোরম। হোসেনাবাদের সহিত সানজফের সদৃশ করিয়া তুলনা করা যাইতে পারে। হোসেনাবাদ, কৈশরবাগ, ছত্রমঞ্জিল, লা মার্টেনিয়ার নবাবদিগের প্রাসাদ ছিল।

ধর্ম্মবীর মহম্মদের জামাতা আলির সমাধি "নজফ" নামক এক অত্যুচ্চ পাহাড়ের উপর সংস্থাপিত ছিল—নবাব তাহার অনুকরণে এই "সাহ নজফ" নির্ম্মাণ করেন। আমি সাহা-নজফের সুদৃশ্যতা ও নির্ম্মাণ কৌশল দেখিয়া বাস্তবিকই মুগ্ধ হইলাম। আগ্রার তাজ দেখিয়াছি—দিল্লীতে ইত্মামাদউদ্দৌলা, জুম্মা মসজিদ, সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধি ইত্যাদি দেখিয়াছি, কিন্তু সাহ নজফ যে প্রকারে আমাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল—এ প্রকার কিছুতেই হয় নাই। শুনিলাম মধুর জ্যোৎস্নালোকে ইহার দীপালোকিত মনোহারিণী মূর্ত্তি দেখিলে আত্মহারা হইতে হয়। আগ্রায় জ্যোৎস্নারাত্রে তাজ দেখিয়াছিলাম। শারদীয়া মধুযামিনীর আকাশে স্নিগ্ধরশ্মিময় চন্দ্র নীরবে শ্বেত মেঘ মধ্যে বিচরণ

করিতেছে—পৃথিবী তলে পালিত উদ্যানলতা, মনোহর বিটবী শ্রেণী তদ্রূপ নীরবে চন্দ্রকরে বিশ্রাম করিতেছে, নীরবে বৃক্ষপত্র সকল সে কিরণের প্রতিঘাত করিতেছে, লতাগুল্ম মধ্যে . শ্বেত কুমুদদল বিকশিত হইয়া রহিয়াছে—তাহাদের মনোহর গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইতেছে। কৌমুদী-বেষ্টিত মমতাজের এই বিরাট বিশ্রাম স্থান আমাকে উদ্‌-ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। "সাহ. নজফ্" মধুর জ্যোৎস্না-লোকে দেখিবার সুযোগ পাইলাম না বলিয়া মনে বড়ই ক্ষোভ উপস্থিত হইল। কিন্তু কি করিব উপায় নাই।

এই বিরাট অবিনশ্বর কীর্ত্তি দেখিয়া আমার মনে নানা কথার উদয় হইতে লাগিল। তাহারা আজ কোথায়? যাহারা এই কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন—আজ তাহারা কোথায়? মনে মনে এই প্রশ্ন করিতে লাগিলাম। কিন্তু কেহই ইহার উত্তর দিতে পারিল না।

প্রথম গেটটী পার হইয়া কিছুদূর যাইলেই আর একটী অতুচ্চ তোরণ দৃষ্টিপথে পড়ে। ইহাই সান্‌ জফের প্রবেশ দ্বার—এই স্থল দিয়া সমাধি মন্দিরের সীমা মধ্যস্থ কেন্দ্রে উপস্থিত হওয়া যায়। আমাদের দেবালয়ের ন্যায় ইহার চারিদিকে চকমিলান বাড়ী ও মধ্যে প্রকাণ্ড মন্দির। রাস্তা-গুলি অতি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। একটী শুষ্ক বৃক্ষ পত্রও

তথায় দেখিতে পাইলাম না। উত্তর অংশের চক্‌টী ঘুরিয়া আসিলেই সমাধি মন্দিরের প্রবেশ দ্বার। সমাধি মন্দির বলিয়াই ইংরাজরাজ ইহা অধিকার করেন নাই। ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে নবাবী আমলের অনেক পরিত্যক্ত পদচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহগাত্রে অত্যুচ্চ কতকগুলি সুন্দর "বয়েৎ" ও তন্নিম্নে কৃত্রিম ফলপুষ্পশোভিত মহাজন পদাবলী সম্বলিত কতকগুলি সুবৃহৎ দর্পণ ও উপযুক্ত স্থান ব্যাপিয়া চারিদিকেই বেলোয়ারি দেয়ালগিরি দৃষ্টি পথে পতিত হয়। ইহা ব্যতীত শতাধিক শাখাবিশিষ্ট কয়েকটী বসা ঝাড় কবরের নিকট টাঙ্গান আছে ও তাহাতে সুগন্ধি দীপ জ্বলিতেছে, কবরের উপরেই একটী প্রকাণ্ড খিলানময় গম্বুজ। এই প্রকাণ্ড সৌধের দেয়ালের চারিধারে কয়েকখানি প্রকাণ্ড দর্পণে গৃহের আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্য সমস্তই প্রতিফলিত হইয়াছে—ইহাকে লক্ষ্ণৌয়ের শিশ্‌মহল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দ্বারের কাছে দুইখানি নবাবী আমলের চিত্রিত ছবি দেখিলাম। একখানিতে নবাব সাদত আলি জেনারেল ক্লড্‌ মার্টিনের সহিত করমর্দ্দন করিতেছেন— মেজের উপর চিড়িয়ার লড়াই লইতেছে, নবাবের দৃষ্টি তাহার দিকে অর্দ্ধ ন্যস্ত রহিয়াছে। দ্বারের চারিদিকে সভাসদগণ ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আর একখানি

ছবিতে, নবাব তাঞ্জামে করিয়া বেড়াইতে যাইতেছেন ও কয়েকটী যুবতী পরমাসুন্দরী তাতারিণী সেই তাঞ্জাম বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। এই দুইখানি বিরুদ্ধভাব প্রকাশক ছবি কি উদ্দেশ্যে এখানে রাখা হইয়াছে কিছুমাত্র বুঝিতে পারা গেল না। সাহ-নজফ লক্ষ্ণৌয়ের একটী প্রধান সৌন্দর্য্য। বড় ইমামবাড়ী, হোসেনাবাদ প্রভৃতির ন্যায় ইহাও অটলভাবে দাঁড়াইয়া নবাবদিগের কীর্ত্তি বহুকাল প্রচার করিবে। সিপাহীযুদ্ধের সময় সাহ নজফের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল হইয়াছিল।

অযোধ্যার অধিকাংশ নবাবই স্বীয় কীর্ত্তি প্রচার করিবার জন্য স্বস্ব সমাধি মন্দির ও বড় বড় এমারত প্রস্তুত করাইয়াছেন—কিন্তু পিতৃগৌরব বৃদ্ধি সৌকর্য্যার্থে কেহ কোন কীর্ত্তি স্থাপন করেন নাই। গাজিউদ্দীন হায়দর কেবল এ প্রকার কার্য্যের একমাত্র অনুষ্ঠাতা ও একমাত্র দৃষ্টান্ত। তাঁহার পিতা সাদত খাঁ ও মাতা মুরশীদজাদির নাম চিরবিখ্যাত করিবার জন্য তিনি পাশাপাশি "আরামগা" নামক দুইটী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই দুইটী সমাধি মন্দির ক্যানিং কলেজের অতি সন্নিকটেই অবস্থিত। ইহার অনতিদূরেই সুপ্রসিদ্ধ কৈশর বাগ। এই দুইটী সমাধি মন্দিরের মধ্যস্থল দিয়া একটী রাস্তা

বরাবর ছত্রমঞ্জিল পর্য্যন্ত গিয়াছে। প্রকাণ্ড সমাধি মন্দির দুইটী রাস্তার দুইধারে গর্ব্বিতভাবে দাঁড়াইয়া যেন ক্ষুদ্র পথিকদিগকে বিদ্রুপ করিতেছে। আমরা সাদত আলির মন্দিরের ভিতর সাহস করিয়া ঢুকিয়াছিলাম। অন্যান্য সমাধি মন্দিরের ন্যায় এগুলি সুরক্ষিত নহে। তজ্জন্য ইহার চারিদিক বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়াছে। গৃহের মধ্যে রাশি রাশি অবার্জ্জনা রহিয়াছে—প্রকাণ্ড গম্বুজের নীচে কার্ণিসের উপর নানা জাতীয় পক্ষিতে বাসা করিয়াছে। গৃহমধ্যে তামসী রাক্ষসী বিকট হাস্য করিয়া নৃত্য করিতেছে। ঘরটীর ভিতরে প্রবেশ করিতে দুই একজন অধিবাসী নিষেধ করিলেন—তাঁহারা বলিলেন—গৃহমধ্যে সর্পাদি হিংস্রজন্তু বিচরণ করিয়া থাকে—এই জন্য কেহই উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে সাহস করে না।

মাতুল এই কথা শুনিয়াই একেবারে বাঁকিয়া বসিলেন। নানাপ্রকার সাধ্য সাধনায় যখন আমার সংকল্প পরিবর্ত্তিত হইল না দেখিলেন—তখন আমাকে অভিসম্পাত করিতে করিতে পশ্চাদগামী হইলেন। গৃহমধ্যে বিরাট অন্ধকার দেখিয়া মাতুল অনেকবার ভয়ে "রাম" "রাম" শব্দে চীৎকার করিয়াছিলেন।

যে স্থানে সাদত আলি ও তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর

সমাধি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে—পূর্ব্বে এই স্থানে গাজি-উদ্দীন হায়দারের নিজ মহল ছিল। তিনি রাজ্যাধিকারী হইয়া সাদত খাঁর মহল অধিকাব করিয়া নিজ প্রকাণ্ড বাটীটি ভূমিসাৎ করিতে আজ্ঞা প্রদান করেন। কোন উজীর সাহস করিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিতে নবাব দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিয়াছিলেন—"আমি পিতার প্রাসাদ অধিকাব করিয়াছি, তাঁহাকে তৎপরিবর্ত্তে নিজ প্রাসাদ প্রদান কবিলাম। ঐ স্থানে আমি তাঁহাব গোব নির্ম্মাণ করিয়া দিব।" "সাহমঞ্জিল" নামে আব একটী ক্ষুদ্র প্রাসাদ ইঁহার দ্বাবা নির্ম্মিত হয়। নবাব এই প্রাসাদের উপব বসিয়া হস্তী, ব্যাঘ্র, সিংহ, গণ্ডার, হরিণ, ববাহ প্রভৃতি বন্য পশুর যুদ্ধ দেখিতেন।

আসফ্‌উদ্দৌলা নামক নবাব লক্ষ্ণৌয়েব অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন। তাঁহাব পূর্ব্ববর্ত্তী নবাবদিগের ফয়জাবাদে রাজধানী ছিল—সুতরাং লক্ষ্ণৌয়ের উন্নতিকল্পে অতি অল্প কার্য্যই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। আসফ্‌উদ্দৌলা তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষদিগের ন্যায় ব্যয়কুণ্ঠ ছিলেন না! তিনি মুক্তহস্তে পূর্ব্ব-রক্ষিত ও তাঁহার নিজ আদায়ী রাজস্বের অধিকাংশই লক্ষ্ণৌ-য়ের সৌন্দর্য্য সম্বর্দ্ধনার্থে ব্যয় করেন। ইহার সময়েই বিখ্যাত "রুমীদরওয়াজা" নামক গগনস্পর্শী ও সুন্দর কারুকার্য্যময়

ফটক নির্ম্মিত হয়। কনষ্টাণ্টিনোপলের কোন ফটকের অনুকরণে নবাব আসফউদ্দৌলা এই দরওয়াজা নির্ম্মাণ করেন। এই ফটকটী অতি সুন্দর শিল্পকৌশল বিশিষ্ট খিলানে নির্ম্মিত—এতাদৃশ উচ্চ খিলান দিল্লী ব্যতীত আর অন্য কোনও স্থলে দৃষ্টিগোচর হয় না। আজকাল বড় বড় সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের দল কত মৎলব আঁটিয়া—কত শত খিলানযুক্ত বড় বড় প্রাসাদ তৈয়ারী করিতেছেন—কিন্তু ইহার ন্যায় সুদৃশ্য ও সুদৃঢ় একটীও দেখিতে পাওয়া যায় না। কলিকাতায় আজকাল নূতন নূতন প্রাসাদের পত্তন হইতেছে—কিন্তু দুঃখের বিষয় একটীরও খিলান দুই বৎসর পরে ঠিক থাকে না। কত রকম করিয়া ভিত্তি স্থাপনা করা হয়—কিন্তু অট্টালিকা কিছুতেই সুদৃঢ় হয় না। এই জন্য ইহারা কলিকাতার মাটীর নাম দিয়াছেন—Treacherous soil অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতক মৃত্তিকা। পাঠক! ইহা হইতেই ইঞ্জিনিয়ারদিগের বিদ্যার দৌড় বুঝুন!

নবাব আসফউদ্দৌলা আজ প্রায় ৮০ বৎসর হইতে চলিল—পৃথিবী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন—কতশত ঝঞ্ঝাবাত বৃষ্টি এই সকল প্রাসাদাংশের উপর সমভাবে বহিয়া গিয়াছে—তথাপি আজও ইহা অক্ষতভাবে দণ্ডায়মান। ঝড় বৃষ্টির কথা দূরে যাউক—সুপ্রসিদ্ধ সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইহার

ও লক্ষ্ণৌয়ের অন্যান্য বাড়ীগুলিব উপর দিয়া কতশত গোলাগুলি চলিয়া গিয়াছে—তথাপি সামান্য আঘাত চিহ্ন ব্যতীত ইহাদের গাত্রে আর কোন ক্ষতি লক্ষণ দৃষ্টি গোচর হয় না।

লক্ষ্ণৌয়ের প্রাসাদগুলির মধ্যে প্রধান ইমামবাড়ী, হোসেনাবাদ, কৈশববাগ, ছত্রমঞ্জিল ও লামার্টিনিয়াব সর্ব্বপ্রধান। প্রধান ইমামবাড়ী একটী সুবৃহৎ, সুপ্রশস্ত, সুন্দর কারুকার্য্যময় সমাধি মন্দিব। অধীশ্বর বিহনে ইহা পূর্ব্বাপেক্ষা হতশ্রী হইয়াছে বটে—তথাপি এখনও সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্য হারায় নাই। দুইটী বড় বড় দ্বার পাব হইয়া প্রবেশ করিলে প্রথমে সম্মুখে একটী বিস্তৃত উঠান— ও চারিদিকে সৌধমালা দৃষ্টিপথে পড়ে। ইহাব পর কয়েকটী সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিলে আর একটী দরওয়াজা পার হওয়া যায়। এই দ্বিতীয় দরওয়াজা হইতে দেখিলে, পূর্ব্বোক্ত উঠান ৫।৭ হাত নিম্নে বলিয়া বোধ হয়। এই প্রকার উচ্চ ভূমিখণ্ডেব উপর আসফ উদ্দৌলার ইমামবাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ফটক পার হইলেই একটী জলপূর্ণ মার্ব্বেল প্রস্তরময় চৌবাচ্ছা দেখিতে পাওয়া যায়। শুনিলাম পূর্ব্বে এই চৌবাচ্ছা সুপরিষ্কৃত জলে পরিপূর্ণ থাকিত ও নেমাজের সময় ইহার জল ব্যবহৃত হইত।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

এই প্রধান ইমামবাড়ী আসফউদ্দৌলা স্বীয় কবরোদ্দেশে সংগঠিত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এই প্রাসাদের মধ্যস্থলে তাঁহার সমাধি হইয়াছিল। সেই সমাধি স্থলের চতুর্দ্দিক রৌপ্যময় রেলিং দ্বারা বেষ্টিত ও একখানি বহুমূল্য বস্ত্রে আবরিত। এই মার্ব্বেল প্রস্তরময় সমাধির সম্মুখে নবাব সাহেবের পাগড়ী পড়িয়া রহিয়াছে। সমাধি মন্দির মধ্যে কয়েকখানি মোমের তাজিয়া আছে। একজন পরিচারক ইহা দেখাইয়া বলিল—নবাব আসফ্ উদ্দৌলার সময়ে ইহা নির্ম্মিত। এ প্রকাব সুদীর্ঘ ও সুপ্রশস্ত খিলানযুক্ত বাটী আমরা কখনও দেখি নাই। জগতে ইহা কোন দেশেরই অট্টালিকার অনুকরণে নির্ম্মিত নহে। ইহা প্রস্তুত করিতে এক লক্ষের উপর খরচ পড়িয়াছিল। আসফউদ্দৌলা কয়েকজন বিখ্যাত স্থপতি বিদ্যাবিশারদ ব্যক্তিকে ডাকাইয়া ইহার Plan তৈয়ার করিতে আজ্ঞা দেন। তৎকালীন প্রধান নৃপতি কফিয়ৎউদ্দৌলা একটী নক্সা আঁকিয়া নবাবকে দেখাইলেন ও তাঁহার নক্সাই মঞ্জুর হইল। এই বাটীর ভিত্তি মূল অতিশয় দৃঢ় ও সুগভীর। সমুদায় গৃহটী সম্পূর্ণরূপে কাষ্টবর্জ্জিত—দিল্লীর কয়েকটী বাদসাহী প্রাসাদ ছাড়া এ প্রকার ধরণের খিলানওয়ালা বাটী আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার গঠন এতদূর

সুদৃঢ় যে, সিপাহীবিদ্রোহের সময় ইহার উপব কয়েকদিন ধরিয়া ক্রমাগত গুলি গোলা বর্ষণ হওয়াতেও বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নাই। ইহার মেঝেব উপব দিয়া কয়েকটা ১৮ পাউণ্ডার কামান টানিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, তথাপি মেঝিয়ার কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় নাই। আজকাল এই দেশীয় শিল্পের অবনতি হইয়াছে। যাঁহাবা দিল্লি, আগরা, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, বিজাপুব প্রভৃতি স্থানে এই প্রকাব অট্টালিকাদি নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিল—তাহাদের বংশলোপ হইয়াছে। স্থপতি বিদ্যাব চবমোৎকর্ষ দেখিয়া যেমন হৃদয় আনন্দে অধীর হইয়াছিল—তেমনি সহসা ইহার বিলোপ দেখিয়া উল্লাসের মধ্যে বিষাদেব কালিমাময় ছায়া আসিয়া পড়িল। অতীতেব স্মৃতি আমাদেব মনে সহসা জাগিয়া উঠিয়া—আমাদিগকে যৎপবোনাস্তি পীড়ন কবিতে লাগিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যাহারা এই সমস্ত নির্ম্মাণ করিয়াছিল—আজ তাহারা কোথায়? প্রতিমাশূন্য চণ্ডী-মণ্ডপের ন্যায়—গৃহস্থশূন্য বসতবাটীব ন্যায়—রাজ্যশূন্য রাজ্যের ন্যায়—পতিবিহীনা সাধ্বীসতীর ন্যায় ইহার সকল সুখ সৌন্দর্য্য চিরকালের মত কালগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে।

নবাবদিগের সঙ্গে সঙ্গেই ইমামবাড়ীর সকল সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হইয়াছে—থাকিবার মধ্যে সমাধি, কয়েকটা তাজিয়া,

রাজপতাকা ও কতকগুলি ঝাড় লণ্ঠন পড়িয়া আছে। শশ্মানের বক্ষে যেমন নরকঙ্কাল ও মৃৎকলসী ভগ্নাবস্থায় থাকিয়া শ্মশানের অস্থিত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করে—এই দ্রব্য-গুলিও ঠিক সেই প্রকাব ভাবেই দর্শকের মনে ভীতির সঞ্চার করে। এই প্রকাণ্ড ইমামবাড়ী এক্ষণে জনশূন্য হইয়াছে। রক্ষক ও সমাগত পর্য্যটকদিগের বাক্যালাপ শব্দ ব্যতীত আব কোন কোলাহলই শ্রুত হয় না।

অযোধ্যাব নবাবদিগেব মধ্যে আসফ উদ্দৌলা সর্ব্বাপেক্ষা দানশীল ছিলেন। এ প্রকার মুক্তহস্তে দান করিতে এখান-কাব কোন নবাবই সক্ষম হ'ন নাই। এই ইমামবাড়ী প্রস্তুত করিবাব সময়ে তিনি যে প্রকার দানশীলতা দেখাইয়াছেন—কেহ সে কথা ভূলিতে পারিবে না। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহাব বাজত্বকালে যে সময়ে এই প্রধান ইমামবাড়ী প্রস্তুত হইতেছিল—সেই সময়ে অযোধ্যা প্রদেশে অতিশয় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। বাড়ীর নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে শুনিয়া দলে দলে দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত ভদ্রব্যক্তিগণ পেটের দায়ে এই প্রকার সামান্য কার্য্যে পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্ত হ'ন। আসফদ্দৌলা ঘটনাক্রমে এই সমাচার শুনিতে পান—ও সেই সকল ভদ্রব্যক্তিদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। ইহাদের মধ্যে অনেকে গভীর নিশীথে আসিয়া

কার্য্য কবিয়া যাইত। নবাব নিজে উপস্থিত থাকিয়া ইহাদের কার্য্য দেখিতেন—সামান্য পরিশ্রমে দ্বিগুণ চতুর্গুণ পারিশ্রমিক দিতেন, আবার তাহারা চলিয়া গেলে তাহাদের কাজ বাড়াইবার জন্য গ্রথিত অংশগুলি পদাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিতেন। এই প্রকার কার্য্য দ্বারা কতশত লোক যে অকালমৃত্যু ও অনাহারের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল—তাহার আর ইয়ত্তা নাই। আসফ উদ্দৌলা হিন্দু ও মুসলমান উভয়বিধ প্রজাকেই সমান ভাবে দেখিতেন—কোন জাতিবই কষ্ট তাঁহাব সহ্য হইত না।

বহু বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। ধরণীর চির-শান্তিময় ক্রোড়ে এই মহাপুরুষ চিরতরে নিদ্রিত রহিয়াছেন, তথাপি আজও আসফের বদান্যতা বর্ণিত হইয়া থাকে—আজও ছোট বড় সকলে বলিয়া থাকে

"যিস্কো না দেয় আল্লা—
উস্কো দে আসফউদ্দৌলা।"

"রুমি দরওয়াজা" ও বড় "ইমামবাড়ী" ছাড়া আসফ উদ্দৌলা দৌলতখানা নামক সুপ্রসিদ্ধ রাজপ্রাসাদ ও রেসিডেন্সি ভবন নির্ম্মাণ করান। দৌলতখানা গোমতীর নীচেই নির্ম্মিত হয়—ও ইহার সন্নিধ্যেই গোমতী হইতে এক অত্যুচ্চ ভূমি খণ্ডের উপর রেসিডেণ্ট সাহেবের আবাস

স্থান নির্ম্মিত হয়। বর্ত্তমানে এই রেসিডেন্সীর সামান্য মাত্র ভগ্নাবশেষ আছে।

সুপ্রসিদ্ধ লামার্টিনিয়ার ভবন পিতৃমাতৃহীন ইউরোপীয় সৈনিক বালকদিগের জন্য সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী জেনারেল ক্লড মার্টিনসের ব্যয়ে ও উদ্যোগে স্থাপিত হয়। ক্লড মার্টিন প্রথমে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে চাকরী করিয়া পরে নবাবের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া প্রভূত ধন উপার্জ্জন করেন। লক্ষ্ণৌ দেখিতে আসিলে মার্টিনের এই অত্যাশ্চর্য্য শিল্পকৌশলময় সুবৃহৎ প্রাসাদ না দেখিলে চক্ষের সার্থকতা হয় না। জেনারেল ক্লড মার্টিন সাহেব (কলিকাতার লা মার্টিনিয়ার স্থাপয়িতা) নিজে নক্সা প্রস্তুত করিয়া স্বীয় তত্ত্বাবধানে এই আশ্চর্য্য বাটীটি নির্ম্মাণ করেন। নকসা প্রস্তুত করিয়া নবাবকে দেখাইতে গেলে নবাব তাঁহার নিকট হইতে এক লক্ষ টাকায় সেই বাটী ক্রয় করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মার্টিন তখন কোনও কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া আসেন। পরে বাটী প্রস্তুত হইয়া গেলে ভবিষ্যত নবাবদিগের লোলুপ দৃষ্টি হইতে এই কীর্ত্তিটীকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি ট্রষ্টীদিগকে সেই গৃহমধ্যে তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করিতে উপদেশ প্রদান করেন। এই উপদেশ তাঁহার মৃত্যুর পর রক্ষিত

হইয়াছিল। মার্টিন বিলক্ষণ বুঝিতেন, মুসলমান কথনও সমাধির উপর অত্যাচার করেন না—বস্তুত তাঁহার এই অনুমান সম্পূর্ণ সত্য। নবাবের হাত হইতে এই প্রকার কৌশল করিয়া তিনি নিজকীর্ত্তি রক্ষা করিয়া যান। ১৮৫৭ সালে ভয়ানক সিপাহীবিদ্রোহের সময় উন্মত্ত রণোল্লাসযুক্ত সিপাহীগণ মার্টিনেব সমাধি ভগ্ন করিয়া মৃত্তিকা গর্ভ হইতে তাঁহাব হাড়গুলি তুলিয়া চাবিদিকে ছড়াইয়া দেয়। সাহেব-দিগেব উপব বিদ্রোহী সিপাহীরা যে কতদূর বীতানুরাগ হইয়াছিল তাহা এই ঘটনা হইতে বেশ বুঝা যাইতে পাবে। বিদ্রোহীরা স্থান ত্যাগ কবিলে—সেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অস্থিগুলি কুড়াইয়া লইরা পুনর্ব্বাব সমাধিস্থ করা হয়। এই লামার্টিনিয়াবে আজও কতকগুলি পিতৃমাতৃহীন সৈনিকবালক খোরাক, পোযাক ও শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে।

উল্লিখিত কয়েকটী প্রাসাদ ও ইমামবাড়ী ছাড়া আসফ উদ্দৌলা কয়েকটী প্রধান বাগান "গঞ্জ" স্থাপন করেন। লক্ষ্ণৌ নগরীর সীমা ইঁহাব সময়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দূর বিস্তৃত হইয়া পড়ে। আসফউদ্দৌলার গঞ্জগুলি আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাঁহার নির্ম্মিত "আয়েসবাগ" যদিও শ্রীহীন হইয়াছে—তথাপি "চারবাগ" আজও জনসংকুল। এই চারবাগ ব্যাপিয়া বর্ত্তমান লক্ষ্ণৌ রেল ষ্টেসন নির্ম্মিত

হইয়াছে। তদ্ভিন্ন আউধ রোহিলখণ্ড রেলওয়ের যাবতীয় অফিস এই স্থানে স্থাপিত হইয়াছে। চারবাগের ভগ্নপ্রায় ফটকগুলি আজও ষ্টেসনের অনতিদূরে বন জঙ্গলের মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে। নবাব আসফউদ্দৌলা অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী ছিলেন। ইঁহার সমকালীন কোন মুসলমান ভূপতি তাঁহাপেক্ষা যাহাতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া না কথিত হয়, ইহাই তাঁহার অন্তরের গুঢ় উদ্দেশ্য ছিল। হায়দ্রাবাদের নিজাম ও টিপু সুলতান কতগুলি হস্তী রাখিতেন—তাঁহাদের কত টাকা মূল্যের জহরতাদি আছে—ইহাই তাঁহার অনুসন্ধানীয় ছিল। এই প্রকারে প্রতিযোগীতা করিয়া তিনি বার শত হস্তী ক্রয় করেন। তাঁহার পুত্র ওয়াজিদ আলি খাঁর বিবাহের সময় বরযাত্রদলের সঙ্গে শত শত হস্তী সুসজ্জিত হইয়া গমন করিয়াছিল এবং বরের গায়ে প্রায় দুই ক্রোর টাকার আভরণ ছিল। আজও এদেশে কাহারও খুব জাঁক জমকের বিবাহ হইলে লোকে আসফউদ্দৌলার পুত্রের বিবাহের সহিত তুলনা করিয়া থাকে।

সাহ নজফের পর আমরা মতিমহল পরিদর্শন করিলাম। লক্ষ্ণৌয়ের পবলিক লাইব্রেরী একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকা। সময়াভাবে লাইব্রেরী পরিদর্শন করিতে পারিলাম না।

তাহার পর আমরা "তয়খানা দেখিতে ভূগর্ভে নামিলাম।

"তয় খানা" শব্দের বাঙ্গলা প্রতিশব্দ দিতে গেলে—"ভূগর্ভস্থ নিদাঘ প্রাসাদ" ভিন্ন আর কিছু বলা চলে না। যে সোপানরাজির উপর দিয়া আমরা লাইব্রেরীতে গিয়াছিলাম। তাহারই এক অংশ ববাবব ভূগর্ভে প্রবেশ কবিয়ছে। সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে এক এক স্থলে অন্ধকার ঠেকিল, নাচের কামরায় গিয়া দেখিলাম—ইহারা পূর্ব্ব-সৌন্দর্য্য যাহা কিছু ছিল সকলই কাল হস্তে চুর্ণীকৃত হইয়াছে। সংস্করণা ভাবে চারিদিকের দেওয়াল ও বালি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে—এবং ময়লা জমিয়া ঘবেব মধ্যে এক প্রকার গন্ধ উৎপাদন করিতেছে। হর্ম্মাতল এক প্রকাব সুচিক্কণ বহুমূল্য পালিশ পাথরে মণ্ডিত ছিল—এক্ষণে তাহার কিছুই নাই। এই অন্ধতমসাবৃত গৃহমধ্যে বড় বড় সেল্‌ফে করিয়া গবর্ণমেণ্ট অযোধ্যা প্রদেশোৎপন্ন যাবতীয় কাঠের নমুনা সাজাইয়া রাখিয়াছেন। নবাবেব প্রমোদ গৃহে শ্মশান ভাব প্রবেশ করিয়াছে, প্রফুল্লতাব স্থান বিমর্ষতা আসিয়া অধিকার করিয়া রহিয়াছে—আলোকের স্থানে অন্ধকার নৃত্য করিতেছে—উৎসবের আনন্দোচ্ছাস প্লাবিত কক্ষে—এক্ষণে বিষাদের হা হুতাশ শুনা যাইতেছে। এই প্রাসাদ দেখিয়া আমাদের মনে অতীতেব স্মৃতির সহিত বিষাদের কালিমালয়ী ছায়া পড়িল। আমরা পথ প্রদর্শককে অশেষ ধন্যবাদ

দিয়া গোমতী তীরে শীতল বায়ু সেবনে 'গলাম। আজ কাল গোমতীর উপর তিনটি পোল দেখি' • াওয়া যায়। ইহাব মধ্যে একটী ইংরাজের তৈয়াবি ও অ ' ইহটী নবাব-দিগেব। গোমতীর উপব লৌহময় পে গী নশীরুদ্দিন নবাব সাহেবের সময় বিলাত হইতে আমদান' য়—ও পর-বর্ত্তী নবাব মহম্মদ আলিশার আমলে ইহা ব নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। আজও অটলভাবে ইহা দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই পোলের কিনারায় চারিটী ১৮ পাউণ্ডার কামান ও কতকগুলি ইংরাজ গোলন্দাজ রাখিয়া স্যার হেনরি লরেন্স বিদ্রোহাদিগের পুল পার হওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন। হোসেনাবাদ, ইমামবাড়ী, জুম্মা মসজিদ সপ্তখণ্ড. মিনার প্রভৃতি বাদসাহ মহম্মদ আলিশার প্রধান কীর্ত্তি। ইহার মধ্যে প্রথম পোলটী তাঁহার জীবদ্দশায় সম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল—এই সুদীঘ সুপ্রশস্ত ইমামবাড়ী তাঁহার সুদক্ষ মন্ত্রী সরফউদ্দৌলার কীর্ত্তি। মহম্মদ আলিশা মৃত্যুর পর এই ইমামবাড়ী মধ্যস্থ কবরে সমাহিত হ'ন। গগনস্পর্শী কারুকার্য্যময় তোরণ পার হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেই ইমামবাড়ীর সম্মুখে একটী সুদীর্ঘ চৌবাচ্চা দৃষ্ট হয়। ইমাম-বাড়ীর উঠানটী আগাগোড়া প্রস্তর মণ্ডিত। আসফউদ্দৌলার ইমামবাড়ীর ন্যায় এটীও সম্পূর্ণ খিলান বর্জ্জিত। সুচিক্কণ

হৰ্ম্ম্যতলে বহুমূল্য বস্ত্রাবৃত মহম্মদ আলিশার শেষ বিশ্রাম স্থান। বাহিরের দালানে একটী রৌপময় নেমাজমঞ্চ, অত্যুচ্চে দেয়ালের গায়ে Balconyর ন্যায় কতকগুলি প্রস্তরময় বসিবার স্থান। শুনিলাম এই স্থানে পর্দাবৃত হইয়া বেগম সাহেবেরা নমাজ শুনিতেন। দিল্লির সুপ্রসিদ্ধ জুম্মা মসজিদের অনুকরণে নবাব মহম্মদ আলি একটী সুদীর্ঘ কারুকার্য্যময় মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এই মসজিদ আজও অসম্পূর্ণ অবস্থায় বনজঙ্গলে সমাবৃত হইয়া পড়িয়া আছে। সপ্তখণ্ড প্রাসাদ বা মিনার মহম্মদ আলিশার আর একটী কীর্ত্তি। কিন্তু ইহার চারিতলা পর্য্যন্ত শেষ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। নবাবের মৃত্যুর পর আর কেহ ইহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই।

সিপাহী বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। লক্ষ্ণৌনগরীতেও বাদ যায় নাই। স্থানে স্থানে সিপাহীদিগের নৃশংস আচরণের কার্য্য এখনও অট্টালিকাগুলি বক্ষে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কয়েকটী স্মরণ স্তুপ দেখিলাম।

প্রথমেই স্যার হেনরী লরেন্সের স্মৃতি চিহ্ন দেখিলাম। এই মহাপুরুষ প্রকৃত পক্ষে লক্ষ্ণৌ রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রস্তর ফলকে নিম্নলিখিত কথাগুলি লেখা রহিয়াছে।

HERE SIR HENRY LAWRENCE DIED 4th. July 1857.

In this room Sir H. Lawrence was wounded by a piece of shell on the 2nd. July 1857.

রেসিডেন্সী প্রভৃতি অট্টালিকাগুলির গাত্রে গাত্রে মার্ব্বেল পাথরে নানা স্মৃতি চিহ্ন লিখিত আছে। ভগ্ন অট্টালিকাগুলি ইংরাজরাজ সযত্নে রক্ষা করিতেছেন। নিত্য শত সহস্র ইংরাজ ও রমণী ইহা পরিদর্শন করিয়া যাইতেছেন। একস্থানে দেখিলাম লেখা আছে—

Banqueting Hall used as General Hospital.

এই প্রকার প্রস্তর ফলক শত শত ভগ্ন অট্টালিকা গাত্রে রহিয়াছে। গুলি গোলার ছিদ্রও দেওয়াল গাত্রে রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। বিস্তৃত ময়দানের উপর এই ভগ্ন অট্টালিকাগুলি সিপাহী বিদ্রোহের সব স্মৃতি চিহ্ন বক্ষে লইয়া এখনও

দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া হৃদয়ে বিষাদের ভাব উদিত হইল। আমরা আর অপেক্ষা না করিয়া অগ্রসর হইলাম।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম সম্মুখে কামান সাজান রহিয়াছে। আমরা পাঁচটার পর সে দিন সেই স্থানে উপনীত হইয়াছিলাম—দেখিলাম শত শত ইংরাজ, রমণী সেই স্থানে সান্ধ্যভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। কেহ সিপাহী-বিদ্রোহের স্মৃতিচিহ্নগুলি দেখিতেছেন—কেহ কথা বলাবলি করিতেছেন—কেহ বা আবার বিমর্ষ ভাবে বেড়াইতেছেন—আবার কেহ বা হর্ষপ্রকাশ করিতেছেন।

আসফউদ্দৌলার বেগমদিগের ক্রীড়া গৃহ দেখিবার জিনিষ। অনেকটা গোলক ধাঁধার মত। ভিতরে প্রবেশ করিলে আর বাহির হইবার উপায় নাই।

মহম্মদ আলিশার Tomb দেখিলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। মসজিদের চারিদিকে বাতি জ্বালান হইতেছে। ক্রমশঃ সন্ধ্যা অতীত হইয়া গেল। বাতির আলোকে সেই স্থান অতি অপূর্ব্ব দেখাইতেছিল। এই মসজিদে প্রায় সহস্রাধিক আলোর বেলোয়ারী ঝাড় আছে—মহরম কিম্বা অন্যান্য উৎসবে উহা জ্বালান হইয়া থাকে।

ইমামবাড়ীর পুষ্করিণীর কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি॥ শুনিলাম ইহাতে বিশ মণ পর্য্যন্ত মাছ আছে। বেগমদিগের

স্নানের ঘাট দেখিলাম। বেগমেরা অন্দর মহল হইতে এই পুষ্করিণীতে স্নান করিতে আসিতেন। যে পথে তাঁহারা আসিতেন, আজও সেই পথের চিহ্ন আছে। ছোট ছোট ইটের গাঁথনিযুক্ত স্নানের ঘাটগুলি দেখিতে অতীব সুন্দর। ইহার ভিতর চারিটি ঘাট পুরুষদিগের ও দুইটী রমণীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল।

বেগমদিগের ঘাট অন্দর হইতে মাটীর নীচে দিয়া চলিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার পর এই পথ দেখিতে গিয়াছিলাম—ফিরিতে প্রায় রাত্রি হইল। জোৎস্নালোকে সেই পথে চলিতে চলিতে কত কথা মনে উদিত হইতে লাগিল।

৯ই ফেব্রুয়ারী ২৭শে মাঘ সোমবার ১৩২০ আমরা লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ করিলাম।

বেলা ৯॥০ টার সময় লক্ষ্ণৌ হইতে কলিকাতাগামী মেলে চড়িলাম। লক্ষ্ণৌ ছাড়িতে ইচ্ছা হইতেছিল না. কিন্তু মানুষ কর্ত্তব্যের দাস, কর্ত্তব্য তাহাকে যে পথে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইবে সে·সেই পথে যাইতে বাধ্য। সুতরাং সহস্র ইচ্ছা থাকিলেও আমরা ক্ষুণ্ণমনে লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ করিলাম।

মেল পাঁচ ছয়টা ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া আসিল—কোথাও থামিল না। দুই ধারে আবার মাঠ ও মাঝে মাঝে লোকালয় দেখিতে দেখিতে আসিতে লাগিলাম। স্থানে

স্থানে দেখিতে পাইলাম যে, মহিষ ও ছাগলের পৃষ্ঠে ছালা বাঁধিয়া মাল বহন করা হইতেছে।

লক্ষ্ণৌয়ে একটী সধবা যুবতী আমাদের গাড়ীতে আসিয়া উঠিল। এই পূর্ণ যুবতীটীকে দেখিলাম—সে ক্রমাগত ক্রন্দন করিতেছে। আমার সহধর্ম্মিণী সব কার্য্যেই অগ্রসর হইয়া থাকেন। তিনি পরিচয়ে জানিলেন যে, স্ত্রীলোকটী স্বামীর দ্বারা তাড়িত হইয়া প্রয়াগ চলিয়া যাইতেছে। মেল গাড়ী এক নিশ্বাসে ছুটিয়া বায়রেরে'ল ষ্টেশনে বেলা ১০-৫০ মিনিটের সময় আসিয়া পৌছিল।

অনেক শ্বেতাঙ্গ ও দেশীয় যাত্রী এই ষ্টেশনে নামিয়া গেল। মেল এই লম্বা রাস্তা এক ঘণ্টা বিশ মিনিট একদমে ছুটিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এখানেও বেশীক্ষণ বিশ্রাম করিতে পাইল না। মাত্র পাঁচ মিনিট বিশ্রাম করিয়া আবার উন্মাদ গতিতে ছুটিয়া চলিল।

বায়রেরিলীর পর হইতে রেল ষ্টেশনের দুই ধারে মটর, সরিসা, যব, গম প্রভৃতির ক্ষেত্রসমূহ দেখা যাইতে লাগিল। মাঠগুলির শোভা বড়ই সুন্দর। শ্যামল শস্যে পরিপূর্ণ এই সকল দিগন্তপ্রসারী মাঠসমূহ ধরণীবক্ষে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। প্রকৃতির এই অফুরন্ত শোভা সম্পদ দেখিতে দেখিতে বহুদূর অতিক্রম করিলাম।

এই সকল শস্যক্ষেত্রে জল সেচন প্রণালী অতি সুন্দর। স্থীপুরুষে বলদের সাহায্যে জল উত্তোলন করিয়া ক্ষেত্রে দিতেছে। এই দৃশ্যটী অতি মনোহর। ১২-৩০ মিনিটের সময় মেলে হঠাৎ আগুন লাগিয়া গেল। প্রায় ১॥০ মাইল পূর্ব্বে এক সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীতে Hot Axle হইয়া আগুন ধরে! আমি সর্ব্ব প্রথম এই ধূম দেখিতে পাই। বাঙ্গালীর যাহা সম্বল এই ক্ষেত্রেও তাহার যথেষ্ট পরিচয় প্রদত্ত হইল। ভয়ে আত্মহারা হইয়া কি করিব স্থির করিতে পারিলাম না। সঙ্গে স্ত্রী, পুত্র সকলেই রহিয়াছে—গাড়ীর ভিতর ধূমরাশি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। কি করিব ঠিক করিতে না পারিয়া আমি ইতঃস্ততঃ চতুর্দ্দিক দেখিতে লাগিলাম এবং গার্ড সাহেবের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য হস্ত নাড়িতে লাগিলাম। Alarm Handle টী টানিতে যাইতেছি, এমন সময়ে হঠাৎ গাড়ী থামিয়া গেল। সকলেই শশব্যস্তে ট্রেন হইতে নামিয়া পড়িল। আমিও স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া অবতরণ করিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে আবার ট্রেণ চলিতে লাগিল। জলন্ত গাড়ীখানি লইয়া ট্রেণ দ্বিগুন বেগে ছুটিয়া বেলা একটা বিশ মিনিটের সময় Chilbila ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল। মেল প্রায় তিন কোয়াটার লেট হইয়াছে। ষ্টেশনে আসিয়া

উপস্থিত হইবামাত্র মহা হুলুস্থূল লাগিয়া গেল। সকলেই ব্যস্তভাবে ছুটাছুটি করিতে লাগিল!

তখন গাড়ীখানিতে রীতিমত আগুন লাগিয়াছে। ইহাব হুহুশব্দে জ্বলিতেছে। ট্রেণে আগুন লাগা কখনও দেখি নাই। অদ্য এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। গাড়ী যদি আসিতে আর পাঁচ মিনিট বিলম্ব করিত, তাহা হইলে সে দিন সমগ্র আরোহী গাড়ীতে যে কি ব্যাপার হইত তাহা বলিতে পারি না।

প্রতাপগড়ে বেলা ১—৪০ মিনিটের সময় গাড়ী আসিল। আমি প্রথম হাত নাড়িয়া ইঞ্জিন থামাইতে বলি। অপব একজন ভদ্রলোক শিকল টানিয়া গাড়ী থামাইয়াছিলেন মোগলসরাই ষ্টেশনে যখন গাড়ী আসিয়া থামিল, তখন গার্ড ও রেলের একজন ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। সাহেবেরা আমার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিলেন, শেষে "ধন্যবাদের" পালা পড়িয়া গেল। বেলা চার ঘটিকার সময় গাড়ী মোগলসরাইয়ে আসিয়াছে। রাত্রি দশটার প্যাসেঞ্জারে আমরা কলিকাতায় গমন করিব—এতক্ষণ কোথায় থাকি এই চিন্তাই আমাকে আলোড়িত করিয়া তুলিল।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমরা বিশ্রামাগারে প্রবেশ

করিলাম। এই কয় ঘণ্টা কিরূপে অতিবাহিত করিব—মাতুলকে ইহা প্রশ্ন করিলাম। সোজা পথে না আসিয়া বক্র পথে আসিতেছি শুনিয়া তিনি আমাদের উপর পূর্ব্ব হইতেই খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে এই প্রকারে সম্বোধিত হইয়া বলিলেন—"চল না বাবা! একবার বিশ্বেশ্বর দর্শন করিয়া আসি। না হয় আর একদিন বাটী যাইতে বিলম্ব হইবে। কাশীতে দ্রব্যাদি অতিশয় সস্তা—তবু এক দিন ত উদর তৃপ্তি করিয়া আহার করিতে পারিব।"

আমি বলিলাম—"মাতুল! বিশ্বেশ্বর দর্শন করিতে ইচ্ছা হয় বটে—কিন্তু এবার বোধ হয় বাবা বিশ্বেশ্বর টানিলেন না। আমি কোনমতেই আর একদিন অপেক্ষা করিতে পারিব না!"

মাতুল তখন আর কোনও কথা না বলিয়া চুপ করিলেন। আমি ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া কোনও প্রকারে সময় অতিবাহিত করিলাম।

দশটা পঁয়ত্রিশ মিনিটের সময় প্যাসেঞ্জারে আরোহণ করিলাম। শরীর অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিল। সুতরাং গাড়ীতে শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম।

১০ই ফেব্রুয়ারী ২৮শে মাঘ মঙ্গলবার প্রভাতে প্যাসেঞ্জার মোকামঘাট ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। শরীর

বড়ই অসুস্থ বোধ হইতেছিল—ষ্টেশনে নামিয়া এক পেয়ালা চা পান করিলাম।

পুনবায় গাড়ী চলিতে লাগিল। প্যাসেঞ্জারে যাঁহারা উঠিয়াছেন, তাঁহাবা ইহাব মর্ম্ম জানেন। এত মন্দগতি যে, সময়ে সময়ে মনে হয় হাঁটিয়া যাই। প্রাণ যেন অস্থিব হইতে থাকে। তদুপবি যদি আবার মধ্যবর্ত্তী ষ্টেশনে বোচকা বুচ্‌কি স্কন্ধে লইয়া যদি দেশীয় লোক উঠে, তবে ত আব কথাই নাই। তখন একেবাবে হতাশ হইতে হয়। সুখের বিষয় আমরা মধ্যম শ্রেণীতে আবোহণ কবিয়াছিলাম। বেলা ৮৷৷৹ ঘটিকাব সময় গাড়ী (Luckeesarai) লক্ষীসবাই ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। এখানেও বাঙ্গলী প্যাসেঞ্জাবেব ভিড় দেখিলাম না। ইহাব পব কিউয়াল জংশন, সালনপুব, জামুই পাব হইয়া বেলা ১০ ঘটিকার সময় গাড়ী গিধোড় ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। গিধোড় আমাব পূর্ব্ব পরিচিত। গিধোড়েব রাজাব ডাক্তাব সুরেন বাবুর বাড়ীতে একবার আমবা আতিথ্য গ্রহণ করি। তাঁহাব যত্ন ও ব্যবহার এখনও আমার মনে গাঁথা রহিয়াছে। এমন সরল ও মধুব প্রকৃতির লোক আমি অতি অল্পই দেখিয়াছি।

সুরেন বাবু এ দিকে মহা নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণ। ষ্টেশন

হইতে উদ্দেশ্যে বারংবার তাঁহাকে নমস্কার করিতে লাগিলাম।

ইহার পর ঝাঝায় আসিলাম। ঝাঝার সেই বাঙ্গালাটী দেখা যাইতে লাগিল। এক মাসের সুখ দুঃখের স্মৃতিজড়িত বাঙ্গালাটীর সঙ্গে যতক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল—ততক্ষণ তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলাম। পরের বাড়ী—আর কখনও যাইব কিনা সন্দেহ, তবুও ইহার দৃশ্য আমার মনকে বিচলিত করিতে লাগিল। বাঙ্গালাটীর প্রত্যেক গৃহ—প্রাঙ্গন—গাছ ও কুয়া—সমস্তই আমার স্মৃতি পথে উদিত হইতে লাগিল।

খোকা এই ষ্টেশনের নাম ঝাঝা শুনিয়া তাহার সঙ্গী ভৃত্য বালক মুটুয়ার জন্য কাঁদিতে লাগিল। মুটুয়া সত্যই আমাদের হইয়া গিয়াছিল, তাহার জন্য আমারও অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিল। গাড়ী ক্রমশঃ ঝাঝা অতিক্রম করিল—পরে শিমুলতলা পার হইয়া বেলা ১২৷৷০ টার সময় বৈদ্যনাথ জংশন অর্থাৎ যশিডেতে আসিয়া উপস্থিত হইল। এইবার বাটীর ও অন্যান্য চিন্তা করিতে করিতে হাবড়া ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।